পথ কে রুখবে?

মনোজ বসু

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

দাঙ্গা রুখতে যাঁরা প্রাণদান করে গেছেন

পূর্ব-বাংলায়	পশ্চিম-বাংলায়
আমির হোসেন চৌধুরী	শচীন মিত্র
জিন্নাত আলি মাস্টার	স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং পুণ্যশ্লোক আরো যত শহীদ

সকলের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করি

২৫ বৈশাখ, রবীন্দ্র-জন্মদিবস

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

এই উপন্যাস ১৮ এপ্রিল, ১৯৬৮ সাপ্তাহিক বসুমতীতে ছাপা শুরু হয়। শেষ কিস্তি বেরোয় ৬ মার্চ, ১৯৬৯। জানুয়ারি, ১৯৬৯-এর শেষ দিকে লেখা শেষ করে দিই। অতএব মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগেই এ বই লেখা। সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তী সেন এবং শ্রীমান দুর্গাদাস সরকার ও শ্রীমান দিলীপ চক্রবর্তী লেখাটি সম্পর্কে যে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছেন, ভাষায় তার বর্ণনা হয় না।

—লেখক

॥ এক ॥

ভারতে আর পাকিস্তানে সেই যে লড়াই হয়ে গেল—পূর্বাঞ্চল আমাদের এই বঙ্গদেশে একেবারে নিরামিষ লড়াই, একটা গুলিও ছোটে নি উদ্যত বন্দুকের ছিদ্র দিয়ে। মুখের তড়পানিটা কিন্তু দস্তুরমতো খর, লড়াই যত-কিছু সেইখানে। তা সে যাই হোক, বাইশ দিনে লড়াই চুকল কিন্তু বাইশটা মাসেও তার জের মেটে না। বর্ডার সিল করে দিয়েছে, পাশপোর্ট-ভিসা বিলকুল বন্ধ। মানুষ তো মানুষ, একটা মাছি গলবে না এপার থেকে ওপারে, একটা মশা উড়বে না ওপার থেকে এপারে। সীমানায় পা বাড়িয়েছে কি গুলি। চালাও হুকুম, বিচার-বিবেচনা নেই—স্রেফ গুলি চালিয়ে যাবে। এমন আহা-মরি সব বন্দুক লড়াইয়ের সময় লাগে নি তো এইবারে কাজে লাগুক। লাগছেও তাই—তামাম বর্ডার জুড়ে রাত্রিবেলা দুড়ুম-দাড়াম দেওড় শুনতে পাবেন।

মল্লিকরা এককালের দুর্ধর্ষ জমিদার, মল্লিকবাড়ি লোকে এক-ডাকে চিনত। জমিদারি গেছে, শরিকরা এদিক-সেদিক ছিটকে পড়েছে। একটা তরফ মাত্র টিকে আছে। গাঙ শুকালেও খাল একটু থেকে যায়—স্বনামে-বেনামে কিছু ধানজমি কয়েক ঘর প্রজাপাটক এবং পুকুর-বাগবাগিচা কয়েকটা। তাতেই সামান্য-ভাবে তাদের দিন চলে যায়। হেনকালে দেশ ভাগাভাগি হল, মানুষের মাথায় বজ্রাঘাত। র‍্যাডক্লিফের লাইন চলে গেল মল্লিক-বাড়ির গা ঘেঁষে—জমাজমি আওলাত-পশার সমস্ত পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে, ভদ্রাসন প্রাচীন অট্টালিকা শুধু হিন্দুস্থানে।

শেষ-মেষ শ্রীধর মল্লিক একলাই কেবল ভদ্রাসনে পড়ে আছেন।

কাজিরাও পুরনো গৃহস্থ। মল্লিকদের সঙ্গে চিরকালের মাখা-মাখি—জমিদারি যখন ছিল, এস্টেটের আদায়-তহ্‌শিল পুরুষানুক্রমে কাজিরাই করে এসেছে। দেশ ভাগ হয়ে কাজিদের অসুবিধা নেই—পাকিস্তান এলাকার ভিতরেই তাদের সমস্ত।

কাজিবাড়ির আনোয়ারকে শ্রীধর বললেন, তোমার জমিজিরেতের সঙ্গে আমার এটুকুও বেড় দিয়ে নাও। বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। ভিনদেশের মানুষ হয়ে গেছি—প্রজাদের কেউ এক-পয়সা ঠেকাবে না, বর্গাদারে ধানের চিটেটাও দেবে না। বারোভূতে লুঠেপুটে খাবে, তার চেয়ে নিজের মতন আদায়পত্তর করে তোমরাই খেও সব। তাতে আমার অনেক শান্তি। আর পারো তো দু-দশ টাকা ছুঁড়ে দিও এদিক পানে। না পারলেও আমি কিছু মনে করব না।

নিশ্বাস ফেলে আবার বললেন, তাই বা ক'টা দিন। বর্ডার-পুলিশের যা হিড়িক, আমিই কি থাকতে পারব এখানে—টাকা ছুঁড়বে কার কাছে? দালানকোঠা গাছগাছালি বিক্রি করে চলে যাব কাঁহা-কাঁহা মুলুক।

আনোয়ার বলেছিল, তারপর?

ভিক্ষের ঝুলি—সে কি আর খুলে বলতে হবে। সেই জন্যেই আরও দূরের জায়গায় যাওয়া। এখানে আমি মল্লিকবাবু আছি—অজানা জায়গায় কে কাকে চেনে।

বাড়ি বিক্রির সত্যিই চেষ্টা করেছিলেন তখন। খদ্দের কোথা? বর্ডার বলে নিজেই পালাচ্ছেন, নতুন করে কে ঘরবসত করতে আসবে?

যাওয়া হয় নি। যাই-যাই রব শেষ পর্যন্ত আর রইল না। সতেরটা বছর দেখতে দেখতে গেল। আনোয়ারই তার মূলে। এ রকম সৎ ছেলে হয় না। এবং তুখোড়ও বটে। পাকিস্তানের পারে মল্লিকদের বাগিচার মধ্যে প্রকাণ্ড এক আটচালা তুলে

নিয়েছে। শ্রীধরের জমিজমা ও নিজের জমিজমা একত্র মিশিয়ে পাইক-দারোয়ান নিয়ে দাবরাবে ঐ আটচালায় কাছারি বসে। আদায়পত্র করে মালিকের মালখাজনা মিটিয়ে হিসাবমাফিক শ্রীধরের প্রাপ্য দিয়ে দেয়, এবং তহ্শিলদার হিসাবে নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নেয়। স্বামী আর স্ত্রী দু-জন নিয়ে শ্রীধরের সংসার—ছেলেটা একটু বড় হলেই লেখাপড়ার নাম করে বসিরহাটে মামার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিশাল অট্টালিকার খান তিনেক ঘর নিয়ে আছেন তাঁরা—বাকি ঘরগুলোর কড়িতে চামচিকে ঝোলে, মেঝেয় জঙ্গল, দেয়াল খসে খসে পড়ছে। ছোট্ট সংসার বলে যা-হোক করে চলে যায়, এর অধিক আর পাচ্ছেনই বা কোথা? বসিরহাটে শ্যালক কতদূর কি সুখে রয়েছেন, তা-ও তো দেখা আছে নিজ চোখে!

বছর সতের এমনি কাটল। লাগ্ লাগ্—কিন্তু লেগেও লাগে না, টাল সামলে গেছে বরাবর। পঁয়ষট্টি সালে এসে সত্যি সত্যি লাগল। সামান্য লড়াই, বাইশ দিন মাত্র পরমায়ু। মিলিটারি গোড়াতেই শ্রীধরের বাড়ি দখল করে নিয়েছিল। স্ত্রী অগত্যা ভাইয়ের বাড়ি চললেন, পিছন পিছন শ্রীধরও। শ্যালকের বাড়ি পুরোপুরি শ্রীধর ওঠেন নি—হোটেলে খেয়ে কাজকর্মের চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করেন, রাত্রে এসে শুয়ে পড়েন।

লড়াই কবে থেমে গেছে, শ্রীধরের ঘরবাড়িও ছাড় পেয়েছে। কিন্তু লঙ্কার আগুন নিভলেও হনুমানের লেজের আগুন নেভে না। বর্ডার সিল-করা আছে, এপারে-ওপারে চলাচল নিষিদ্ধ। রাত্রি হলেই কারফিউ—বর্ডার-লাইনের এপারে পাঁচ মাইল, ওপারে পাঁচ মাইল। চলাচলে পা বাড়ালেই গুলিতে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে।

হেন অবস্থায়, ঐ যা চলে এসেছেন—আর ও-মুখো হবেন না

শ্রীধর। পুরো বাড়ির খদ্দের না হোক, বাড়ি ভেঙে ফেলে দরজা-জানলা কড়ি-বরগা বিক্রি করবেন। উৎকৃষ্ট সেগুনকাঠ, সে জিনিসে সকলের আগ্রহ—দেখেও এসেছে কেউ কেউ বর্ডার অবধি গিয়ে। দরদাম করছে।

আনোয়ার খোঁজে খোঁজে এসে ধরল: মল্লিক-দা, খবরদার খবরদার—বাড়ি বিক্রির নামও কোরো না। বাপ-দাদার বানানো জিনিস সাজিয়ে-গুছিয়ে তকতকে-ঝকঝকে করে রাখবে—তা নয়, ভেঙেচুরে এখন বিক্রির ফিকিরে আছেন!

শ্রীধর বললেন, বাপ-দাদারাই বা অমন জায়গায় কেন বানাতে গেলেন? অবিশ্যি জানার কথাও নয় দেশের মাঝখান দিয়ে একদিন বেমক্কা এমনি লাইন টেনে দেবে।

রহস্যভরা চোখে আনোয়ার মিটমিট করে তাকায়: সেকেলে সাচ্চা মানুষ তাঁরা, কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছিলেন—বেছে বেছে ঐ জায়গাতেই তাই অতবড় বাড়ি বানালেন।

ধরেই নিয়ে চলল শ্রীধরকে তাঁর পরিত্যক্ত বাড়িতে। পারঘাটা দু-চারটে আগে থেকেই ছিল, আরও বিস্তর গজিয়েছে। কয়েকটা ঘাট আনোয়ার ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনল। তারপরে প্রশ্ন করে: বাড়ি বেচবে নাকি মল্লিক-দা?

ক্ষেপেছ? কাছারির আটচালায় তুমি ওপারের ওয়েটিংরুম বানাওগে। ঘরগুলোর চামচিকে তাড়িয়ে চুন টেনে আমিও এদিকে ঠিকঠাক করে নিই। সত্যিই তো, পিতৃপুরুষের ভিটের এমন হাল হয়ে থাকবে কেন।

ছিল মল্লিকবাড়ি—লোকে একডাকে চিনত। এখন মল্লিকঘাট—ঘাটেরও বেশ নামডাক পড়ে যাচ্ছে।

জয় হোক যাঁরা লড়াই বাধালেন। বর্ডার পাকাপাকি সিল হয়ে গেল। রাজ্য-পুলিশ, বর্ডার-পুলিশ, তদুপরি মিলিটারি সেপাই—

শ্রীধর বলেন, জয় হোক যাঁরা দেশ ভাগ করেছেন! চিরজীবী হোক জিন্নাহ্-জওহরলালদের নাম!

আনোয়ার গবেষণা করে বলে, লাখ লাখ লোক বেকার—দেশ-ভাগ সেই সব বিবেচনা করেই বোধহয়। উঃ, কত লোকে করে খাচ্ছে!

মুখ বাঁকিয়ে ঘৃণাভরে শ্রীধর বলেন, দুই বাংলা আবার এক হওয়ার কথা বলে না কি কেউ কেউ। আহাম্মক আর কাকে বলে! চাইনে, চাইনে—গাদা গাদা তাহলে নতুন করে বেকার হবে।

ঘাট কতই—দুই বাংলার তেরো-শ মাইল বর্ডারে পাঁচ-সাত-শ তো বটেই। কিন্তু মল্লিকঘাটের জুড়ি নেই। কাজকর্মের ধরনই আলাদা। পারাপার কতই তো হয়ে থাকেন, মল্লিকঘাট একবারটি পরখ করে দেখুন। পার না হয় না-ই হলেন, গিয়ে দেখতে দোষটা কি? তারপরে, বলে দিচ্ছি, ঘরের দুয়োরের ঘাটটাও বাতিল করে দশ-বিশ কিলো পায়ে হেঁটে মল্লিকঘাটে যেতে মন চাইবে।

॥ দুই ॥

থালায় ভাত দিয়েছে, ছেলেপুলে খেতে বসবে কি—স্ফূর্তিতে আগে একপাক নেচে নেয়। ভাত নয়, অমৃত—সাগর-মন্থনের অমৃতের মতোই দুর্লভ বস্তু।

খাঁয়েরা ধানীমানী গৃহস্থ, ধান বেচে বড়লোক। মায়ে ছেলের শলাপরামর্শে বসে খাঁয়েদের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। ধান ওদের নিশ্চয় আছে।

মা বললেন, ঐখানে চলে যাও বাবা, গিয়ে আমড়াগাছি করোগে। পেটের ক্ষিধের চেয়ে বড় কী আছে? দরদাম নিয়ে কষামাজা করতে যেও না। দেখ, যদি কিছু বের হয়ে আসে।

দিলেও দিতে পারে, একেবারে অসম্ভব মনে হয় না। সময়টা শুভ। জনশ্রুতি, হরিহর খাঁ ইলেকসনে দাঁড়ানোর তোড়জোড়ে আছেন। অদ্ভুত তদ্বিরবাজ—এতদিন দাঁড়ান নি কেন, সেই আশ্চর্য। জিততে পারলে পুরো না হোক একটা আধা-মন্ত্রিত্ব ঠেকায় কে। আর টাকা ছড়ালে জেতাও কিছু কঠিন কাজ নয়। হেন অবস্থায় প্রণব গিয়ে ঠিক মতো কথা পাড়তে পারলে ফল হবার সম্ভাবনা।

যাবার মুখে মা কথা পাড়বার কায়দাটা তালিম দিয়ে দেন: গুণপনা ফলাও করে বলবে। যুবসংঘের সেক্রেটারি তুমি, ছোঁড়ারা তোমার কথায় ওঠে বসে, দুর্গা কালী সরস্বতী পাড়ার কোন পূজো তোমায় বাদ দিয়ে হয় না—ভাল করে বুঝিয়ে দিও। যে বিয়ের যে মন্তর। লজ্জা করতে গেলে হবে না।

অতদূর না হোক, কিছু অন্তত বলতই প্রণব মরিয়া হয়ে। কিন্তু হরিহর ভাল করে পাড়তেই দিলেন না। আকাশ থেকে পড়েন:

কোথায় পাব ধান? লেভিতে সবই তো টেনে নিল। সংসার-খোরাকিতেই টান পড়ে যাবে।

লেভিতে দেবার বান্দাই বটে। কে না জানে, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তোমার বন্দোবস্ত। বিশ-তিরিশ মন ধানের লোক-দেখানো লেভি জমা দিতে পার—সে তো সাগরের গণ্ডুষমাত্র জল।

খাতির করে বসিয়ে হরিহর ঠাণ্ডা ডাবের সরবত খাওয়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার গরম চা আনতে পাঠালেন। বলেন, থাকলে ধান কেন দেবো না। সোনাদানা নয় যে সিন্দুক ভরে রাখলাম, মরার পরে ছেলে-নাতিরা ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে খাবে। এদেশে-সেদেশে বদনাম রটেছে, ধান আছে নাকি আমার। দেশসুদ্ধ না খেয়ে মরেছে, আমি ধান মজুত করে বসে আছি।

খপ করে প্রণবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন: এসেছ যখন একটা কাজ করো ভাই, কত ধান আছে নিজ চোখে দেখে যাও। তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখ, কোনো জায়গা বাদ দিও না। কিছুই আমার গোপন নেই, পাপ নেই তো গোপন কিসের? সব জায়গায় মেলামেশা তোমার, সকলের সঙ্গে দহরম-মহরম। কী দেখে যাচ্ছ, বলবে সকলকে। সত্যি কথা বলবে। বাপ-দাদারা এককালে গোলাবাড়ি বানিয়েছিলেন, তাই আমার কাল হয়েছে। গোলার ভিটেয় হেড়াঞ্চির জঙ্গল, ধানের বদনাম তবু চিরকালের তরে রয়ে গেল।

পরম আপ্যায়িত হয়ে প্রণব ফিরল। প্রাণভরে গালিগালাজ করছে। মেঘ করেছিল আকাশে, চড়বড় করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। আর বাতাস।

ছেলে রওনা হয়ে গেলে গিন্নি বাইরের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলেন। কর্তার ঘুম ভেঙেছে ইতিমধ্যে। বললেন, প্রণবকে

খাঁয়েদের বাড়ি পাঠালাম। টাকা চিবিয়ে পেট ভরবে না, চেষ্টা তো করতেই হবে।

কর্তা বলেন, টাকা কোথায় পেলে তুমি? নোট—নোটের ছাপা-কাগজ।

কলকে ধরিয়ে গিন্নি হুঁকোর মাথায় বসিয়ে দিলেন। এই বস্তুটা চাই—অভাব পক্ষে, কাছে-বসা কোন-একটা মানুষ। এত কাজের মানুষ ছিলেন, আজকে কোন কাজই আর নেই। শক্তিই বা কোথা? অঙ্গের মধ্যে মুখটাই নড়ে-চড়ে ভাল। তামাক টানা উপলক্ষে নড়ে। আর তামাক না দেবে তো সামনে লোক বসিয়ে দাও—কথাবার্তার ব্যাপারে মুখ নড়বে।

তামাক টানছিলেন মজুমদার-কর্তা অর্ধ-মুদিত নেত্রে, কে তখন বাইরে ডাকাডাকি করছে: দুয়োর খুলুন। বাদলায় নেয়ে যাচ্ছি একেবারে।

হুঁকো নামিয়ে কর্তা বললেন, খোলাই আছে, ধাক্কা দিয়ে দেখুন না। আচ্ছা গোঁফখেজুরে মানুষ তো মশায়। আসুন।

অপরিচিত মানুষ ঘরে ঢুকল।

মজুমদার-কর্তা বলেন, গোঁফখেজুরে বোঝেন তো? খেজুরতলায় শুয়ে ছিল, পাকা-খেজুর টুপ করে গোঁফের উপর পড়েছে। পথ-চলতি মানুষকে তখন খোসামোদ করছে: পা দিয়ে খেজুরটা মুখে ঠেলে দিয়ে যাও। নিজ হাতে সরিয়ে নেবে না, পরকে বলবে। আপনার হল তাই, দরজা খুলে দিতে বলছেন আমায়। কী মশায়, নজর যে ফিরছে না মোটে।

আগন্তুক স্তম্ভিত। বীভৎস বিকৃতমুখ বৃদ্ধ খাটের উপর আড় হয়ে আছেন। এক চোখ কোটর থেকে ঠেলে বেরুচ্ছে, আর একটা চোখ নেই। ডান-হাত নুলো।

বৃদ্ধ হা-হা করে হেসে উঠলেন। চোখে যে পলক পড়ে না মশায়। আগেও ঠিক এমনি ছিল—রূপ দেখে নজর ফিরত না।

আমার যে স্ত্রী, পরে শুনলাম, বোনের কাছে বলেছিল, এই পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দাও আমার। নয় তো জলে ঝাঁপ দেবো, কিম্বা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব—

উৎকট হাসি হাসছেন বৃদ্ধ, গা কাঁপে সে হাসিতে। আগন্তুক ভাবে : পাগলের পাল্লায় এসে পড়লাম নাকি ? তা অবশ্য নয়, ভাল করেই খবরবাদ নিয়ে এসেছে। মাথায় ছিট থাকতে পারে, অনেকেরই এমন থাকে। সর্বস্ব ফেলে দেশত্যাগ করে আসার পরেও মাথা ষোলআনা ঠিক থাকবে, এমন শক্ত মাথা ক'টা মানুষের আছে। পাগল নয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ, বিশেষ অবস্থাপন্ন ছিলেন এককালে—খবরাখবর নিয়েই তবে এবাড়ি এসে উঠেছে।

প্রসঙ্গ ভোলানোর জন্য বাইরে একবার মুখ বাড়িয়ে রুমালে মাথা মুছতে মুছতে আগন্তুক বলল, বৃষ্টি চলবে এখন। 'ধন্য রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ'—

বৃদ্ধ খিঁচিয়ে উঠলেন : কচু! রাজা ঠগজোচ্চোর, দেশ মহাপাতকী—

ঘাড় নুইয়ে তৎক্ষণাৎ লোকটা সায় দিয়ে উঠল : যে আজ্ঞে। 'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, প্রজা কষ্ট পায় ; গিন্নির পাপে গিন্নি নষ্ট, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।' বর্ষণে বন্যা বয়ে গেলেও পোড়া-দেশের ভাল হবে না। তা ছাড়া মাঘমাসও শেষ হয়ে ফাল্গুন পড়ে গেল।

এবারে তোয়াজের অন্য পথ ধরেছে। চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে লোকটা বলে, উঃ, বাড়ি বটে একখানা! ঘর তো নয়, যেন মাঠ।

বৃদ্ধ বেজার মুখে বললেন, এ বাড়ি আমাদের বানানো নয়।

ওই হল। সেকেলে মশায়দের কীর্তি—সেকেলে বলেই তো এমন। একালের সব বাড়ি হচ্ছে দেখুনগে। তাসের ঘর—বাতাসের ঘায়ে ভেঙে পড়ে।

বৃদ্ধ বললেন, যারা বানিয়েছিল আমি তাদের কেউ নই।

পাকিস্তানে গিয়ে আমাদের টিনের-ঘরে আস্তানা নিয়ে তারা আমাদের নব্বুই বিঘে চকের জমির ধান খাচ্ছে। আর আমি এখানে পাকা-দালানে শুয়ে শুয়ে হরিমটর চিবোই।

আগন্তুক দমে না : তা খান না খান, শোন কর্তামশাই দস্তুরমতো ভাল। সেটা মানতে হবে।

তাকের দিকে আঙুল তুলে বৃদ্ধ বললেন, কালো-খাতাটা পেড়ে আসুন—

লোকটার কথা শেষ হয় নি, আরও বক্তব্য আছে। বলে, হুকুম হয়ে যাক কর্তামশাই, এই রাত্তিরটা আমি আপনার এখানে শুয়ে যাই।

কর্তমশাই তাঁর একটা চোখে যেন বল্লমের খোঁচা দিয়ে প্রশ্ন করলেন—আপনি থেকে একেবারে তুমিতে নেমেছেন : তুমি কে?

অধীনের নাম রঞ্জনকুমার দত্ত। মেয়ের বিয়ের পাত্র দেখতে বেরিয়েছিলাম। ভন্নার মধ্যে যাই কোথা এখন? একটা মাহুর ছুঁড়ে দেবেন—এতবড় বাড়ির যেখানে হোক গড়িয়ে পড়ব।

বৃদ্ধ বললেন : বালিশ দেবো না?

রঞ্জন নিস্পৃহকণ্ঠে বলে, দিলেও হয় না-দিলেও হয়।

উপোসি পড়ে থাকবে বুঝি? মুখে কিছু দিতে হবে না?

দিলেও হয় না-দিলেও হয়।

এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে এখন ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। প্রণব এক বাড়ির ছাঁচতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে উঠল।

কর্তামশাই ছেলেকে শুধান : কি বলল হরিহর খাঁ? দেবে?

প্রণব তিক্তকণ্ঠে বলে, নেই তা দেবে কোত্থেকে? হরেক কাঁদুনি গাইতে লাগল।

কালো-খাতা এনে দিয়েছে রঞ্জন। বাঁ-হাতে পাতা উল্টাতে উল্টাতে বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বললেন, তারপর?

বলে এলাম, চাইনে ধান। এক কিলো দু-কিলো চাল আমিই বরং যোগাড় করে পাঠাব।

বৃদ্ধ গর্জে উঠলেন : কথাগুলোর বাজে খরচা। কথার চাবুক ওদের গায়ে লাগে না, কাঁটাওয়ালা শঙ্করমাছের চাবুক চাই। আগা-পাস্তলা আচ্ছা করে চাবকে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে কড়িকাঠের সঙ্গে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিতে হয়। ওটাকে, আর কুবুদ্ধিদাতা ওর মোসাহেবগুলোকে। জিভ বেয়ে লালা গড়াবে, সেই সঙ্গে ধানের খবর বেরিয়ে আসবে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ।

যা খুঁজছিলেন, পেয়ে গেছেন এতক্ষণে। খাতায় সেই পাতাটার উপর নিবিষ্ট দৃষ্টি।

কল্কে নিভে গেছে, প্রণব লক্ষ্য করল। নতুন করে সেজে রান্নাঘরে আগুন নিতে যাচ্ছে—কর্তামশায় বললেন, তোর মাকে বলবি খান তিনেক রুটি বেশি করে যেন বানায়। বাড়িতে অতিথ।

ভ্রূকুটি করলেন রঞ্জনের দিকে : সেই যে বলে 'পেটে নেই দানাপানি, জ্ঞাত-কুটুম্ব ডেকে আনি'—তা কোনো কুটুম্ব ডাকতে যাইনি আমি। পায়ে হেঁটে হাজির হল। ঢং করে শুধু একটা মাদুর চাওয়া হচ্ছে, মাদুর পেতে শুয়ে পড়ব। জানে, গৃহস্থর বাড়ি মাদুরের বেশি কি চাইতে হবে?—মাদুরের পিছন পিছন সমস্ত-কিছু এসে পড়বে। তা বলে ভাতের পিত্যেশ কোরো না বাছাধন। রুটি—ভরপেট নয়, গোণাগণতি তিনখানা। সাত-সমুদ্দুর পারের ভিক্ষে-করা গম। খান দুই-তিন রুটি চিবিয়ে ঠেসে জল খেয়ে নেবে। ঐ জিনিসটার অভাব নেই, দেদার খেও।

শুনতে শুনতে প্রণব বেরিয়ে গেল। হুঁকোর মাথায় কল্কে নেই, এবং সামনের উপর দুই কান-সমন্বিত লোক বসে আছে। কর্তমশায়কে পায় কে। বলছেন, লেখার বাতিক ছিল, স্বাধীনতার পর ক'টা বছর দেদার লিখেছি। দেয়ালের তাকে

ঐ যত খাতা দেখছ, লেখায় লেখায় ঠাসা। আমার শেষ-রচনা এই কালো-খাতায়। এইটাই কেবল ছাপা হয়েছে—পয়সা খরচা করে নিজে ছেপেছি।

খোলা খাতা এগিয়ে দিলেন রঞ্জনের দিকে। ছাপা-বিজ্ঞাপন পাতার উপরে সাঁটা:

॥ সম্পত্তি বিনিময় ॥

যশোর জেলার বাঁশতলি গ্রামে নব্বুই বিঘারও উর্ধ্বে তে-ফসলা জমি, ফলের-বাগ, তিনটি পুষ্করিণী এবং সাত বিঘা ভদ্রাসন ও বসতবাড়ি পশ্চিমবঙ্গের যে-কোন স্থানের সহিত বিনিময়ের জন্য লিখুন। বক্স নং···

বলছেন, আমার শেষ-লেখা—আর লিখব না এ-জীবনে। দেহের পঙ্গু চেহারাটাই কেবল চোখে আসছে—মন দেখতে পাচ্ছ না। মনেরও অবিকল এই চেহারা। বাঁ-হাতে কষ্টেসৃষ্টে বিজ্ঞাপন লেখা শেষ করে কলম ভেঙে ফেলছিলাম—মনে হল, আরও একটা কাজ তো আছে কলমের। খদ্দের যদি আসে, দলিলে সই করতে হবে। তখন আবার কলম কোথা খুঁজে বেড়াব ?

চোখ বুজে হঠাৎ গলা অতিশয় নিচু করে কেবল নিজেকেই যেন শোনাচ্ছেন: গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ছিলাম। লেখাপড়া করতে কলকাতায় এলাম তারপর। সেই তো মরণ হল, রাক্ষুসে কলকাতা আঁকড়ে ধরল। পূজোর সময় আর জষ্ঠিমাসে আম-কাঁঠালের সময় গাঁয়ে যেতাম। শীতকালেও যেতাম—রস-গুড়ের সময়টা। আমার বাস্তুভিটে, ঘরবাড়ি, চেনাজানা পড়শিরা —তখন কি জানি, ধোঁয়া হয়ে সব মিলিয়ে যাবে। একটা দিনও তা হলে গ্রাম-ছাড়া হতাম না। থাকতাম না বাড়িতে, তবু কী জমজমাট! জ্ঞাতগুষ্ঠি, আত্মীয়-কুটুম্ব, এসো-জন বসো-জন—নাও খাও থাকো—

কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে প্রণব ঘরে ঢুকল।

কর্তামশায়ের হুঁস নেই, বিড়বিড় করে যেন মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। হুঁকোর মাথায় কল্কে বসিয়ে প্রণব এগিয়ে ধরে: তামাক খাও বাবা।

চোখ মেলে বৃদ্ধ ফড়ফড় করে হুঁকো টানতে লাগলেন। ছেলেকে মধ্যস্থ মেনে হঠাৎ একবার গর্জন করে ওঠেন: অতিথ এসে বলে কিনা, মাছুর দিন—শুয়ে পড়ে থাকব। আমার বাঁশতলি গিয়ে বলুক দিকি কেমন। তিন-চার মরদ খেপলাজাল নিয়ে পুকুরে পড়েছে, পেল্লায় এক কাতলা ধরে দড়াম করে উঠানের উপর ফেলল। সকালবেলাই কি ছাড় পাচ্ছে? হুঁ-হুঁ, রাত্তিরে পাঁঠা হয় নি তো—ঐ দেখ, জিওলগাছে পাঁঠা এনে বেঁধেছে, ভ্যা-ভ্যা করছে। ক'খানা এমনি গোণাগণতি পাকা কুঠরি নয়, ঘরের গোলকধাঁধা—টিনের-ঘর, খোড়ো-ঘর—ঢুকে পড়তে পারো, বেরিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। পথ হারিয়ে ধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাবে। খুঁজে-পেতে পথ যদিই বা পেয়ে গেলে, তখন আবার গায়ের জামা পায়ের জুতো খুঁজে পাচ্ছ না। রাত্রে কাল খুলে রেখে ঘুমুচ্ছিলে, তারপরে গায়েব। আচ্ছা, দুপুরের খাওয়া-দাওয়া তো হোক, তখন খুঁজে দেখা যাবে—

তামাকে রুচি নেই, হুঁকো রেখে কর্তামশায় শয্যা নিলেন। উঠে পড়বার জন্য রঞ্জনকে প্রণব ইশারা করছে: চলে আসুন। ক্লান্ত আছেন, যা-হোক কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়বেন।

বৃদ্ধ বললেন, হেরিকেন নিভিয়ে দিয়ে যা। কেরাসিন পুড়িয়ে রোশনাই করবি, এমন লাটসাহেব কবে থেকে হলি? কি মাস এটা—ফাল্গুন পড়ে গেছে, না রে?

আলো নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে বৃদ্ধের মন্তোর পড়া আবার আরম্ভ হয়ে গেছে: ফাল্গুন মাস। ধানের পালায় উঠোনে আর পা ফেলবার জায়গা নেই।

মলা-ডলা অর্ধেকও সারা হয় নি। ধান খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে ইঁদুরগুলো হাতি হয়ে উঠল রে—

মানুষ পটাতে এই রঞ্জন লোকটার জুড়ি নেই, ইতিমধ্যে ঘোরতর জমিয়ে নিয়েছে প্রণবের সঙ্গে। খাওয়া-দাওয়া অন্তে প্রণবই বিছানা করে দিচ্ছে, তাই নিয়ে দু-জনে কাড়াকাড়ি।

প্রণব বলে, চুপচাপ বসে থাকুন বলছি। অতিথ না?

রঞ্জন হেসে বলে, অতিথ বলেই বুঝি হাত ঠুঁটো হয়ে গেছে—চাদরের কোণটাও ধরে দিতে পারব না?

কোন-একখানে মাদুর পেতে পড়ে থাকতে চেয়েছিল—তা মাদুরই নেই সে বিছানায়। সতরঞ্চি-তোষক চাদর-বালিশ। বাড়িতে জামাই এলেই বা এর চেয়ে কী আর বেশি হত।

কর্তামশায়ের কথাগুলো রঞ্জনই এবার ঘুরিয়ে বলছে, আলো কি জন্যে? আলো নিভিয়ে দিন। খেতে বসলে তখন লাগতে পারে, দেখে শুনে গালে তুলতে হয়। তা-ই বা কেন—মাছের কাঁটা বাছবার সময় একটুখানি, চিংড়ি-টিংড়ি হলে তা-ও লাগে না। ধান-চাল শুধু নয়, কেরোসিনেরও আকাল। উঃ, কী রাজত্বই করছে! সভা করে সোনার মেডেল দিতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করেঃ ক্যারেট-সোনা। তাতেও ভেজাল, দু-বছরে দেখবেন সোনা কালোবরণ ধরে লোহা হয়ে গেছে।

প্রণব বলে, কাগজে দেখতে পাই আমাদের এক ম্যাজিসিয়ান বিদেশে গিয়ে তারিফ আর টাকা কুড়োচ্ছেন। সেই বিদেশিরা এ-দেশে এলে দেখতে পাবে, ঘরে ঘরে অগুন্তি আমাদের ম্যাজিসিয়ান। পুরুষ-মেয়ে, বাচ্চা-বুড়ো—বাদ ক'টা লোকই বা!

আলোর জোর কমিয়ে তক্তপোষের একদিকে পা ঝুলিয়ে প্রণব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে। বলে, ধানের চেষ্টায় আজ খাঁয়েদের বাড়ি

গেলাম। যে দাম চায়, তাতেই রাজি। বেকবুল গেল, ধান নেই। তার মানে যে দামটা পেতে চায়, মুখে বলতে লজ্জা লাগছে। লজ্জা আজ বটে—কিন্তু লোকটা বহুদর্শী, জেনেবুঝে আছে বর্ষা পড়লে ঐটেই বাজার-দর হয়ে যাবে। হাতে ধরে বলল, তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখুন—ধান-চাল সূচ-আলপিন নয় যে, এক কোণে গুঁজে রেখে দিয়েছি। খুঁজলে পেতাম না, নয়তো অত জোর দিয়ে বলবে কেন? তবে দেখুন, হাজার হাজার মন ধান অদৃশ্য করে রেখেছে—ম্যাজিক বই আর কি! ম্যাজিকবিদ্যাটা ঘরে ঘরে আচ্ছা-রকম রপ্ত করে নিয়েছে।

কায়দা পেয়ে রঞ্জন বলে উঠল, ব্ল্যাকের দরেও একচিটে ধান জোটানো যায় না, কেন আছেন পড়ে এমন জায়গায়?

প্রণব বলে, এক-রাত্রির পথ পুরী—পুরী থেকে ফিরে লোকে সেখানকার ফুরফুরে ভাতের গল্প করে। যতবার চাইবেন, ততবারই ভাত দেয়। অথচ সারা-ভারত নাকি একই দেশ, ভারতীয়েরা একজাতি একপ্রাণ।

অদ্দূর কেন, রাত্রের ভোগান্তি কেন নিতে যাবেন? ঘরের কাছে একদৌড়ের পথ। যথার্থ বলছি, পাঁচ ক্রোশ পথও বোধহয় হবে না।

হেঁয়ালির মতো ঠেকছিল—তারপর বুঝে নিয়ে প্রণব বলল, পাকিস্তানের কথা বলছেন?

ঘাড় কাত করে সায় দিয়ে রঞ্জন বলে, বাংলাদেশের পুব-অঞ্চলের কথা। অঢেল ধান-চাল। নতুন ধান উঠেছে, পুরনো ধান কত আর ধরে রাখবে! পোকায় খেয়ে তুঁষ করে দেবে, গুমে গিয়ে অখাদ্য হয়ে যাবে। যে দাম পায়, চাষী তাতেই ছেড়ে দিচ্ছে। সেই দামও আপাতত বাকি—পয়সাকড়ি সচ্ছল হলে তখন দিয়ে দেবে। তার মানে দেবেই না অর্ধেক লোকে।

অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ রঞ্জন প্রশ্ন করল: বিশ্বাস হয় না বুঝি?

হলেই বা কি! সে তো পাকিস্তান।

পাকিস্তানের চালে বুঝি ভাত হয় না?

হি-হি করে রঞ্জন হেসে উঠল। বলে, একরকম নির্ভেজাল কলকাত্তাই মানুষ দেখেছি, তাদের কাছে শিয়ালদা পার হলেই বাঙাল-দেশ—পদ্মা-মেঘনা, সুন্দরবন, রয়াল-বেঙ্গল টাইগার। আর হাওড়া স্টেশন ছাড়লেই খোট্টা-মুলুক। আপনারও কি তাই? বর্ডার পেরিয়ে পাকিস্তানে পা ঠেকালেই অমনি বুঝি মার-মার কাট-কাট ধুন্ধুমার লেগে গেল। কত মুসলমান প্রাণ দিয়েছেন হিন্দু বাঁচানোর জন্মে, তার হিসাবটা জানেন?

প্রণব নিরুত্তর। আবছা রকম দেখা যায়, উবু হয়ে বসে হাঁটুতে মাথা রেখেছে।

নাছোড়বান্দা রঞ্জন বলে যাচ্ছে, পাকাপাকি থাকবেন কেন? দেশ ছাড়তে কে বলছে! আমার কথা সত্যি না মিথ্যে, দুটো চারটে দিন ঢু঱ মেরে পরখ করে আসুন। আপন কেউ না কেউ নিশ্চয় রয়েছেন, চিরকালের সম্পর্ক মানুষ একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে না—

প্রণব বলল, আমরা পেরেছি। আত্মীয়-স্বজন নেই কি আর কেউ—যাবার জন্মে তাঁরা কত লেখেন! বাবা অগ্নিশর্মা, নাম শুনতে পারেন না পাকিস্তানের।

ভিজে গলায় বলতে লাগল, আসলে শোক। কান্না সামলাতে গিয়ে রাগ দেখাতে হয়। কত ছিল এই সেদিন অবধি—ভদ্রাসন বাগবাগিচা ধানজমি। ঘুচিয়ে দিয়ে হিন্দুস্থানের একটুখানি এই বাড়ি পেয়েছি।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলে, সাংঘাতিক আগুনে পুড়েও বাবা দমেন নি। কিন্তু বিনিময়ের দলিলে সইয়ের পর থেকে

বিছানা ছেড়ে ওঠেন না। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলেন। উপমা দিয়ে বলেন, সারাদিনের খেলাধুলোর পর ছোট ছেলে ঘুমানোর মুখে 'মা যাবো' 'মা যাবো' করে—বুড়ো হয়ে গিয়ে আমারও ঠিক তাই, শুয়ে শুয়ে বাঁশতলির কথাই ভাবি কেবল।

আরও বিস্তর বলল প্রণব: ভাব খান না বাবা। মুখে তুলতে গিয়ে একদিন হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন—বাড়ির বাগানে কাঁদি কাঁদি ফলে আছে, মনে পড়ে যায়। খেজুরগুড় খান না: উঠোনের বাইনে খেজুররস জ্বাল দিয়ে কত গুড় হচ্ছে আমার বাড়ি, আর আমি বাজারের গুড় খেতে যাবো! না খেয়ে বাঁচা যায় না, সেই ক'টা জিনিসই খান তিনি শুধু।

॥ তিন ॥

সকালবেলা রঞ্জন বেরিয়ে পড়েছে। হাতছানি দিয়ে প্রণবকে কাছে ডাকল: কাল কিছু মিথ্যে বলেছিলাম।

প্রণব সহজ ভাবে বলে, জানি। বর খোঁজা মিছে কথা, আপনি ঘাটের দালাল।

জানলেন কি করে বলুন তো?

কথাবার্তা শুনে। ওপারে ধান-চালের হিমালয় পর্বত, ওপারের মানুষজন দেবতা-গোঁসাই। হিন্দুস্থানে যে যে জিনিসের অভাব-অনটন, ঘাট পার হয়েই দেখা যাবে সেই সমস্ত জিনিস ডাঁই দেওয়া রয়েছে।

রঞ্জন হাসল: বুঝেছি। ডোজটা বেআন্দাজি বাড়ানো হয়ে গেছে। খবর তা বলে বিলকুল মিছে নয়। না গেলে কি করে বুঝবেন? যত্নআত্তি পেলাম, ধানের একটা হদিস দিয়ে যাচ্ছি। পার না হতে চান, ঘাটে চলে যান একটি বার। ঘাটে চেষ্টা করে দেখুন।

প্রণব অবিশ্বাসের সুরে বলে, ঘাটে বুঝি ধানের গুদাম?

গুদাম কি বলেন, একটা মুড়ি-মুড়কির দোকান অবধি থাকতে দেয় নি। এপারে-ওপারে পাঁচ মাইল জুড়ে কারফিউ। লড়াই-এর সময় থেকে এই সব উপসর্গ—থানা-পুলিশ বর্ডার-পুলিশ তো আছেই, তার উপরে আবার পেল্লায় পেল্লায় ফৌজ বন্দুক-ঘাড়ে চক্কোর মেরে বেড়াচ্ছে। তবু যেতে বলছি। মল্লিকঘাটে গিয়ে মালিক শ্রীধর মল্লিককে ধরুন। অগতির গতি—তিনি ইচ্ছে করলে সমস্ত হতে পারবে। নিঝঁঝাটে ঘাট অবধি পৌঁছে দেবার মানুষও পেয়ে যাবেন—টৌনি দালাল তারা। আর দিনমানে ফৌজে তো বন্দুক মারে না—

একগাল হেসে বলল, আমাদের মল্লিকঘাটে রাত্রেও মারবে না।

মানুষ সেই একজনই—কিন্তু রঞ্জন দত্ত নয় এখন, রমজান গাজি। পরনে রাত্রিবেলার সেই ধুতি—কাছা খুলে ফেরতা দিয়ে লুঙির মতন করে পরা। মাথায় বাড়তি এক কিস্তিটুপি চড়েছে, এইমাত্র। দাড়ি রাখার রেওয়াজ উঠে গিয়ে হাল আমলে ভারি সুবিধা—চট করে ভোল পালটে হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া যায়।

সামসুল হকের দলিচঘরে রমজান নাস্তায় বসে গেছে। ফিস-ফিসিয়ে ভয়ের কথা বলে সামসুলের কানেঃ দিনকাল সুবিধের নয় মিঞাভাই।

সচকিত হয়ে সামসুল বলে, কেন, কি হল আবার ?

ভাতভিত্তি সবই যখন এই মাটিতে, জবানে কসুর করবেন কেন ? ডাইনে-বাঁয়ে বড় গলা করে শোনাবেনঃ হিন্দুস্থান বই কোন ঠাঁই আমি জানিনে। মুখে হরবখত এইসব বলে যাচ্ছেন, নজরটা ওপার পানে খোলা রয়েছে—গোলমাল বুঝলেই টুক করে অমনি পার হয়ে যাবেন।

সভয়ে সামসুল বলে, গোলমাল লাগছে নাকি ?

এই এখুনি না হল, মানুষ ক্ষিধের অন্ন পাচ্ছে না—লাগতে আর কতক্ষণ। তখন তো এক লহমার সবুর সইবে না।

সামসুল বলে, পেটের ক্ষিধে মোসলমান হিন্দু সবারই। আলাদা করে আমাদের ভয়টা কেন তবে ?

গোলমালের মুখ ঘুরিয়ে দিলেই হল—

একগাল হেসে আমাদের রমজান গাজি বলে, মজাই তো ওখানে। এতাবৎ তাই হয়ে এসেছে, ভবিষ্যতেও হবে। না হলেই ভাল। ভাই-বন্ধু বিস্তর যখন ওপারে, ধুকপুকির মধ্যে কেন থাকেন—মেয়েছেলেগুলো চালান করে দিয়ে হাতপা-ঝাড়া হয়ে বসে থাকুন। লেগে গেল তো সঙ্গে সঙ্গে পগার-পার—ওপারে

গিয়ে বুড়োআঙুল নেড়ে কলা দেখাবেন। আর না লাগে তো বুঝেসমঝে ঘরের বউঝি আবার ঘরে এনে তুলবেন।

সামসুল হক ভাবছে—ভাবছে। সাহস দিয়ে রমজান বলে, অত ভাবনার কি? আখচারই তো করছে সবাই। আপনার নিজের কিছু করতে হবে না, শ্রীধর মল্লিককে মুখের কথা বলে দিন—তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

সামসুল বলে, বলেন কি ভাইসা'ব! দুই মুলুকে লড়াই হয়ে গেল—দু-পা অন্তর ফৌজের তাঁবু। ডামাডোলের মধ্যেও মানুষ পারাপার হচ্ছে?

নিত্যিদিন, হরবখত।

আমার বেলা বেটাছেলেও তো নয়, মেয়েলোক—

রমজান জোর দিয়ে বলল, মেয়েলোক হলেও পায়ে হেঁটে তো চলতে পারবে। মল্লিকমশায়ের ক্ষমতা জানেন না—অচল পাহাড়-পর্বতও পার করে দিতে পারেন। পাহাড় নেই এ-তল্লাটে, তাই পরখ হতে পারল না।

হেসে বলে, গুটিগুটি যান না চলে একদিন। মল্লিকঘাট ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়। সরেজমিনে গিয়ে বন্দোবস্তটা দেখে আসুন।

সামসুলের চাচাতো ভাই তমিজ শহরে মাছ চালান দেয়। কাজকর্ম চুকিয়ে হিসাবপত্র সেরে ঘরে ফিরছে। দলিচঘরে রমজানের দিকে ঘন ঘন সে তাকায়।

ঘুরে এলো হঠাৎ। ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে, আগে যেন দেখেছি মিঞাসাহেবকে?

রমজান বলল, হতে পারে। বসে-থাকা মানুষ তো নই, সদাসর্বদা ঘুরতে হয়।

কাল বিকেলবেলা দেখলাম—

হতে পারে।

তখন আপনি ঠিক এই মানুষ ছিলেন না। চেহারায় আলাদা, সাজ-পোশাকে আলাদা।

রমজানের নির্বিকার জবাব: হবে তাই। ও-পাড়ার সেইরকম সাজ।

তমিজ সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলে, মাথায় টুপি চড়ালেই ধোঁকা দেওয়া যায় না। কোন জাত আপনি?

একটু চিন্তার ভান করে রমজান বলে, কোন জাত আমি যেন! সব সময় আবার মনে থাকে না—

যেন ভারি একটা রসিকতার কথা—হাসছে সে। হাসতে হাসতে সামসুলের গায়ে খোঁচা দিয়ে বলে, বলে দিন না বড়মিঞা, কোন জাত?

সামসুলের সঙ্গেও জমে গেছে, ভাব জমাতে মানুষটার জুড়ি নেই। ভাইয়ের উপর সামসুল ধমক দিয়ে ওঠে: বিয়ে-সাদি হচ্ছে না, জাত খোঁজাখুঁজির গরজটা কি হল? ধোঁকাবাজি নয়, ভাল কথাই বলছেন ইনি।

রমজান বলল, ঘাটের দালাল আমি। পারে যাবার মানুষ পটিয়ে বেড়াচ্ছি।

সামসুল হেসে টিপ্পনী কাটে: এক এক মরশুমে হজের লোক কুড়োতেও আসে এমনি।

রমজান বলে, হিন্দুদেরও আছে। পাণ্ডারা যাত্রী জুটিয়ে গয়া-কাশী প্রয়াগ-পুরী নিয়ে বের করে। ঘাটে গ্যাঁট হয়ে রইলাম, মানুষ আপনা-আপনি গিয়ে পড়বে—তাতে আর পোষাচ্ছে না এখন। সরকার কড়াকড়ি বাড়াচ্ছে, ঘাটোয়ালের খরচাও দুনো-তেদুনো বেড়ে গেছে। মানুষ বেশি করে না জোটালে পাত্তাড়ি গোটাতে হবে। রাজাবাবুর দুধে-পানা—জানেন না গল্পটা? ঠিক সেই জিনিস।

তমিজকে আহ্বান করে পাশের জায়গা দেখিয়ে দেয়:

বলুন মিঞাভাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় নাকি? ঠকজোচ্চোর নই, পরিচয় তো খুলে বললাম। গাঁয়ে গাঁয়ে টহল কেন মেরে বেড়াচ্ছি, সেইটে বলি। রাজাবাবুর দুধে পানা পাওয়া গেল—

নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসে রমজান বলছে:

গাইয়ের খাঁটি দুধ রাজাবাবুর জন্যে। চুমুক দিতে গিয়ে তার মধ্যে এককুচি পানা। রাজাবাবু আগুন, বাবুর্চির চাকরি ধরে টান: গোয়ালায় পানি মেশায়, তুমি আছ তবে কি জন্যে? বিস্তর কান্নাকাটি করে চাকরি রক্ষে হল। তখন সরকারের উপর হুকুম: বাবুর্চি তো আছেই, তুমিও ঐসময় নজর রাখবে—গোয়ালা যত ধূর্তই হোক দু'জনের চার-চারটে চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না। কিন্তু রাজাবাবুর মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে, দুধ যেন আরও পাতলা ঠেকে। এবারে খোদ দেওয়ানকে তলব: ওদের ঠকাচ্ছে—যত কাজই থাকুক গাই-দোওয়ার সময়টা আপনি নিজে গিয়ে দাঁড়াবেন। গোয়ালা এর পরে মরিয়া হয়ে রাজাবাবুর পা জড়িয়ে কেঁদে পড়ল: তদারক ঠেকান হুজুর, নয় তো দুধের সাদা রং আর বজায় রাখতে পারিনে। কি বৃত্তান্ত? না, বাবুর্চি সামান্য মানুষ, পেটের বহর ছোট, একটু-আধটু পানি মিশিয়েই পুষিয়ে যেতো। বাবুর্চির উপর সরকার বহাল হলো, তাঁর সঙ্গে আবার নতুন একদফা বন্দোবস্ত। দেওয়ানজি নিজে এবারে—এত্তবড় ওজনদার মানুষের অল্পে-সল্পে পেট ভরে না, আস্ত একখানা পুকুর দুধে না ঢাললে পোষানো যাবে না—

তমিজের আগের মেজাজ আর নেই, হাসির তোড়ে চৌদিক ফাটিয়ে দিচ্ছে। বয়সটা কম বলেই এমনধারা হাসি হাসে। পুরানো পিরীত-প্রণয়ের সম্পর্ক যেন দালাল-মানুষটার সঙ্গে—সকলের সুখ-দুঃখের খবরাখবর নিয়ে ঘুরছে, সৎবুদ্ধি বাতলাতে বসেছে এই দলিচঘরে। হিন্দু আর মুসলমান—থুড়ি, জাত আলাদা করে বলতে গিয়ে সংবিধানের ফ্যাশাদে না পড়ে যাই।—সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কাগজেপত্রে ফারাক না-ই মানি, দুই তরফের

মন দুটোর মাঝখানে অত্যাপি পর্দা ঝুলছে—সেই পর্দার এপার-ওপার করে বেড়াচ্ছে অবাধে, রঞ্জন বা রমজান যে-নামেরই হোক, এই মানুষটা।

রমজান বলে, ওপারে নাম উল্টেছে—ওরা সংখ্যালঘু, তোমরাই সেখানে সংখ্যাগুরু। পাকিস্তানেও সমান চলাচল আমার—কেমন করে ঠেকাবে? লড়াইয়ের মুখে শুনতাম, ওপারের স্পাইরা সব এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, গোয়েন্দার বাপের সাধ্য নেই আলাদা বাছাই করে ধরে। এপার থেকেও তেমনি নাকি ওপারে গিয়ে ঢুকেছিল। তা অকাজ-কুকাজ নিয়ে তারা যদি পেরে থাকে, আমার তো গলদ নেই, ভাল ছাড়া মন্দ বুদ্ধি দিতে যাইনে—আমার ভয়টা কিসের তবে? গাঁ-গ্রামের মানুষ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘাটে হাজির করা কাজ আমার: যাও, পার হয়ে গিয়ে দেখগে। চিরদিন যেমন যেতে আসতে। দেখে এসো, সবই ঠিক আছে আগের মতন। তা-ও নয়, আরও ভাল হয়েছে। দুটো মেটেহাঁড়িও একসঙ্গে থাকলে ঠোকর লাগে, হাঙ্গামা-হুজ্জতটা তোমাদের মধ্যে সেই জাতের। এখন দেখ গিয়ে, সব পরিষ্কার। অনেকদিন পরে পেয়ে সাতরাজার-ধন মাণিকের মতন মাথায় তুলে নেবে দেখো।

ঘাটোয়ালি কাজ-কারবার দিনকে-দিন কঠিন হয়ে উঠছে, মোকামে চুপচাপ বসে থাকবার উপায় নেই। গাঁয়ে গাঁয়ে লোক বেরুচ্ছে। গোড়ায় খাসা ছিল—চলতি যে থানা-পুলিশ, বর্ডারও তারা দেখত। একলা তারাই। তাদের সঙ্গে চিরকেলে দহরম-মহরম, দাদা-চাচা ডাকাডাকি আছে, বিয়েথাওয়া পালপার্বণে দাওয়াত পড়ে—বন্দোবস্ত এক-কথায় হয়ে যেত। যত দিন যাচ্ছে, কর্তারা কষে ইস্কুপ আঁটে—থানার পুলিশে ঠেকাচ্ছে না তো বর্ডার-পুলিশ জুড়ে দিল। রাজাবাবুর সেই বাবুর্চির উপরে সরকার চাপিয়ে দেওয়া আর কি। লাইন বরাবর বর্ডার-পুলিশ—কোথাও

তাঁবু খাটিয়েছে, কোথাও বা টিনের চালা তুলেছে। ফলে, অন্ত-কিছু নয়, ঘাটোয়ালের বন্দোবস্ত-খরচাই বেড়েছে কেবল। নিজেদের দিয়েই বুঝতে পারছি—

অমন যে ডাকসাইটে মল্লিকঘাট, তার অবস্থা তুলে ধরে রমজান বোঝাচ্ছে :

খেয়াঘাটে যেমন ডাক ওঠে, এসব ঘাটেও ঠিক তাই। পাশের কেউ ধরো বেশি ডেকে জিতে গেল—সেখানেই ঘাট চালু তখন, এ-ঘাট বাতিল হয়ে পড়বে। অবশ্য মল্লিকঘাটের হপ্তা যে উঁচুতে উঠে আছে, তারও উপরে উঠে কারো আর কারবার করে খেতে হবে না। থানায় দু-শ, ক্যাম্পে তিন-শ—হপ্তায় হপ্তায় এই টাকা শ্রীধর মল্লিক নিজে পৌঁছে দিয়ে আসেন, তারা ঘাটে আসতে যাবে না। ওপারেও ঠিক তাই—সেখানে আনোয়ার মিঞা দিয়ে আসে। তারিখের পরে আধলা দিনও মার্জনা নেই—ঘাটের উপর সঙ্গে সঙ্গে অমনি বুটজুতোর খটমটি, দুড়ুম-দাড়াম বন্দুকের দেওড়। কোন্ মক্কেল তারপরে আর সে-ঘাটে আসতে যাবে? একবার বানচাল হয়ে গেলে সেই ঘাট আবার জমিয়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। আরও আছে। পাবলিক সেয়ানা হয়ে গেছে—ইস্কুল লাইব্রেরি বারোয়ারির চাঁদা ছাড়ো, টিউবওয়েল বসাব এখানে ইদগাহ্ বসাব সেখানে—দাও তার টাকা। না দিলে হল্লা হবে, চুপিসাড়ে কাজ হতে পারবে না।

তা বলে মল্লিকঘাট নিয়ে এসব কিছু নয়। খরচপত্রে মল্লিকের কঞ্জুষপনা নেই, চতুর্দিকে আটঘাট-বাঁধা। কিন্তু সেই মোটা খরচা জোগাচ্ছে পারঘাটের মানুষই—গাঁট থেকে গচ্চা দিয়ে কেন ঘাট চালাতে যাবে? মানুষ যাতে গাদায় গাদায় পারাপার হয়, তাই দেখ। মানুষ বাড়লে তবেই পড়তায় পোষাবে।

অতএব গাঁয়ে গাঁয়ে দালাল ঘুরছে—একজন এই রঞ্জন অথবা রমজান—ঘরের মানুষ জপিয়ে-জাপিয়ে যারা ঘাটে পাঠায়।

বেরিয়ে পড়ো, ভয় কিসের? এপারে যেমন মানুষ, ওপারেও ঠিক তেমনি মানুষ। এককালে তারা বড় চিনত, এই ক'বছরে কতটুকুই বা ভুলেছে? তোমার আপন মানুষ, তোমারই মতন বাংলায় কথা বলে, মাথায় এক-থাবড়া তেল দিয়ে ঝপঝপ করে খালের জলে কয়েকটা ডুব দিয়ে ভাতের কাঁসি নিয়ে বসে যায়। মাঝবয়সি ছিল, এদ্দিনে হয়তো চুল পেকে সাদা হয়েছে—এই-মাত্র তফাত। দাওয়ায় বসে দিনান্তে তামাক টানতে টানতে মন তার উদাস হয়ে গেছে: কোথায় মিলিয়ে গেল আনন্দের হাট। পাঠশালার পড়ুয়া ছিল, বিশ বছর পরে নিশ্বাস ফেলে সে সহপাঠী অতীনের নামে কবিতা লিখেছে, দেখ:

'অতীন, তোমাকে
প্রবাসী আপন জন ডাকে:
আমার হৃদয়ে এসো, শান্তি দাও,
জড়াও আমাকে···
স্মৃতি ঘুরপাক খায়, দুলে উঠে
রক্ত ধমনীতে,
ফুঁসে উঠে রুদ্ধ ক্রোধ বাঁধ-ভাঙা
দুর্জয় সঙ্গীতে।···
প্রিয়জন, প্রস্তুতি নাও
'কংসবধ' পালা এলো—মারণাস্ত্র
শানাও শানাও।···
সবিতার হাত ধরে সম্মিলিত
মৈত্রী আসে ফিরে।
আপন জনের ডাক ক্রমে ব্যাপ্ত
সৌরলোক ঘিরে।'

আনন্দের হাট আবার জমাও না কেন ভাইসব? সব ঠিক আছে। ঘরবাড়ি ভুঁইক্ষেত আছে, মানুষেরা আছে, মানুষদের বুকের মধ্যে এক-পাহাড় করে কথা জমে আছে। এসো, বেরিয়ে পড়ি—

॥ চার ॥

এক ভারতবর্ষ কেটে ভারত ও পাকিস্তান—এক বঙ্গ কেটে দুই বঙ্গ। যথাবিধি আয়োজনে আগে থেকেই জমি বানানো। যত্রতত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—দেশ-খণ্ডন বিনে উপায় নেই।

মানব-মহিমা রাহুগ্রস্ত, সব আলো আঁধার হয়ে গেছে। মানুষে মানুষে উৎকট ঘৃণা—একালের ইতিহাসে যার একমাত্র জুড়ি হিটলারের ইহুদি-মারণ। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বেরিয়ে পড়ে নিরপরাধ লাখ লাখ জীবন নিল। জীবন নিয়েই রেহাই করলে বলতাম পরম দয়ালু। ধর্ম এমন সাংঘাতিক চিজ, টের পেলে ধর্ম-প্রবক্তারাই সকলের আগে তোবা করতেন। অশীতিপর বুড়ো-মানুষ, অবলা স্ত্রীলোক, অবোধ শিশু এমন কি সদ্যপ্রসূত বাচ্চাটাকেও বাদ দেয় নি—যেহেতু ধর্মটা আলাদা। এর চেয়ে বড় অপরাধ নীতিশাস্ত্রে ছিল না বুঝি সেদিন।

সেই আমাদেরই কিন্তু সৎপড়শি হয়ে শত শত বছর পাশাপাশি ঘরবসত। মারামারি লাঠালাঠি হয় নি তা বলে? দুই সহোদর-ভাইয়ের মধ্যে হয়। বাপ-ছেলে কিম্বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও হয়ে থাকে। এক-পক্ষ প্রজা, অপর-পক্ষ জমিদার বা মহাজন—বেশিরভাগ প্রজা মুসলমান আর বেশিরভাগ জমিদার-মহাজন হয়তো হিন্দু—লেগে গেল হিন্দু-মুসলমানে। মিলের হিন্দু-মজদুর বিগড়েছে, ঠেঙিয়েছে পাঠান শাস্ত্রী। কত এমনি ঘটেছে। কিন্তু এবারের এ-জিনিষের জাত আলাদা—অকারণ পুলকে খুনোখুনি। সভ্যতার অনেক মাইল-স্টোন পিছনে ফেলে এসে প্রগতির বিস্তর বাণী কপচে এমন জায়গায় এসে পৌঁছলাম, ধর্ম-বিবেচনায় দেশের ঘাড়ে কোপ ঝাড়া ছাড়া মহামান্য নেতারা আর উপায় খুঁজে পান না।

'কারো যেন চাঁদে যেতে চায়, কারো যেন
মঙ্গল গ্রহে অচেনা রাস্তা হাঁটে ;
আমাদের দিন হিন্দী-তামিল-তেলেগু
হিন্দু-মুসলমান—এই সব নিয়ে কাটে।'

ইতিহাসে একটুকু চক্কোর দিয়ে আসি, চলুন। বিদেশি ইংরেজ মাথার উপর। 'চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান, তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান' ইত্যাকার তুলনায় মন রি-রি করে জ্বলে। চারিদিকে নৈরাশ্য। হেন অবস্থায় দেশের মানুষ আশ্রয় খোঁজে পুরানো ঐতিহ্যের ভিতর। বৈদিক আমল স্মরণ করছে হিন্দুরা—হিন্দু রাজরাজড়াদের নানা বীরত্ব-উপাখ্যান। রামমোহনের ব্রাহ্ম-সমাজ দয়ানন্দের আর্যসমাজ শিবাজী-মহিমার পুনরুজ্জীবন ইত্যাদির ভিতরে হিন্দুর আত্মপ্রত্যয় লাভেরই প্রয়াস। মুসলমানও তেমনি স্মরণে আনছে হজরত মুহম্মদ ও খলিফাদের গৌরব-কথা, সুদূর স্পেন অবধি মুসলিম দিগ্বিজয়-কাহিনী। ওহাবি আন্দোলনের মূলেও এই। বিদ্বেষটা ইংরেজের উপর—পৃথক ভাবে দুই পক্ষ নিজ নিজ ঐতিহ্যে বল সঞ্চয় করছে। সিপাহি-বিদ্রোহে ইংরেজের বিরুদ্ধে উভয় শক্তি একত্র হয়ে একসঙ্গে ফেটে পড়ল।

উনিশ শতকের শেষাশেষি পাশা উলটে যাচ্ছে—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভারতবোধ কমে গিয়ে স্বজাতিবোধ প্রখরতর। ইদের উৎসবে হিন্দু যায়, হোলিতে মুসলমান আসে—এ জিনিস আর চালু থাকতে দিচ্ছে না। প্রতিযোগিতা দু-তরফের মধ্যে—একে অন্যের মাথায় চড়তে চায়। হিন্দু ভাবে, মুসলমানের আগে থেকে আমি ; দেশটা নিব্যূঢ় স্বত্বে আমাদের। মুসলমান ভাবে, এক কাঠা ভুঁইও ভারতে নেই যা আমার বাপ-দাদারা রক্ত-মূল্যে কেনেন নি ; ইদানীং মুঠো গলে বেরিয়ে গিয়ে থাকে তো ইসলাম আবার তা বিজয় করে নেবে। ঝগড়াটা বিশেষ করে মধ্যবিত্তের—খেটে

খেতে হয় তাঁদের, অথচ দেহের খাটনির তাগত নেই। তখন আর একে অন্যের উৎসবে যাচ্ছে না। পোশাক আলাদা করে ফেলেছে। আচরণে তফাত। হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলিম-সংস্কৃতি—দুটো আলাদা কথা কানে ঢুকছে এবার।

১৯৩৩ অব্দ। চৌধুরি রহমত আলি নামে জনৈক পাঞ্জাবি কেম্ব্রিজে থাকতেন, ভারত-ভাগের খেয়াল তাঁরই মাথায় এলো প্রথম। যে যে তল্লাটে মুসলমান বেশি, সেই সেই স্থলে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়া হবে। মুসলমানের স্বভূমি—মুসলিম-সংস্কৃতির ষোল-আনা বিকাশ সেইখানে হতে পারবে। রহমত আলির কল্পিত পাকিস্তান পশ্চিম-ভারতের ছয়টি প্রদেশের সমবায়—বঙ্গদেশ তার মধ্যে নেই, বঙ্গ-ভঙ্গের কথাও ছিল না। নাম হল পাকিস্তান সেই সেই প্রদেশের নামের অক্ষর নিয়ে। পঞ্জাবের প, আফগানিয়া অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের আ, কাশ্মীরের ক, বেলুচিস্তানের ইস্তান। সিন্ধু প্রদেশের S-অক্ষর ঢুকে গেছে ইস্তানের মধ্যে। নামকরণের পরে দিব্যি একটা মানেও দাঁড়িয়ে গেল—পাক অর্থাৎ পবিত্র, ইস্তান অর্থাৎ ভূমি। পবিত্র দেশ।

গোড়ায় খুব হাসাহাসি—এই আবার হয় কখনো? জাফরুল্লা খাঁ—পরে যিনি পাক-পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন—বলতেন, কিম্ভূতকিমাকার—কিমাইয়ারা, কবন্ধ। জিন্নাহ্, এক সময়ের ঘোরতর ন্যাশন্যালিস্ট, গোড়ার দিকে আমল দেন নি—ভেবেচিন্তে অনেক পরে মতলবটা নিয়ে নিলেন। প্রস্তাবটা নেওয়া হল ১৯৪০ অব্দে লীগের লাহোর অধিবেশনে। ফুর্তি পেয়ে রহমত তখন আরও দুই লেজুড় জুড়ে দিলেন: বঙ্গীস্তান (বাংলাদেশ ও আসাম) এবং ওসমানিস্তান (হায়দরাবাদ)।

সিপাহি-বিদ্রোহ থেকে ইংরেজের ঘোর আক্রোশ মুসলিম ধনী-মধ্যবিত্তের উপর। হিন্দুর পিঠ চাপড়াচ্ছে তারা তখন। বম্বে মাদ্রাজ ও কলকাতায় বৃটিশের গোড়ার ঘাঁটি—ব্যাপার-বাণিজ্য ও

চাকরির ব্যাপারে তিন জায়গাতেই হিন্দুরা ইংরেজের দৌলতে জাঁকিয়ে বসল। তারপরে কংগ্রেস ইংরেজের পিছনে লাগল, আর ইংরেজও বিগড়াল সঙ্গে সঙ্গে। এবারে হিন্দু হুয়ো, মুসলমানে পেয়ার পাচ্ছে। প্রিন্স-অব-ওয়েলস, পরে যিনি পঞ্চম জর্জ, ইণ্ডিয়া ঘুরে দেখে আঁতকে উঠলেন: কংগ্রেস দিনকে-দিন জোরদার হচ্ছে—সামাল, সামাল! ভাইসরয় লর্ড মিন্টো মাভৈঃ দিলেন: উচিত-দাওয়াই পড়বে শিগগির, বন্দোবস্ত হচ্ছে। সেক্রেটারি-অব-স্টেট বললেন, যা করবার তড়িঘড়ি করে ফেল, বিলম্বে বিলকুল সব কংগ্রেসে ঢুকে যাবে।

মুসলিম লীগ জন্ম নিল।

আলিগড়ের ইংরেজ-প্রিন্সিপাল ভাইসরয়ের সঙ্গে মোলাকাত সেরে এসে নেপথ্য থেকে এক ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করে দিলেন আগা খাঁর নেতৃত্বে। মিন্টো তো হাত ধুয়ে বসে আছেন, এক-কথায় তিনি রাজি: হাঁ হাঁ, ঠিকই তো, মুসলমান আলাদা সম্প্রদায় সন্দেহ কি! পৃথক আসন তাদের জন্য। নেশনের ঘাড়ে কোপ—অদূরকালে দেশের ঘাড়ে কোপ পড়বে, তারই ভূমিকা।

জিন্নাহ্ এ-সবের মধ্যে নেই। ধুরন্ধর রাজনীতিক হলেও রুচিবান মানুষ। ধর্মের নাম নিয়ে হৈ-হল্লোড়—বিদগ্ধ মন সায় দিচ্ছিল না বোধহয়। পয়লা রাউণ্ডটেবল-কনফারেন্সে জিন্নাহ্ সাম্প্রদায়িক দাবি মানতে চাইলেন না। তারপরে তিনি আর নেমন্তন্নই পান না। মত ঘুরল শেষে জিন্নাহ্‌র—বৃটিশ মতও ঘুরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুসলমানের একচ্ছত্র নেতা। বিস্তর বিরুদ্ধ-বাদী—মোমিন, খুদা-ই-খিদমদগার, খাকসার, অহ্‌রার-পার্টি ইত্যাদি ইত্যাদি জিন্নাহ্‌কে স্বীকার করে না। সংখ্যাতেও ঢের ঢের বেশি তারা। হলে কি হবে, বৃটিশ স্বীকার করে নিচ্ছে। ক্ষমতা যেন-তেন গতিকে বজায় রাখা নিয়ে কথা। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বরাবরই বৃটিশের উসকানি। মোপলা-অভ্যুত্থান ব্যাপারটা আসলে রায়তের অভ্যুত্থান

জমিদারের বিরুদ্ধে। জমিদারের মধ্যে হিন্দু বেশি হলেও মুসলমানও যথেষ্ট। কিন্তু সরকারি খরচায় ফোটো প্রচারিত হল : অহো, হিন্দুর উপরে মুসলমানের কী অত্যাচার দেখ। উড়িষ্যায় আবার দেখা গেল, মুসলিম গুণ্ডাদের অস্ত্রের জোগান দিচ্ছে ইংরেজ অফিসার। সে অস্ত্র জব্বলপুর সরকারি কারখানা থেকে সরানো—সরিয়েছে ইংরেজ পুলিশ ও আর্মি-অফিসারেরা। হিন্দু সাম্প্রদায়িক-দল ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক-দল উভয়কে সমস্বরে বাহবা দিয়েছে ইংরেজ আমলারা, খেতাব ও খেলাত দিয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা নাকি কংগ্রেসের চক্ষুশূল। স্লোগানই বিস্তর, কাজের বেলা লবডঙ্কা। সেই কোন কালে ১৯০৯ অব্দের মিণ্টো-মর্লি রিফর্ম—তখন থেকেই দেখুন। লীগের সঙ্গে প্যাক্ট করে ১৯১৬ অব্দে মেনে নেওয়া হল মুসলমান-ভোটে মুসলমানের নির্বাচন। মুসলমান দলে রাখার জন্যে নাকি এই কায়দা—কায়দা না বলে সাদা-কথায় ঘুসই বলুন। কায়দা পুনশ্চ দেখানো হল চারটে বছর বাদ দিয়ে ১৯২০ অব্দে—গান্ধিজীর নির্দেশে কংগ্রেস যখন খেলাফত নিয়ে মেতে উঠল। সর্বনেশে কাণ্ড—রাজনীতিক মতলব হাসিলের জন্য ধর্মীয় ভাবাবেগ ফেনিয়ে তোলা। ১৯৩২-এ আবার এক দফা কায়দা : বৃটিশ সাম্প্রদায়িক-রোয়েদাদ দিল—কংগ্রেসের চোখ বোঁজা, কানে আঙুল ঢোকানো। দেখতে পাচ্ছিনে বাবা, শুনতেও পাচ্ছিনে—যার নাম না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি। ন্যাকামি আর কাকে বলে! পদে পদে ভয়—এমনটি না করলে মুসলমান নাকি দলের বার হয়ে যাবে।

সাম্প্রদায়িক-রোয়েদাদ মঞ্জুর, তা সত্ত্বেও লীগ দাঁড়াতে পারে নি। ১৯৩৭-এর ইলেকসনের ফল দেখে জিন্নাহ্ হতভম্ব। মুসলিম ভোট যত পড়েছে, তার ভিতরে শতকরা সাড়ে-চার ভোটও লীগের পক্ষে নয়। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, সীমান্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও সিন্ধুপ্রদেশে লীগের একটা লোকও আসন পায়নি। কংগ্রেসের

জয়-জয়কার—এগারোটা প্রদেশের মধ্যে আটটায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য নিয়ে কংগ্রেস সরকার গড়ল। আর আমাদের জওহরলালের, জানেন তো, বক্তৃতার মুখে হুঁশজ্ঞান থাকে না। দম্ভ করে বলে ফেললেন, দেশে তো দুটো পক্ষই আছে যাদের ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায়—কংগ্রেস-পক্ষ আর বৃটিশ-পক্ষ। যারা বাঁচতে চাও, কংগ্রেস-পক্ষে ভিড়ে পড়ো।

আছে, আছে।

জিন্নাহ্ গর্জে উঠলেন। উক্তি শুনে কার না রাগ চড়ে যায়? জিন্নাহ্ বললেন, তৃতীয় পক্ষ আছি মুসলমান—কারো হুকুমবরদার নই আমরা।

এতাবৎ যেসব নেতা লীগের বাইরে, নানারূপ সর্ত দিয়ে তাঁদের টানাটানি হচ্ছে। হেনকালে লড়াই লাগল। লীগের পক্ষে যেন খোদাতা'লার আশীর্বাদ। ভারতবর্ষও নাকি লড়াইয়ে নেমেছে—

কংগ্রেস অবাক: সে কী, আমরা কিছু জানলাম না—

এইবারে জানো। ভাইসরয় তোমাদের হয়ে বলে দিয়েছেন।

এতবড় অপমান হজম করা যায় না। আট প্রদেশের সরকার একসঙ্গে পদত্যাগ করল। লীগের পোয়া বারো: আমরা আছি লড়াইয়ে—বৃটিশের সঙ্গে আমরা।

কংগ্রেস ইস্তফা দিয়েছে—'মুক্তি-দিবস' মচ্ছব হল সেই বাবদে। আরো তিনমাস পরে, ২৬ মার্চ ১৯৪০, লাহোরে পাকিস্তান-প্রস্তাব পাশ। দেশ-বিভাগ সত্যি সত্যি সম্ভব, তখনো কেউ ভাবছে না। ভয় দেখানো ব্যাপার, ধরে নিয়েছে—দর-কষাকষির অছিলা।

লড়াই জেঁকে উঠল। ইংরেজ বেদম মার খাচ্ছে। কংগ্রেসি সত্যাগ্রহে হাজার ত্রিশেক মানুষ জেলে ও অন্তরীণে। জাপান লড়াইয়ে নেমে গেছে, সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তাদের কবলিত। বর্মাও গেছে। ধেয়ে আসে নেতাজী-সুভাষের সৈন্যদল—ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছে। কলকাতায় বোমা।

রুজভেল্টের পীড়াপীড়ি : গতিক ভাল নয় গো, ভারতবর্ষের সঙ্গে এক্ষুনি ফয়শালা করে ফেল। চার্চিলের অনিচ্ছা, কিন্তু আমেরিকা চটলে সর্বনাশ। যুদ্ধ-পরিষদ ক্রীপসকে পাঠাল অগত্যা : শাসন-ক্ষমতা হাতে নিয়ে নাও তোমরা, যুদ্ধ-শেষে ধীরে-সুস্থে কনষ্টিট্যুশন বানানো যাবে। বটে রে! যে-ব্যাঙ্কে লালবাতি আসন্ন, তারই উপরে আগাম চেক—গান্ধিজী রসিকতা করে উপমা দিলেন।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। রুই-কাতলা থেকে চুনোপুঁটি গাদা গাদা ধরছে। জেলে আর জায়গা নেই। সীমান্তের বীর পাঠান খুদা-ই-খিদমদগাররাও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। জিন্নাহ্ ওদিকে তোবা তোবা করছেন : মুসলমান আমরা ওসব আন্দোলনে নেই। কংগ্রেস নেতৃত্ব পুরোপুরি জেলে—একতরফা তাঁরই গলা শোনা যাচ্ছে।

কী সব উত্তেজনাময় দিন। লড়াইয়ের সঙ্কট, তার সঙ্গে সরকারি আমলাদের অনাচার-অক্ষমতা, ব্যবসায়ীদের লোভ, খাদ্যের অনটন—মন্বন্তর। ক্রোধে আর ক্ষোভে জ্বলছে মানুষ। মুসলিম লীগের পাণ্ডারা বড় বড় দরের লোক—জমিদার জোতদার ব্যবসায়ী অর্থবান শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণী। নিজ নিজ স্বার্থে তাঁদের পাকিস্তানের গরজ। হিন্দুরাই বলতে গেলে শিল্প-বাণিজ্যে আধিপত্য করছে—পাকিস্তান বানিয়ে সেই আধিপত্য মুসলমান ভাগ্যবানদের হাতে আনবে। বৈষয়িক স্বার্থে হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা এড়ানো যাবে সর্বক্ষেত্রে, পাকিস্তান সরকারের বড় বড় চাকরিগুলো মুসলিম শিক্ষিতদের একচেটিয়া হবে। মুসলিম বুর্জোয়াশ্রেণী পাকিস্তানের স্বপ্নে পাগল হয়ে উঠল একেবারে।

কংগ্রেস কনষ্টিট্যুশন্যাল পদ্ধতি ও অহিংসার বুলি কপচাচ্ছে ক্রমাগত। অহিংসা লীগ থোড়াই কেয়ার করে, তাহলেও কথাবার্তা চালাতে দোষ কি। সর্বপক্ষ কথার তুফান বইয়ে দিচ্ছে।

লড়াই ইতিমধ্যে খতম। দিল্লীতে আই. এন. এ.-র বিচার বসিয়ে উল্টো-উৎপত্তি—সুভাষের কীর্তিকথা চাউর হয়ে পড়ল। হিন্দু-মুসলমান কোন একটা সমস্যাই নয় সুভাষের কাছে। সংগ্রামের পথে এগিয়ে এসব একেবারে তুচ্ছ হয়ে যায়। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে নিশিরাত্রে বেরিয়ে পড়লেন, সুদূর পেশোয়ারের মুসলমান আকবর খান বাহু বাড়িয়ে গ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছেন। আজাদ-হিন্দ রেজিমেণ্টে অগুন্তি সর্বত্যাগী মুসলমান। সেনাপতির মধ্যে মুসলমান শাহ্‌নওয়াজ খান। সর্বশেষ বিশ্বস্ত সঙ্গী মুসলমানই নেতাজী বেছে নিয়েছিলেন—হবিবর রহমান। আই. এন. এ-র রায় বেরোনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বম্বের নৌ-বিদ্রোহ। জব্বলপুরে সিপাহিদের ধর্মঘট। মিলিটারির উপর বৃটিশশক্তির নির্ভর—সেখানেই ফাটল ধরেছে। ধাপ্পা দিয়ে ভারতকে আর ভুলিয়ে রাখা চলবে না।

চার্চিল গিয়ে পার্লামেণ্টে শ্রমিক গবর্নমেণ্ট। ভারতবাসী খানিকটা ভরসা পেলো। ক্যাবিনেট-মিশন এলো : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, স্বাধীনতা নিয়ে নাও। দেশ-ভাগের কথাই নেই, তিনটে গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রদেশগুলোই প্রায়-সর্বেসর্বা। জিন্নাহ্‌ রাজি, ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলকে তাঁদের কথা জানিয়ে দিলেন। কিছু টালবাহানা করে কংগ্রেসও মোটামুটি রাজি হল। সম্মতি দিয়ে জওহরলাল প্রেস-কনফারেন্স ডাকলেন। বক্তৃতার মুখে বলে ফেললেন—এখন এই রইল, কনস্টিট্যুশন বানানোর সময় পরে দেখা যাবে। চমক খেলেন জিন্নাহ্‌ : বটে রে! ভিতরে ভিতরে তোমাদের ভিন্ন মতলব—কনস্টিট্যুয়েন্ট-এসেম্বলিতে হিন্দু মেজরিটি নিয়ে গরজমাফিক রদবদল করবে। না, গররাজি আমরা, স্বীকৃতি প্রত্যাহার। দেশ-বিভাগের পাই কম হলে শুনছিনে।

হতাশ মিশন ফেরত গিয়ে পার্লামেণ্টে রিপোর্ট দিল : হতে হতে বানচাল হল জিন্নাহ্‌র একগুঁয়েমির জন্য।

জলছিলেন তো জিন্নাহ্—আগুনে ঘৃতাহুতি। ২৯ জুলাই ১৯৪৬ বছরে লীগ-কাউন্সিলের সভায় ডাইরেক্ট-এ্যাকসনের প্রস্তাব পাশ। Good-bye to Constitutional Methods। মার, ধর, কাট। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

ওয়াভেল বিদায় নিলেন, মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয়। ড্যাডাং ড্যাডাং করে দেশের এ-মুড়োয় ও-মুড়োয় দুই কোপ। সর্বনাশের চেহারা দেখে আজও মাউন্টব্যাটেন হা-হুতাশ করেন, নানান কৈফিয়ৎ দেন: কী করব, নেতারা এককাট্টা দেশ-ভাগের জন্য। সৈনিকমানুষ আমি, অতশত বুঝতে পারিনি।

আবার বলেন, ওয়াভেলকে না পাঠিয়ে আমায় যদি আগেভাগে পাঠানো হত, দেশভাগ কক্ষনো হত না। আমি যখন গেছি, তখন আর উপায় ছিল না।

॥ পাঁচ ॥

পুরো এক মহাভারত। এখনই কিছু কিছু ফাঁস হয়ে যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছেন সর্বজনা। (আরও হবে—১৯৯৯ অব্দের আগে নাকি পুরোপুরি নয়, লিওনার্ড মোসলে কেতাবে লিখেছেন। মওলানা আজাদের বইয়ের রোমাঞ্চক উপসংহার তালা-চাবির মধ্যে আছে, তা-ও ততদিনে খালাস হয়ে হাতে এসে যাবে। আমরা থাকব না—লাঞ্ছনার দাহে যারা জ্বলেপুড়ে গেলাম। ভাবীকালের পাঠক ইতিহাসের মতন নিরাসক্ত মনে পড়বেন সেইসব চক্রান্ত-কাহিনী।)

সামনের উপর যা দেখেছি, তারই যৎসামান্য একটু বলি। স্বাধীনতা আসে-আসে সেই সময়টা। তরুণ অধ্যাপক নিখিলেশ্বর রায় লাহোর দয়ানন্দ কলেজে ইংরেজি-সাহিত্য পড়ান। নিখিলেশ্বরের বাপ বীরেশ্বরও অধ্যাপক—ইতিহাস পড়ান যশোর মধুসূদন কলেজে। শিক্ষকের গোষ্ঠি এঁরা—বাড়ি যশোর জেলাতেই।

যশোর পূর্ব-পাকিস্তানে যাচ্ছে। এবং লাহোর পশ্চিম-পাকিস্তানে নিশ্চয়।

বীরেশ্বর বলেন, ভয় যতই দেখাক আপন দেশভুঁই ফেলে আমি কোনখানে যাচ্ছিনে। চলে গেলে আরও সর্বনাশ—যারা পড়ে থাকবে, একেবারে নিঃসহায় হয়ে পড়বে তারা। ভীরুতাও বটে। বৃটিশের সঙ্গে চোখ-টেপাটেপি করে দুটো রাজনৈতিক পার্টি আপোসে মসনদ নিয়ে নিচ্ছে—সর্বস্ব ফেলে আমরা কি জন্যে তল্পিতল্পা নিয়ে পথে নামতে যাব ? গান্ধিজী দেশ-ভাগ মানেন না। India is indivisible—শ্রীঅরবিন্দও বলেন। দাঙ্গাবাজে মেরে ফেলে তো নিজের জায়গার উপরেই মরব। মরণ কোথায়

নেই? আজকের জিন্নাহ্-জওহরলালরাও মরবেন একদিন, দেখো।

ছেলের কথায় বলেন, নিখিল বিদেশ-বিভুঁয়ে অতদূরে রয়েছে। অসুবিধা বোঝে তো সে আসুক চলে। হিন্দুস্থানে গিয়ে থাকুক, আমি সেটা চাইনে। আমারই কাছে আসবে। বাপে-বেটায় একসঙ্গে থাকা যাবে, চেষ্টা করলে মাস্টারিও একটা জুটবে আমার কলেজে।

বাউণ্ডারি-কমিশনের কাজকর্ম ঘোরবেগে চলেছে। খোদ র‍্যাডক্লিফ সাহেব সিমলার উপর চেপে বসেছেন। হেনকালে রটে গেল, লাহোর পাকিস্তানে নয়—হিন্দুস্থানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। রাভি নদী দুই দেশের সীমানা।

আর যাবে কোথা! রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার, মহল্লায় মহল্লায় মীটিং। না দিল তো জবরদস্তি করে লাহোর আমরা নিয়ে নেবো। কয়েকটি অধ্যাপক-বন্ধু ফিসফিস করে নিখিলেশ্বরকে বললেন, গতিক সুবিধের নয়। আয়োজনের কিছু কিছু কানে আসছে। মোটে দেরি করবেন না এখানে, সরে পড়ুন।

১১ আগস্ট, ১৯৪৭। ফরমান বেরোয় নি তখনো। সিভিল-লাইনের বাসিন্দারা সকালে ঘুম ভেঙে দেখল, আগুন লকলক করে আকাশে উঠছে, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। মেয়ো হাসপাতালে রাত্রের খবর: মড়া এসেছে ছাপান্নটা, এক-শ ছাব্বিশটা সাংঘাতিক রকমের জখম। সার গঙ্গারাম হাসপাতালের মড়া তিরিশ। পরের দিন আরও জমল। শুধুমাত্র মেয়ো হাসপাতালে আমদানি: মড়া ছিয়াশি, জখম দু-শ'র উপর। রাস্তায় রাস্তায় মড়া একেবারে ঢিল-পাটকেলের মতো ছড়ানো—পা ফেলাই দায়।

আরও একটা দিন গেল। মোহনলাল রোডে নিখিলের বাসা—গৃহবন্দী হয়ে আছে তারা। এ দশা অনেকেরই।

তরুণী বউ লীলা, বাইশ বছর বয়স তখন। নিখিল ভয় পাচ্ছে, লীলা কিন্তু দৃক্‌পাত করে না। বলে, নবকান্তর বোন আমি—কা'কে ডরাতে যাবো? দুয়োর এঁটে এমনভাবে ক'টা দিনই বা বাঁচা যাবে—এসপার কি ওসপার।

পুরোনো লোক যাঁরা আছেন নবকান্ত মজুমদার নামটা কারো কারো মনে পড়তে পারে। বোমা-পিস্তল করে ফাঁসি গিয়েছিলেন। লীলারই বড়দাদা তিনি। ছোড়দা হেমকান্ত—লোহার কারখানা চালান তিনি, গ্রিল বানানোর কারখানা, কলকাতা কৃপাসিন্ধু লেনে।

ভেবেচিন্তে নিখিল অগত্যা পথে নেমে পড়ল স্ত্রী ও পুরোনো দাসীকে নিয়ে। দাসী কুন্তী। ফুল্লরা তখন গর্ভে এসেছে লীলার, কোলে নামে নি। আসন্ন সন্ধ্যায় তিনজনে পথে বেরুল। অগণ্য মানুষ বেরিয়ে পড়েছে। লহমার মধ্যে নরস্রোতে মিলে-মিশে তারাও একাকার হয়ে গেল।

স্বামীর পিছু পিছু লাহোরের রাস্তায় সেই লীলা বেরিয়েছিল—মাস আষ্টেক পরে হেমকান্ত খবর পেয়ে এক সেবাশ্রম থেকে ট্যাক্সি করে বোনকে বাসায় এনে তুললেন। কোলে একফোঁটা মেয়ে—ফুল্লরা। আট মাস কে বলে, বুঝি আট-শ বছর কেটে গেছে। যেন কত জন্ম-জন্মান্তর পার করে এসেছে লীলা সেই তার বছর বাইশেক জীবনের মধ্যে।

পথে বেরিয়ে পড়ল লীলা, কুন্তী আর অধ্যাপক নিখিলেশ্বর—সেদিনের কথা বলি। মানুষ পিলপিল করে পিঁপড়ের সারির মতো চলেছে। এত বড় লাহোর শহরে আজ বুঝি একটিমাত্র পথ—স্টেশনে যে পথ গিয়ে শেষ হয়েছে। গাড়ি-চলাচল বন্ধ—প্রশস্ত রাজপথ মানুষে ভরভরতি। ডাইনে বাঁয়ে গলি-ঘুঁজি, ভুলেও সেদিকে পা ফেলবে না। চোখেও তাকিয়ে দেখবে না। শহর জুড়ে রাতারাতি

বুঝি হাজার হাজার ফ্যাক্টরির চোঙা উঠে গেছে। ধোঁয়া ওঠে অগুন্তি মুখে, ভক করে এক একবার আগুনের হলকা। যত দ্রুত সম্ভব পথ পার হয়ে চলে যাও। ভরসা নেই যতক্ষণ শহরের ভূমির আছ। বাজপাখির মতন কখন ছোঁ মেরে এসে পড়ে। পথ পার হয়ে দ্রুত গিয়ে স্টেশনে ওঠো।

তা-ও কি বাঁচেয়ো? মরণ-ফাঁদ স্টেশনে, পরে বোঝা গেল। চতুর্দিকে তাড়া করে একটা মুখ—রেলস্টেশনের মুখটাই খোলা রয়েছে শুধু। শিকারের নিয়মও তাই—জঙ্গল পিটিয়ে জন্তু-জানোয়ার একটা জায়গায় এনে জড় করে। প্লাটফরমে পুলিশের কর্ডনের ভিতরে আশ্রয় নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় আছে। কর্ডনের বাইরে যাওয়া, এমন কি এদিক সেদিক ফালুক-ফুলুক তাকানোও মানা। অবৈধ কৌতূহলের পরিণাম এক্ষুনি একটা চোখের উপর দেখা গেল। ওয়েটিং-রুমের পাশে কয়েকটা সিন্দুক মিলিটারি পাহারায়—কী আছে সিন্দুকের ভিতরে খোদায় মালুম। যেতে যেতে ক'জনে সেখানটা দাঁড়িয়ে পড়েছে—খটাখট গুলি। খাড়া মানুষগুলো চক্ষের পলকে লুটিয়ে পড়ল। দুনিয়ার মধ্যে মানুষ মারার চেয়ে সোজা কাজ আর নেই—এত সস্তা প্রাণ মানুষ ছাড়া কোন জীবেরই নয়। কর্ডনের ঘেরের ভিতর চুপচাপ বসে আছে অতএব। বসে বসে ভাবনাচিন্তাও যেন অসাড় হয়ে গেছে।

হুড়মুড় করে ফ্রন্টিয়ার-মেল এসে পড়ল। বসেছিল মানুষ, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। ইঙ্গিত পেলেই কর্ডন ভেঙে ট্রেনের উপর ছুটে গিয়ে পড়ে। গিয়ে কি হবে, আষ্টেপিষ্টে বোঝাই ট্রেন—ছাতের উপরেও একমুঠো তিল ছড়ানোর ফাঁক নেই। তৃষ্ণায় কয়েকটি লোক প্লাটফরমে নেমে পড়েছে। জল কে রাখতে গেছে কলসি ভরে—একেবারে শেষ প্রান্তে কল একটা দেখা যায় বটে। আশায় আশায় সেইমুখো চলল—কিন্তু কতদূর? খটাখট গুলি

অলক্ষ্য কোন দিক থেকে। ঠিক সেই মুহূর্তে—ভয় পেয়েই বুঝি, ট্রেন প্লাটফরম ছেড়ে ছুটে বেরুল।

বসে পড়ে আবার জনতা। ভিড়ের মাঝখানটায় মেয়েদের রেখেছে। বিশেষ করে যুবতী মেয়ে যেগুলি। লীলাও তাদের মধ্যে।

মিলিটারি চক্কোর মারছে—মেয়েদের দিকটায় বেশি। সৈন্য কাছাকাছি এলেই নিচু হয়ে মেয়েরা ভুঁয়ের সঙ্গে মিশে যায়—মুখ কিছুতে দেখতে দেবে না। দেখলেই যে যুবতী বলে বুঝে ফেলবে, সে অবস্থা নেই অবশ্য কারো। দুশ্চিন্তায় অনাহারে আর অনিদ্রায় সবগুলি চেহারা একরকম—সবাই বুড়ি। তা হলেও নারী তো বটে—ষণ্ডাগুলোর দু-চোখে দু রকমের লোভ : ধনদৌলত গয়না-পত্তোর লুঠ করবে, নারী লুঠ করবে।

আবার একটা ট্রেন—সিন্ধ-এক্সপ্রেস। জনতা উঠে দাঁড়াল আবার। এবারে নির্ঘাৎ, খালি কামরাই প্রায় সমস্ত। আগের ট্রেনে জায়গা হয় নি বলেই বিবেচক রেলকোম্পানি বোধহয় খালি কামরার ব্যবস্থা করে এনেছে। এখান থেকে বোঝাই করে নেবে। আর কি! এতকালের ভালবাসার লাহোর, বিদায় বিদায়! লাহোরের মাটি পদতল থেকে সম্পূর্ণ সরলে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচি রে বাবা।

উঁহু, এক্ষুনি নয়—সামান্য কিছু দেরি। কামরা সব নোংরা হয়ে আছে, সাফসাফাই হয়ে আসুক, তারপরে—

সাইডিং-এ নিয়ে গেল সাফ করতে। অদূরে নিচু একটা প্লাটফরম। মানুষ ওঠা-নামার জন্যে নয়—রেলের পাটি স্লিপার ইত্যাদি নামায় এনে ওখানে, কয়লা নামিয়ে গাদা করে। দরজা খুলে দিয়েছে কামরার, নোংরা-জঞ্জাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিচে ফেলছে। কর্ডন দিয়ে রিফিউজি এদের গোল করে ঘিরে রেখেছে—জঙ্গলের ব্যাঘ্রসঙ্কুল

জায়গায় বাওয়ালি যেমন মন্ত্র পড়ে গণ্ডি ঘিরে রাখে। বিপদ সর্বস্থানে, গণ্ডির এই জায়গাটুকু কেবল বাদ।

এইও, খবরদার! নজর তুলবে না, তাকাবে না ওদিকে।

এই সব বলেই কৌতূহল আরও তাতিয়ে দিচ্ছে। হায় রে হায়, না দেখলেই ছিল ভাল। দেখে তাড়াতাড়ি চোখ বোজে। মড়া —টাটকা, রক্তাক্ত। অর্ধেক-মরা বারোআনা-মরাও কি নেই ঐ সবের মধ্যে—কে আর তফাত করতে যাচ্ছে! আস্ত মড়াগুলো কাবার হল তো এবারে খুচরো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কাটা হাত-পা পাঁজা করে বাইরে ফেলছে। কাটা-মুণ্ড ছুঁড়ে দিচ্ছে—বলের মতন গড়িয়ে পড়ছে। নিচু প্লাটফরমে মড়া ছড়িয়ে রইল। থাকুকগে এই রকম—লোকগুলো অধীর হয়ে পড়েছে, গাড়ি রওনা করে দিয়ে ধীরেসুস্থে ওসব সরানো যাবে।

ইঞ্জিন পিছিয়ে ট্রেন আবার আদি-প্লাটফরমে এনে দাঁড় করাল। খালি কামরা হা-হা করছে, আরাম-সে ওঠোগে এবার। হুড়দাড় করে সব উঠে পড়ল। উঠে আর্তনাদ করে, কাঁপে থরথর করে। রক্ত যত্রতত্র—মেঝেয় চাপ চাপ রক্ত জমে রয়েছে। এতক্ষণ সাফসাফাইয়ের পরেও গুঁড়োগাড়া পড়ে আছে ইতস্তত—কামরা কোন্ প্রক্রিয়ায় খালি হয়ে এসেছে, বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। আমাদের উপরেও এই জিনিষ চলবে তো—পিছনে যারা পড়ে থাকছে তাদের জন্য কামরা খালির তাগিদে?

মানুষ উঠে পড়েছে, ঠাসা কামরা, ট্রেন তবু ছাড়ে না। আধঘণ্টার উপর কেটে গেল। গার্ড-ড্রাইভার আর মিলিটারিতে শলাপরামর্শই কেবল।

অবশেষে নেমে পড়বার হুকুম, গাড়ি যাবে না।

কী হল হঠাৎ? এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

একটা কথা কানাকানি হচ্ছে, অমৃতসরেও নাকি জবর রকম হাঙ্গামা। বদলা নিচ্ছে তারা। সত্যিই তো, হার মানবে কেন, কম

কিসে? শলাপরামর্শ অন্তে গার্ড-ড্রাইভার ডেরায় গিয়ে উঠল। ভাল খবর না আসা অবধি বর্ডার পার হওয়া যাবে না। তেমন খবর ক'দিন কিম্বা ক' মাসে এসে পৌঁছবে, কেউ বলতে পারে না।

তবে? বাড়ি ফেরা কখনো নয়—গিয়ে হয়তো দেখবে বাড়ি ইতিমধ্যে ছাইয়ের গাদা। স্টেশন থেকে ক্যাম্পে। কখন কোথায় হামলা হবে ঠিকঠিকানা নেই, ক্যাম্পই নিরাপদ মোটের উপর।

কেউ আবার ফিসফিসিয়ে উল্টো কথা বলে, ক্যাম্পে নিয়ে হাতের কাছে তৈরি রাখছে। কসাইরা যেমন গরু-ছাগল রাখে। এপার-ওপারের পাল্লাপাল্লিতে, ধরো, হার হয়ে যাচ্ছে লাহোরের—চট করে যাতে পূরণ করে নিতে পারে সেই ব্যবস্থা। কাঁহাতক হড্ড-হড্ড করে খুঁজে বেড়াবে—ভাণ্ডারে মাল মজুত রইল, প্রয়োজন মতো বের করে নিলেই হল।

কত রকম এমনি বলাবলি। স্বামীর সঙ্গে লীলার সেই ছাড়াছাড়ি—সাতচল্লিশের আগস্ট মাসের মাঝরাতে লাহোর স্টেশনে। মিলিটারি-ট্রাকে পুরুষদের তুলে—অধ্যাপক নিখিলেশ্বর রায়ও তার মধ্যে—নিয়ে গেল মডেল-টাউনের ক্যাম্পে। এবং মেয়েদের জন্য অতিশয় নিরাপদ জায়গা—গুরুদ্বার-হরগোবিন্দ।

আর আজ উনিশ-শ ছেষট্টি। উনিশ বছর নিখিলেশ্বরের খবর নেই। মডেল-টাউন থেকে কী গতি হল, কেউ জানে না। নিখোঁজ এমনি তো হাজার হাজার—পরিণাম কারো কারো পরে জানা গেছে। নিখিলেশ্বরের পরিণামও ওই থেকে আন্দাজ করা চলে।

॥ ছয় ॥

হেমকান্তর কারখানা কলকাতা কৃপাসিন্ধু লেনে। বিয়েথাওয়া করেছেন তিনি, বাচ্চা ছেলে আছে একটা। তা সত্ত্বেও উদাসীন ভবঘুরে চালচলন—বড়ভাই নবকান্তর স্বভাবের খানিকটা পেয়েছেন। পুরোপুরি দাদারই পরিণাম হয়তো হয়ে যেত, কিন্তু বয়সে তিনি অনেক ছোট নবকান্তর চেয়ে—কনিষ্ঠ বড় হয়ে সহকারী পাকা-সাকরেদ হবে, ইংরেজ সরকার সে পর্যন্ত নবকান্তকে জীবন্ত রাখল না। কারখানা দেখাশোনার অভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে—হেমকান্তর সংসার এবং ডজন দুই পোষ্যপ্রতিপাল্যের গ্রাসাচ্ছাদনটা কোন রকমে কুলিয়ে যায়। তাতেই খুশি তিনি।

সরকারি কর্তাব্যক্তি একজন সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন : লোহা পিটিয়ে মরেন কেন মশায়, ভাইয়ের পরিচয় দিয়ে দরখাস্ত করে দিন। এত লোকের হচ্ছে, আপনারও একটা-কিছু হয়ে যাবে।

হেমকান্ত জবাব দিলেন : দাদার জীবন-দান যারা মিথ্যে করে দিল, হাত পাততে যাব তাদের কাছে ? থুঃ। দাঁড়ান না, মুখোস খুলে দিয়ে সর্বনেশে চক্রান্ত ফাঁস করে, আজকে না-ই হোক—ইতিহাসের পাতায় ওদের দাগী করে যাব। বড় কাজ আমার তাই এখন, সেই কাজে লেগে আছি।

সেদিন যাঁরা পাকে-চক্রে নেতা হয়ে পড়েছিলেন, আক্রোশ তাঁদের উপরেই। যেহেতু রায় দিয়েছিলেন : দেশ-খণ্ডনই হোক তবে, নইলে অবশ্যম্ভাবী সিভিল-ওয়ার। সিভিল-ওয়ার নাকি এক ভয়ানক কাণ্ড—চাক্ষুষ নাই দেখি, ইতিহাসে রোমহর্ষক বিবরণ পড়েছি। নাকি হাঙ্গামা-রক্তপাত হয়, মানুষ মরে। অহিংসার পূজারি আমরা, সে জিনিষ হতে দেবো ? তোবা, তোবা!

[গুহ্য কথা : জেলে চর্বচোষ্য ভোজ খেয়ে আরামে অবশ্য দিন

কাটে। তবু বুড়ো হয়ে গিয়ে এখন ওসবে বিতৃষ্ণা ধরেছে। তার উপরে মসনদটা ছুঁই-ছুঁই করেছি—বিলম্বে ধরো মরেই গেলাম, তৈরি মসনদে অন্ত লোকে গদিয়ান হবে। তেমন স্বাধীনতায় গরজ কি আমাদের? পাওয়ার মতন যত-কিছু আছে, এক্ষুনি চাই—নগদ নগদ।]

অতএব মহাত্মা গান্ধি-কি জয়। মানুষের ঘাড়ে কোপ এড়ানোর ছলে দেশের ঘাড়ে কোপ। ল্যাজা আর মুড়ো ছিটকে পড়ল দু'দিকে—জুড়ে গেঁথে ভিন্ন এক রাজ্য, যার নাম পাকিস্তান। বিশ্বযুদ্ধের দৌলতে ফোঁকটে মেলা টাকার মালিক হয়ে পড়েছি, দুই রাজ্যে এবারে বখরা করে নিয়ে সুখে শান্তিতে বাদশাহি করি আসুন।

করুকগে ছি-ছি হেমকান্তরা, কে পোঁছে ওদের? ভাওনচণ্ডী সেই মাতব্বরদের মূর্তি গড়ে গড়ে দেশের অন্ধিসন্ধি ভরে দিচ্ছে, রাস্তাঘাট এবং হাজারো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নামগুলো জুড়ে গেঁথে রাখছে। মরে গেছেন বটে, তা হলেও লোপ পেয়ে যেতে দেবে না—সরকার সেজন্য বদ্ধপরিকর।

হেমকান্তরাও দমেন না: করবেই তো এসব, ক্ষমতা যতক্ষণ হাতে রয়েছে। কিন্তু ক্লাইভরা কি স্বপ্নেও জানত, সাধের ক্লাইভ স্ট্রীটের নাম পালটাবে একদিন? সেই দিন সামনে। খুব বেশি যে দেরি আছে, তা-ও নয়।

লীলার সন্ধান হল আট মাস পরে।

খুঁজে খুঁজে কৃপাসিন্ধু লেনে ভলান্টিয়ার এসে হেমকান্তকে প্রশ্ন করে: আপনার বোন আছেন কেউ? মাথার ঠিক নেই, রেল-পুলিশ কোন রকমে হদিস করতে না পেরে আমাদের সেবাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছে। আজকেই কী ভাগ্যে স্মৃতি একবার চমক দিয়েছিল, সেই সময় আপনার নাম-ঠিকানা দিলেন।

এখন আবার কী অবস্থা, বলতে পারব না। চলুন আমার সঙ্গে—চিনতে পারেন কি না দেখা যাক।

লীলা চিনবে কি না-চিনবে—হেমকান্ত নিজেই যে সহোদরা ছোট বোনকে চিনতে পারেন না। কী ভয়ানক চেহারা। কত কাল ধরে যেন খায় নি, ঘুমোয় নি। সত্যি সত্যি মরে গেছে হয়তো প্রলয়-হাঙ্গামার মধ্যে—মৃত্যুর পর প্রেতিনী হয়ে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। হেমকান্তকে দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। চোখ ফিরিয়ে নেয়, আবার দেখে। বুঝি-বা ঝাপসা ঝাপসা স্মৃতি। পৃথিবীর মধ্যে আপন মানুষ ও নিরাপদ আশ্রয় থাকতে পারে, কিছুতে যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। বুকের উপরে মেয়ে—এক মাসের মেয়েটা সর্বক্ষণ আঁকড়ে ধরে আছে। কোন মানুষকে বিশ্বাস নেই—একটুকু আলগা পেলেই বুঝি মেয়ে ছিঁড়ে নেবে বুক থেকে।

ট্যাক্সি করে হেমকান্ত বাসায় এনে নামালেন। হেমকান্তর স্ত্রী কল্যাণী লীলার চেয়ে অল্প-কিছু বড়। মেয়ে নেবার জন্যে সে হাত বাড়াল। চোখে আগুন ছড়িয়ে লীলা পিছন ঘুরে দাঁড়ায়। কল্যাণীর ছেলেটা আবার সেদিকে,এই তিন-চার বছর বয়স—ভয় তাকেও যেন। একছুটে লীলা বারাণ্ডায় গিয়ে উঠল। সবাই শত্রু—দুনিয়াময় শত্রুই ঘুরছে কেবল।

হেমকান্তর বন্ধুরা 'দিদি' 'দিদি' করে ডাকছে, যদিও বয়সে লীলা অনেক ছোট। আতঙ্কে সে ছুটে পালায়। থালায় খাবার সাজিয়ে সামনে বসানোর চেষ্টা হল—খাবার পা দিয়ে ছড়িয়ে দেয়। বারাণ্ডার এক দিক দরমায় ঘিরে কল্যাণীর সঙ্কীর্ণ শোবার ঘর—কোন রকমে একটা তক্তাপোষ পড়েছে, ছেলে ও স্বামী নিয়ে সেখানে থাকে। তক্তাপোষে পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিল—শুয়ে শুয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিক। লীলা কিন্তু ধপ করে খালি মেঝেয় বসে পড়েছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলকে দেখে। আর হেমকান্তকে দেখছে বারম্বার। চুপচাপ। এত করে বলছে

তক্তাপোষের উপরে উঠে বসতে—নড়ছে না লীলা, কথারও জবাব দেয় না। অনেকক্ষণ কাটল এমনি। তারপর হাউ-হাউ করে আকুল কান্না কেঁদে ওঠে। বুঝি মনে পড়েছে এতক্ষণে, চিনেছে এইবার।

কিছুকাল পরে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে—কৌতূহলের বশে কল্যাণী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, অমন কালসিটে দাগ কিসের ঠাকুরঝি—গলায় দড়ি দিয়েছিলে ?

হতে পারে। সমস্ত ঝাপসা, কিচ্ছু তো আমি মনে করতে পারিনে। কী-একটা হয়েছিল যেন গলায়।

একটুখানি ভেবে নিয়ে আবার বলে, আমার দাদা নবকান্ত আবার যদি জন্ম নিয়ে আসেন, তাঁর গলাতেও বোধহয় এমনি দাগ দেখা যাবে। ফাঁসির দড়ির দাগ।

বলে একেবারে চুপ হয়ে যায় লীলা। চুপচাপ স্মৃতি হাতড়াচ্ছে। গলার দাগের ব্যাপারটা খানিক খানিক যেন স্মরণে আসে—গলার উপর দড়ির দাগ নয়, দু-হাতের দশ আঙুলের ছাপ। দু-হাতে গলা টিপে দম আটকে মারতে গিয়েছিল। বাইরের কেউ নয়, কুন্তী—

কুন্তী এই ?

হেমকান্ত স্তম্ভিত। কল্যাণী জানে না, কিন্তু হেমকান্ত জানেন খুব। নিখিলেশ্বরের লাহোরের বাসার জন্য বাপ বীরেশ্বর যশোর থেকে জানাশোনা বিশ্বাসী এই দাসীটিকে জুটিয়ে দিয়েছিলেন।

এতকাল নিমক খেয়ে কুন্তীরও শেষে এই কাজ ?

নিমকের মর্যাদা রেখেছিল কুন্তী—

ভাবতে গিয়ে খাপছাড়া এক একটা ঘটনা মনে ভেসে আসে। লীলার চোখে-মুখে উত্তেজনা ফুটে বেরোয়। বলে, কী করবে, আমিই তো বলেছিলাম কুন্তীকে। নিজে কত রকমের চেষ্টা করলাম—হয় না। দুই-পা জড়িয়ে ধরলাম কুন্তীর—

গুরুদ্বার-হরগোবিন্দ সুরক্ষিত আশ্রয়। ডোগরা সৈন্য পাহারায় আছে। সামনাসামনি হবার জো নেই, আক্রমণ অতএব চোরা-গোপ্তা পদ্ধতিতে চলল। রাত্রি হলেই অজস্র আগুনের গোলা পড়তে থাকে এদিক-সেদিক থেকে। আগুন ছুঁড়ে ছুঁড়ে অন্ধকারে সব ঘাপটি মেরে আছে। ভয় পেয়ে যেই বেরিয়ে পড়েছে, মুষলধারে গুলি। ছিটকে পড়ছে মেয়েরা চতুর্দিকে, মরছেও অনেকে। প্রাণে মরল তো বেঁচেই গেল—বন্দুকওয়ালারাও চায় না, গুলি গিয়ে গায়ে লাগুক। এত সামান্যর জন্যে নিশিরাত্রে জেনানা-ক্যাম্পে হানা দেয় নি।

এই অবস্থার ভিতর লীলা কুন্তীর পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, মেরে ফেল কুন্তী। নিজের ক্ষমতায় পেরে উঠলাম না, তুই আমায় বাঁচা।

কেমন করে?

মারা তো উচিতই, উপায় ভেবে পায় না কুন্তী। অস্ত্রশস্ত্র কোনদিকে কিছু নেই।

লীলা বলল, গলা টিপে আমায় মেরে ফেল।

সে একটা উপায় বটে। কুন্তীর মনে এবার নিজের ভাবনা চেপে বসল: দাঁড়াও, আমার গলা কে টিপবে সেই লোক আগে ঠিক করে নিই।

একে তাকে বলছে—কিন্তু বিচার-বিবেচনা করে ধীরেসুস্থে একজনে আর একজনকে মারবে, কেউ বড় সাহস পায় না।

অবস্থা চরম হয়ে আসে। আর, লীলা একেবারে পাগল হয়ে উঠল। লাল-টকটকে দুটো চোখ কোটর থেকে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসে। যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করছে কুন্তীকে: বেইমান, নেমকহারাম, সাহস দিয়ে পথে কি জন্যে নামালি তবে?

থাপ্পড় দিল কষে। বাইরে মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ, আগুনে

আগুনে সেই রাত দুপুরে যেন দিনমান। উদ্ধার নেই—একেবারে শেষক্ষণ এসে পড়ল।

সকাতরে চোখ তাকায় কুন্তী পাঞ্জাবি বউটির দিকে। অবস্থা বুঝে এতক্ষণে এইবারে সে রাজি—সে কুন্তীর গলা টিপে মারবে। সেই স্ত্রীলোকও তারপর কোন্ লোকের হাতে মরবে, ঠিক হয়ে আছে। আর এই এতক্ষণ ধরে লীলা তুমুল গালিগালাজ করছে। লাথি দিল সে কুন্তীকে।

কুন্তীর চোখ বড়-বড় হল। দু-চোখে আগুন। রুক্ষ ছড়ানো চুল ঝাঁকড়া-মাকড়া হল সিংহের কেশর ফোলানোর মতন। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল লীলার উপর। মাটিতে লীলা দড়াম করে পড়ে গেল। পাশে হাঁটু গেড়ে কুন্তী প্রাণপণে দু-হাতের দশটা আঙুলে আঁকড়ে ধরেছে লীলার গলা। সেই ভয়ঙ্কর চেহারাটা এক ঝলক লীলা দেখেছিল। পলক মাত্র।

এই অবধি মনে পড়ছে। আরও কত কী ঘটে গেছে তারপর। ঝাপসা ঝাপসা যদিই বা মনে এসে যায়, সেসব মিথ্যে বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। মিথ্যে, মিথ্যে, অমনধারা সত্যি সত্যি ঘটতে পারে না। মানুষের ইতিহাস এত নোংরা কেমন করে হবে ?

ধাক্কা খেতে খেতে অবশেষে একদিন কলকাতায়—ছোড়দা হেমকান্তর বাসায়। কোলে এক মাসের মেয়ে। যার নাম আজ ফুল্লরা হয়েছে। আরও একটা নাম জোহরা—লীলাই রেখেছে এই কিছুকাল আগে।

মাসখানেকের মধ্যে লীলা খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। চেহারায় জেল্লা ফিরেছে। হেমকান্তর নিজের সংসার ছোট, কিন্তু বাইরের মানুষ অনেক। যা-কিছু রোজগার, মানুষ খাওয়াতে ফুঁকে যায়। কুলোয়ও না। সুহৃৎ গুটি কয়েক—তারা কারখানা দেখে, খায় ঘুমোয়। আর আছে এক গাদা বুড়ো-হাবড়া মানুষ। সমাজের

ভারবোঝা—দেখে রাগ হবার কথা। গেলেই তো পারেন—কোন কর্মে বেঁচে থেকে দুর্দিনের অন্ন ধ্বংস করেছেন? হেমকান্ত কিন্তু উল্টো রকম বলে, কারখানার উন্নতি হলে এর ছুনো-তেছুনো বুড়োহাবড়া আমদানি হবে—মানুষের পিঁজরাপোল বানাব বাড়িতে। কারখানার উন্নতি অবশ্য দুরাশা—উন্নতি এমনি-এমনি হয় না, লেগে পড়ে থাকতে হয়। সে মন কোথা, সময়ই বা কই?

বাসা কারখানার লাগোয়া। একটা বড় ঘর। বারাণ্ডা ঘিরে আরও একটু ঘর বানানো হয়েছে—সারা দিনমানের বৈঠকখানা, রাত্রিবেলা পারিবারিক শয়নঘর। শিয়রের দিকে হাতবাক্সে টাকা-পয়সা। এবং একগাদা খাতাপত্র—কারখানার জমাখরচ ও হেম-কান্তর নিজস্ব রোজনামচা। জমাখরচ দু-দিন একদিন বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু রোজনামচা খানিকটা করে নিত্যিদিন লিখবেনই। বলেন, চাল-কলা জোগাড় করে রাখছি, চটকে কর্তাদের সপিণ্ডকরণ করতে হবে না? সত্যিকথা সাহস করে বলবার ও লিখবার মানুষ, আজ না হোক, কোন একদিন আসবেই। তারই মালমসলা।

বড় ঘরটায় দুবেলা পাতা পেড়ে পংক্তিভোজন। রাত্রে পাতা উঠে গেলে বান্ধবেরা ও পোষ্য কয়েকটি সেখানে শোয়। লীলাকে বারান্দার ঘর ছেড়ে দিয়ে হেমকান্ত এই পাইকারি ঘরে আশ্রয় নিলেন। রান্নাঘরের পাট সেরে কল্যাণী ঘুমন্ত ছেলে তুলে নিয়ে ঐ রান্নাঘরের মেজেয় মাদুর নিয়ে পড়ে। ঘরের জন্য হেমকান্ত রীতিমতো চিন্তিত। আদরের বোনটি, আহা, এই অবস্থায় এসে পড়েছে—তাকে এমন হাটুরে জায়গায় রাখা ঠিক হচ্ছে না। আর কল্যাণীর দিকটাও দেখতে হবে। হাত-পা ঝাড়া একলা মানুষ হলে তবু যাহোক চলত—ছোট ছেলে নিয়ে ভিজে মেঝের উপর কদ্দিন এমনভাবে থাকা যায়? ছেলেরই অসুখ করে যাবে।

এই নিয়ে ননদ-ভাজে খিটিমিটি শুরু হয়ে গেছে। কল্যাণী

বলে, রান্নাঘর কি মন্দ ঠাকুরঝি? বেশ দিব্যি ঘুমোই আমি—একঘুমে রাত কাবার।

লীলা বলে, বেশ তো। তুমি এদ্দিন ঘুমুলে—ভাল ঘরে আমায় ক'টা দিন ঘুমুতে দাও এবার।

একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতন কথাবার্তা হাসিতামাসা।

বান্ধবেরাও বলছে, ভাল ঘর দেখ হেমদা। দিদিকে কখনো ছেড়ো না, তোমার কাছে থেকে যান। ভালই হবে। তাঁর নিজের ভাল, আমাদেরও ভাল। সংসার নিয়ে একলা বউদি হিমসিম খাচ্ছেন, ননদ-ভাজে মিলেমিশে দেখতে পারবেন। কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থেকে দিদিও দেখো দু-দিনে নতুন মানুষ হয়ে উঠবেন।

কপালক্রমে ঠিক পাশের বাড়িতেই দু-খানা ভাল ঘর পাওয়া গেল। হেমকান্তর সঙ্গে সে বাড়ির মাখামাখিও বেশ। অগ্রিম টাকা এবং পাকা-কথা দিতে যাচ্ছেন, লীলা শুনতে পেয়ে একেবারে আড় হয়ে পড়ল: ঘরের মতলব কে দিল ছোড়দা? আমি কি চিরকাল তোমার ঘাড়ে চেপে থাকতে এসেছি?

আহত স্বরে হেমকান্ত বলেন, ভাই-বোন আমরা—এক মায়ের গর্ভে ছিলাম। ভাইয়ের কাছে বোন এলে তাকে ঘাড়ে চেপে থাকা বলে না।

লীলা বলল, ঘাট মানছি ছোড়দা, বলা অন্যায় হয়েছে। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি রয়েছেন, দুনিয়ার উপর তাঁদের অন্য কেউ নেই। তাঁদেরও তো দেখাশুনোর দরকার।

হেমকান্ত চুপ করে গেলেন।

কল্যাণী ছাড়ে না: জায়গাটা পাকিস্তান। সেটা কেন ভাবছ না ঠাকুরঝি?

সদম্ভে লীলা বলে, আমাদের নিজের দেশভুঁই, ভিটেমাটি।

আমার এই ছোট্ট মেয়েটা বাপকে কোনদিন কাছে পাবে না, কিন্তু ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমাদের কেন তাকে পেতে দেবো না ?

পাকিস্তান, পাকিস্তান।

বলে, আর শিউরে শিউরে ওঠে কল্যাণী : যারা এতবড় সর্বনাশ করল, আবার তুমি সেখানে ফেরত যাবে ?

সেখানে কোথা ? লাহোর তো ছু-হাজার মাইল তফাত এখান থেকে।

ঘাড় উঁচু করে দৃপ্তকণ্ঠে লীলা আবার বলল, তবু আইন মতে এক রাজ্য, সে কথা মানি। কিন্তু সর্বনাশ যারা করেছে, লজ্জা তো তাদেরই। আমি কেন লজ্জা পেতে যাব ?

লজ্জার কথা নয় ঠাকুরঝি, ভয়ের কথা।

লীলা বলে, যে বাড়ির মেয়ে আমি, ভয় পাওয়া আমায় মানায় না। তুমি বরঞ্চ তোমার বর—ছোড়দার সঙ্গে নিরিবিলি একবার কথা বোলো, সে-ই বা কী বলে। সামনে থেকে চুপচাপ কেমন সরে গেল দেখলে না ?

জোর দিয়ে আবার বলে, লাঞ্ছনা ঘাড় হেঁট করে সয়ে যাব না—প্রতিকার আছে কিনা দেখব। প্রতিশোধ পালিয়ে থেকে হয় না, পালানো ভীরুতা। আমার ঐ বয়সের শ্বশুরও যা করলেন না, আমি তাতে রাজি হব কেন ?

খলখল করে হঠাৎ লীলা হেসে উঠল : ন্যাড়ার নেই বাট-পাড়ের ভয়। মেয়েমানুষের যা-কিছু সম্পদ, সবই তো লুঠ করে নিয়েছে। নতুন করে কি হারাব পাকিস্তানে, আমার আবার ভয় কিসের ?

যে শোনে সেই তো অবাক। পালিয়ে হিন্দুস্থানে আসারই হিড়িক, আর মেয়েটা ঐ কাণ্ডের পরেও পাকিস্তানে ফিরে চলল। পাশপোর্ট-ভিসার চল হয় নি তখন অবধি। লোকের

অবাধ যাতায়াত। জিনিসপত্র আনা-নেওয়াতেও কড়াকড়ি তেমন নেই। সাধারণ মানুষ গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে পারে না, সত্যি সত্যি আলাদা দুটো দেশ।

দেহ-মনের অবস্থা ভাল নয়, লীলাকে একলা ছাড়া চলে না। আজেবাজে লোকের সঙ্গেও নয়, হেমকান্ত নিজে যাচ্ছেন। বোনকে যশোরে বীরেশ্বরের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

হাত নেড়ে হঠাৎ লীলাকে ডাকলেন: শোন্—

ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা এঁটে দিলেন।

তোকে রেখে আমি তো চলে আসব। সহায় দিচ্ছি—সে-ই সাথেসঙ্গে থাকবে।

ইঙ্গিত বুঝে লীলা বলল, বিষ?

হেমকান্ত বললেন, না, বিষে তো পরাজয়। অ্যাকসনের আগে আমার দাদাকে রিভলভার বিষ দুইই দিয়েছিল। নিয়ম ছিল তাই। বিষের পুরিয়া দাদা ফেলে দিলেন। শত্রু মারবেন—মরলে শত্রুর হাতেই মরবেন। ঠিক তাই হল, শত্রুর হাতে মরণ। গুলি করে না মেরে গলায় ফাঁস দিয়ে নৃশংস ভাবে তারা মেরে ফেলেছিল।

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে লীলা বলল, বুঝেছি ছোড়দা। দাও, দাও—

পুরানো কথা মনে এসে মুখ মলিন হল: রিভলভার একটা হাতে পেলে কুন্তীকে সেদিন মিছামিছি অত খোশামোদ করতে হত না।

বাক্সর তলা থেকে হেমকান্ত রিভলভার বের করলেন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাপড়ে মুছে জিনিষটা পরিষ্কার করছেন। শিশুর মাথায় বাপে যেমন আদর বুলায়।

বলেন, বারবার তুই নিজের কথা বলছিস—নিজের জন্য নয় কিন্তু। শত্রুর জন্য। বড্ড দামি জিনিষ—টাকার দামের কথা বলিনে, আমাদের প্রয়োজনের দাম।

মুখ টিপে হেসে লীলা বলল, নিয়ে তো যাচ্ছি—সে আবার ঘোরতর অহিংস বাড়ি ছোড়দা।

অবহেলা ভরে হেমকান্ত বলেন, অহিংস বুলি আমরাও কত কপচেছি। দরকার হলে এখনো রাজি। বুলি কপচে প্রতিপক্ষকে ভাঁওতা দেওয়া। তা-বড় তা-বড় রাষ্ট্রশক্তি—তাদেরও নীতি এই। মুখে বিশ্বশান্তি, আড়ালে অস্ত্রসজ্জা। সময় এলে গেরুয়া সাজ ধুলোয় ছুঁড়ে রে-রে করে লাফিয়ে পড়ে।

রিভলভার তুলে ধরে আবার বলেন, আসল শক্তি এই নলের মুখে। বাকি সব ভাঁওতা। কামোফ্লেজ দিয়ে কত কথাই না বলে মানুষ!

ঘাড় নিচু করে দু-হাত পেতে দেবতার বর নেবার মতো লীলা রিভলভার নিয়ে নিল। গভীর কণ্ঠে বলল, দুই দাদার আমি একলা বোন। শত্রু-নিপাত আমারও ধর্ম। হাত থেকে অস্ত্র নিলাম—তোমাদের কষ্টের জিনিসের অমর্যাদা হতে দেবো না ছোড়দা।

রওনা হবার মুখেও কল্যাণী বলল, বিপদের মুখে কেন যাচ্ছ ভাই, কী গরজ? হাঙ্গামা এখন নেই বটে, হতে কতক্ষণ?

আমার প্রাণের বুঝি বড্ড দাম!

খিল খিল করে হাসে। এমনি হাসি দেখলে কল্যাণী আঁতকে ওঠে—পাগলামি বুঝি মাথা চাড়া দিল আবার। গলা নিচু করে লীলা বলল, মেয়ের জন্য যাচ্ছি। শ্বশুর-শাশুড়ির কোলে তুলে দেবো—তাঁদের বংশের বাতি। মেয়ে দিয়ে ছুটি আমার।

কলাণী সভয়ে বলে: কী করবে তখন?

শোধ নেওয়া যায় কি না, দেখব। জ্বালা ভুলতে পারিনে। আমি মরিয়া।

কল্যাণী বলে, ভাই-বোন তোমরা এক রকম—একই ছাঁচে

গড়া। কিন্তু মেয়েমানুষ তুমি, সেটা ভুলো না। কী ক্ষমতা আছে তোমার শুনি?

বড্ড মনে করিয়ে দিলে বউদি, আমি মেয়েমানুষ—

সঙ্গে সঙ্গে লীলা কথা ঘুরিয়ে নেয়। হাসিমুখে সহজ কণ্ঠে বলে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে রাঁধাবাড়া করব ঘরে বসে, মেয়েমানুষে যা করে। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবাযত্ন করব।

কথা না বাড়িয়ে কল্যাণী বলল, জেদ করে যাচ্ছ, অসুবিধা বুঝলে তক্ষুনি চলে এসো। লহমাও দেরি কোরো না।

॥ সাত ॥

চার ছেলেমেয়ে বীরেশ্বরের, একটিও বেঁচে নেই। অসুখে ভুগে দুটি গেছে। শ্বশুরবাড়ি যাবার মুখে নৌকাডুবি হয়ে মেয়েটা গেল। শেষ সন্তান নকুলেশ্বর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সাম্প্রদায়িক বলি। বীরেশ্বরের শোক বোঝা যায় না। নিজের ও ছাত্রদের পড়াশুনো নিয়েই বরাবর মেতে থাকতেন, তার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। স্ত্রী কমলবাসিনীকে নিয়েই সমস্যা। শান্ত-স্বভাবের মানুষ তিনি, কিন্তু দাসী কুন্তী অর্ধমৃত অবস্থায় কোনক্রমে যশোরে ফিরল, তার কাছে পথের বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনলেন। নকুলেশ্বর, লীলা এবং আরও হাজার হাজার মানুষের শোচনীয় পরিণাম। গলা টিপে লীলাকে মারতে গিয়েছিল এই কুন্তী। দুর্বল আঙুলের চাপে মারা পড়ল না—বেঁচে রয়েছে সে, কোন অজ্ঞাত জায়গায় তাকে নিয়ে পাচার করেছে। কিন্তু না বাঁচাই ছিল ভাল তরুণী বউটার পক্ষে। কুন্তী নিজের মৃত্যুরও বন্দোবস্ত করে রেখেছিল, কিন্তু সময়কালে ভেস্তে গেল। গলায় পা চাপিয়ে যে মেয়েলোকটার দাঁড়ানোর কথা, ভয়ে সে পেরে উঠল না—থরথর করে কাঁপতে লাগল। অনেক ঘাটের জল খেয়ে কুন্তী শেষ পর্যন্ত কোনক্রমে দেশেঘরে ফিরল বয়স এবং চেহারা বিশেষ অনুকূল ছিল বলেই। দেখতে সে কুৎসিত, বয়সেও প্রৌঢ়ত্ব প্রায় পার হয়ে এসেছে।

এই সব বিবরণ শোনার পর চিরকেলে শান্তমানুষ কমলবাসিনীর পাগলের অবস্থা। কখনো আকাশ ফাটিয়ে কাঁদেন, কখনো বা বিড়-বিড় করে আপনমনে বকেন। অথবা একেবারে চুপ। হঠাৎ একসময় বা অদৃশ্য কাদের উদ্দেশে গর্জে ওঠেন, গালিগালাজ করেন।

স্বাধীনতার পর থেকে শহরে-গ্রামে এক অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়ে গেল—যশোরে বীরেশ্বরের অধ্যাপক-পাড়াতেও বটে। হিন্দুস্থানে পালানোর কথা উঠলে পড়শিদের প্রতিজনই মুখে বীরত্ব জাহির করেন : ক্ষেপেছেন? বাস্তুভিটে ঘরবাড়ি ছেড়ে-ছুড়ে কোন্ চুলোয় যেতে যাব? এক পা নড়ছিনে। নিজের বাড়ি থেকে যা ঘটবার ঘটুক। সপরিবারে সেই মানুষেরই পাত্তা নেই, এক সকালবেলা উঠে দেখা গেল। সাধের বাস্তুভিটে ও ঘরবাড়ি ছুঁচো-চামচিকের হেপাজতে সমর্পণ করে রাতারাতি ফৌত হয়েছেন। এবং কিছুকাল পরে সেই উঠোনের জঙ্গল সাফ-সাফাই করে ঘরের চামচিকে-ছুঁচো তাড়িয়ে আর এক দল এসে আস্তানা গাড়ল সেখানে। একবর্ণ বাংলা বোঝে না তারা, পড়শিদের কথাবার্তা শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। উদ্বাস্তু তারাও—পূর্ব-বাস্তুতে সর্বস্ব ফেলে-ছড়িয়ে যৎসামান্য সঙ্গে আনতে পেরেছে। আর নিয়ে এসেছে প্রচণ্ড ক্রোধ। ক্রোধের পাত্র যারা, সেসব মানুষ নাগালের বাইরে। হিন্দু বলতে হাতের কাছে অসহায় যে ক'টি পড়ে রয়েছে, ঘৃণা-বিদ্বেষ তাদের উপর গিয়ে পড়ছে। যতটুকু পারে, তাদেরই জব্দ করে প্রতিহিংসা নিতে চায়।

ছেলে-বউয়ের উপর অত্যাচারের জঘন্য খবর এসে পৌঁছল, কমলবাসিনীর মনের গতিকও তখন এই রকম। পাশের বাড়ি নতুন পড়শি হয়ে এসেছেন, তাঁরা মুসলমান—বিহারসরিফে বাস ছিল। সে-বাড়ির কাউকে দেখলেই ধ্বক করে কমলবাসিনীর দু-চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। পুত্রহন্তা তাঁরাই যেন। বর্ষীয়সী গিন্নিমানুষ—শোধ তুলবার উপায় নেই, নিজেই অন্তরালে চলে যান—ঘরে ঢুকে দড়াম করে হুড়কো এঁটে দেন। শুচিবাই বিষম বেড়ে গেল। নিজের বাড়ির উঠোনে পা দিতেও গা ঘিনঘিন করে। সৃষ্টির অনাচার বুঝি পায়ে লেগে গেল—বাতাসেও অনাচার ভেসে বেড়াচ্ছে। বীরেশ্বর অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন :

উত্তেজনার মুখে দাঙ্গা—তার জন্তে মুসলমান মাত্রেই কি দোষী? সৎ মুসলমান কতজনে প্রাণ অবধি দিয়েছেন দুর্গতকে বাঁচাবার জন্য। পাশের বাড়ি যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও দুর্ভাগা আমাদের মতন। দাঙ্গায় আত্মজনেরা প্রাণ দিয়েছে। নকুলদের উপর হামলা হল লাহোরে, আর এঁদের বাড়ি বিহারে—লাহোর থেকে হাজার হাজার মাইল দূর।

কিছুতে কিছু নয়। শঙ্কা হল, শোকে-তাপে কমলবাসিনী পুরোপুরি পাগল না হয়ে যান। সেই সময়টা মন দুলে উঠেছিল বীরেশ্বরের: দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে যাই চলে। কোন-একটা গাঁয়ে পোড়ো-জমির উপর খড়ের-চালা তুলে স্বাধীনতার সুখভোগ করিগে। কমলবাসিনী যেখানে একটু মানসিক শান্তি পান, নরক হলেও সেইখানে আস্তানা নিয়ে নেবো।

নুরুল্লাহ্, যশোরের পাবলিক-প্রসিকিউটার, পাড়ার মধ্যে প্রধান। এক সময়ে বীরেশ্বরের ছাত্র ছিল সে। মতিস্থির করতে না পেরে বীরেশ্বর তাকে খবর দিয়ে পাঠালেন: সমস্যায় পড়েছি নুরু। অন্যদের মতন পালাব না। যা কিছু করব দিনমানে—দশের চোখের উপর দিয়ে। বিচারবুদ্ধি আমার লোপ পেয়ে যাবার গতিক। কী করা উচিত, তুমি বাবা ভেবেচিন্তে বাতলে দাও।

নুরু ব্যথাভরা দুই চোখে মুহূর্ত কাল চেয়ে রইল অধ্যাপকের দিকে। বলল, আপনার মতন মানুষও যদি দেশ থেকে চলে যান, আত্মসম্মান বলে কিছু আর আমাদের অবশিষ্ট থাকবে না। নিজেদের জন্তু-জানোয়ারের শামিল মনে হবে।

একটু থেমে আবার বলে, যা হয়ে গেছি—জানোয়ার থেকে আলাদাও বড় বেশি নই আর। তবে আপনার বাড়ির দিকে যদি কখনো হামলা আসে, হাজার মানুষ অন্তত ছুটে এসে পড়বে। হাজার-খানেক মড়া না মাড়িয়ে কেউ এ-বাড়ি ঢুকতে পারবে না।

আপনায় পা ছুঁয়ে বলছি সার, এই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করুন। গান্ধিজীও অবশ্য বলেছিলেন, দেশ-ভাগ সত্যিই যদি হয়, তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়েই তা ঘটবে। কিন্তু মহাত্মা-মানুষের সঙ্গে সামান্য আমাদের তুলনা করতে যাবেন না। আমরা ঠিক ঠিক তাই করব।

অভিভূত কণ্ঠে বীরেশ্বর বললেন, হামলার ভয় করছিনে আমি। যাদের বেঁচেবর্তে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবার কথা তারাই সব চলে গেল, বুড়োমানুষদের প্রাণের কি দাম আছে? অশান্তি হয়েছে নকুলের মাকে নিয়ে। আপন বলতে চারিদিকে তোমরাই সব—অথচ নাম শুনতে পারে না তোমাদের। পা ফেলে তোমরা চলে গেলে বালতিখানেক গোবরজল ঢেলে জায়গাটা শুদ্ধ করে নেয়। পাগলের বেহদ্দ—ভয় করছি, উদ্দণ্ডপাগল না হয়ে ওঠে। অসম্ভব নয়—বড্ড ঘা খেয়েছে, তারই প্রতিক্রিয়া। কঠিন সমস্যা এখন নকুলের মা'কে নিয়ে। কী করব, তোমার কাছে পরামর্শ চাচ্ছি।

নুরুল্লাহ্ সমাধান দিতে পারে নি, খানিকটা হা-হুতাশ করে চলে গেল। হিন্দুস্থানেও বীরেশ্বরের বিস্তর ছাত্র, নানান রকম কাজকর্ম নিয়ে আছে। গিয়ে পড়লে সত্যিই যে পোড়ো-জমি খুঁজে নিয়ে চালাঘর তুলতে হবে, সে ব্যাপার নয়। কিন্তু পলায়ন জিনিসটাই আদর্শ-বিরুদ্ধ। গান্ধি-নেতৃত্বের দুর্বলতা নিয়ে লোকে আজ যতই বক্রোক্তি করুক, বীরেশ্বরের বিশ্বাস অবিচল। গান্ধিজীর উক্তিই মন্ত্রের মতন মনে মনে জপ করেন: দেশ-বিভাগ আমি বিশ্বাস করিনে। পাকিস্তানে যাবার সময় পাশপোর্ট করবেন না, বলেছিলেন গান্ধিজী। অতএব বিভেদটাই যদি অলীক হয়, কেন তিনি নিজ অঞ্চলের ঘরবসত তুলে দিতে যাবেন?

কর্তব্য ভেবে পাচ্ছেন না, এমনি সময়ে হেমকান্ত এসে লীলা

ও ফুল্লরাকে বীরেশ্বরের যশোরের বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সেখানে কুন্তী। কুন্তীকে দেখে লীলা কী আকুল কান্না কাঁদল তাকে জড়িয়ে ধরে : প্রাণ ধরে আমায় মারতে পারলিনে কুন্তী, তবু কিন্তু আমি বেঁচে নেই। বাঁচবার জন্যে কত হাতে-পায়ে ধরলাম, কিছুতে বাঁচতে দিল না। তোর হাতে প্রাণ গেলে কত শান্তি ছিল ছিল রে কুন্তী! প্রাণ বজায় থেকে অহোরাত্রি জ্বলে-পুড়ে মরি, প্রাণ রাখতে একটুও আমার ইচ্ছে করে না।

সাত-সাগরের সমস্ত জল যেন লীলার চোখ দুটোয়। অনেক করে কুন্তী বোঝাচ্ছে : প্রাণ দিলেই তো হল না। বাচ্চার মুখে তাকাও বউদি। আহা, ঝিকমিকে সোনার পদ্ম। তুমি ভেঙে পড়লে বাচ্চার কি হবে?

লীলা বলল, প্রাণটা থাকতে দিয়েছি ফুল্লরার মুখ চেয়েই তো। শ্বশুর-শাশুড়ির আশ্রয়ে এনে ফেলেছি সেই জন্যে। বাচ্চার একটা হিল্লে হয়ে যাক, তারপরে দেখিস কী করি। প্রাণে আমার বড্ড ঘেন্না রে কুন্তী।

বলতে বলতে চাপা গলায় সহসা গর্জন করে উঠল : আমার বড়-দা ফাঁসিতে গেছে, ছোড়দা-ও যাবার জন্যে তৈরি। বিয়ে-থাওয়া করে ছেলের বাপ হয়েও ছোড়দা সংসারী হতে পারল না। মরণ আমরা একবিন্দু ডরাইনে। আমার অর্ধেক ফাঁসি দিয়েই তো দিয়েছিস তুই, গলার উপরে ছাপ পড়ে আছে। ফুল্লরার একটু আশ্রয় হয়ে গেলে বাকিটুকু সারা করব। কিন্তু এমনি-এমনি যাব না—শোধ নিয়ে যাব। অত্যাচারী দু-দুটো দুশমন ঘায়েল করে আমার বড়দা গিয়েছিলেন—আমি নেবো অন্তত পক্ষে দু-গণ্ডা।

কুন্তীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। বয়সে কাঁচা হলে কি হয়, বউটা ভিন্ন ধাঁচের—লাহোরে থাকতে কুন্তী পদে পদে টের পেয়েছিল। পাগল, পাগল—পাগলের গোষ্ঠী এরা। এবাড়িও যে উন্মাদাশ্রম হয়ে দাঁড়ানোর গতিক।

কথাবার্তার খানিক খানিক সে বীরেশ্বরকে বলল: গিন্নি-মাকে নিয়ে উতলা হয়েছিলেন, আবার একটি এসে পড়ল। এটি তো সাংঘাতিক একেবারে।

লীলা এমনি বেশ খাসা—কী ভয়ানক হয়ে ওঠে সময় সময়। সে চেহারা মনে পড়লে বৃদ্ধ বীরেশ্বর শিউরে ওঠেন আজও। দেশ-জোড়া প্রলয়-আগুন—তারই ভিতর থেকে ছুটোছুটি করে বেরুতে লীলার গায়েও যেন আগুন ধরে গেছে। ধিকিধিকি জ্বলছে, টের পাওয়া যায় না—টের পাই যে-সময়টা দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে। মাথা একেবারে বেঠিক তখন। ঘোমটার কাপড় ফেলে ঘন ঘন গলার উপরের কালসিটে দাগ দেখায়। হেসে হেসে বলে, আমার দাদা থাকলে তাঁর গলাতেও ফাঁসির দড়ির দাগ থাকত এমনি। ভাই-বোন দু-জনেই আমরা ফাঁসিতে মরেছি। মরে গিয়েও আমি নরলোকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি। কেন, জানিস?

হাসি মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে ধ্বক করে দুটো চোখের মণি জ্বলে ওঠে। চোখে সত্যিই যেন আগুন। কুন্তীকে বলে, কেন জানিস? মরে গিয়েও কেন আমি জ্যান্ত হয়ে বেড়াই? বউদি আমায় এত করে বলল, কথা না শুনে নিরাপদ কলকাতা ছেড়ে ছোট্ট মেয়ে নিয়ে পাকিস্তানে শ্বশুর-শাশুড়ির ঘাড়ে এসে পড়লাম—কেন জানিস? কেন জানিস?

কুন্তী শশব্যস্তে থামিয়ে দেয়: জানাতে হবে না বউদি। কেউ কিছু জানতে চায় না তোমার কাছে। চুপ করো তুমি। শোবে চলো।

ধরে পাকড়ে সরিয়ে নিয়ে যেতো লোকের সম্মুখ থেকে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে শুইয়ে দিত। পাগলামির প্রকোপ বাড়ত এক এক সময়, তখনই এমনিধারা করত, এমনি সব বলত। অন্য সময় শান্ত সেবামতী গৃহস্থবধূ, আর দশটা মেয়ের সঙ্গে একবিন্দু তফাত নেই।

চিকিৎসা করেছিলেন ডাক্তার খলিলুর রহমান। বহুদর্শী প্রবীণ ডাক্তার—বহরমপুরে প্র্যাকটিশ করতেন, শহরের অনতিদূরে আজম-দীঘি গাঁয়ে বাড়ি। অখণ্ড-বাংলায় তখন তো বিস্তর বাঘা-ভালুকো ডাক্তার, তার মধ্যে ডাক্তার রহমানেরও নাম ছিল দস্তুরমতো। নাম কলকাতা অবধি ছড়িয়েছিল—সেখান থেকেও মাঝেমধ্যে দুরারোগ্য রোগি আসত। পার্টিশন হবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি-কর্মচারী উকিল ডাক্তার ইত্যাদির মধ্যে হিন্দুরা চলে গেলেন ভারতে, মুসলমানরা পাকিস্তানে। খলিলুর রহমানের সেই থেকে যশোরে আস্তানা।

ডাক্তার সাহেবের সামনেই একদিন কাণ্ড। পাগল ক্ষেপে গিয়েছে অকস্মাৎ। বলে, পাকিস্তানে কেন এসেছি জানেন ?

ডাক্তার বললেন, কেন মা ?

বদলা নেবো বলে। শোনা কথা নয়, এই চোখ দুটো দিয়ে দেখেছি সে-জিনিস। ডাইনে বাঁয়ে ছুরি মেরে মেরে খুন করতে লাগল। কসাইরাও অমন পারে না। আর আমাদের মতন মেয়েলোক যারা, প্রাণ নিয়ে তাদের রেহাই দেয় নি। প্রাণ নেবার আগে—

হাউহাউ করে কেঁদে উঠল লীলা। খলিলুর আর বলতে দিলেন না, কথা ঘুরিয়ে নেন তাড়াতাড়ি : বদলা নেবে বই কি মা। আমি একজন মুসলমান—এক্ষুনি আমারই উপর দিয়ে শুরু করে দাও।

লীলা সচকিত তাকাল বৃদ্ধের দিকে। মুহূর্তকাল চেয়ে রইল। বলে, নেবো তাই। ভাবছেন, কথার কথা। বংশটা আমাদের জানেন না। আমার বড়দা ফাঁসিতে মরেছেন দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে—আর দশটা বাজে-মানুষের মতন খেয়ে ঘুমিয়ে আরামে দিন কাটাতে পারেন নি। স্বাধীন হবার মুখে কলাগাছ কচুগাছ কাটার মতন ফুল্লরার বাপকে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটেছে। আমাকেও মেরে ফেলেছে—তার মতন করে যদি কেটে ফেলত, ভাবতাম

দয়া করল। তা হয় নি। ছোড়দা-ই কেবল আছে বেঁচে—মরার জন্যে তারও আঁকুপাকু। বোমার খোল আর পাইপগান গড়ছে কারখানা বানিয়ে, গড়ে গড়ে ডাঁই করছে।

বীরেশ্বর এসে পড়েছিলেন, পাগলামির কথাবার্তা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চান। বললেন, গুণের ছেলে বউমার ভাইটি। আলাপ-সালাপ করে বড্ড খুশি হয়েছি। মেকানিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত, গণ্ডগোলে পড়া শেষ করতে পারে নি। কিন্তু প্রতিভা আছে, নতুন নতুন ডিজাইনের ঘরব্যাভারি নানারকম জিনিস বানায়। ব্যবসা চলছেও বেশ ভাল।

লীলা হাসে : চলছে ঘোড়ার-ডিম। চালানোর ইচ্ছে থাকলে তো। লোকের জানলার গ্রিল বানিয়ে বেড়াবে, তেমনি মানুষই বটে আমার ছোড়দা। ও-সব লোক-দেখানো, সরকারকে ধাপ্পা-দেওয়া। বদলা আমি যেমন চাই, ছোড়দাও চায় ঠিক তেমনি। তেমনি আরও হাজার-লক্ষ মানুষ—'বদলা চাই' 'বদলা চাই' বুকের রক্তের মধ্যে টগবগ করে ফুটছে।

খলিলুর রহমান পরমাগ্রহে বলেন, আমিও একজন মা, 'বদলা' চাচ্ছি। তোমাদেরই একজন আমি। উদ্বাস্তু। বাপদাদার ভিটে ছেড়ে চোখের জলে চলে এসেছি। থাকতে পারলাম না, আসতে হল তাই।

আবার বললেন—কণ্ঠ ভিজে-ভিজে : বয়স বিস্তর হয়েছে, মাটি নেবার দিন এবারে। কিন্তু এখানকার এই বিদেশ-বিভুঁইয়ের মাটি এ-দেহের গরপছন্দ। যদ্দিন পারি ঠেকিয়ে যাচ্ছি—যদি কোনরকম সুরাহা হয়ে যায় আমার জীবনকালের মধ্যেই। নইলে বাবা আর বড়ভাইয়ের হিসেবে আরও পাঁচ-সাত বছর আগে আমার কবরে যাবার কথা। আমার আজমদীঘির গোরস্থানে তাঁদের পাশে যদি একটু জায়গা করে নেওয়া যায়, সেই আশায় আশায় বেঁচে রয়েছি।

বীরেশ্বর আর খলিলুর দুই বৃদ্ধের মধ্যে ভাব জমে গেছে খুব। প্রতিবেশীও তাঁরা। প্র্যাকটিশ খলিলুরের প্রায় ছেড়ে দেবার মতো। রোগি বাড়িতে এলে তবে দেখেন। কঠিন রোগে শয্যাশায়ী এবং রোগির বাড়িও দূরবর্তী নয়—এমনি ক্ষেত্রে যেতে হয় কখনো-সখনো। কিন্তু সন্ধ্যার পর কোন অবস্থাতেও বেরোন না। বীরেশ্বরের বাড়ি আসেন, গল্পগাছা হয়। আবার বীরেশ্বরই এক-একদিন খলিলুরের বাড়ি চলে যান। খলিলুর দাবার ছকগুটি বের করেন, খেলা হয় খানিকটা রাত্রি অবধি।

আজ বীরেশ্বর নিরিবিলিতে খলিলুরকে খুব ভর্ৎসনা করলেন: পাকা-বুদ্ধির মানুষ—তায় ডাক্তার-মানুষ হয়ে ওটা কি করলেন বলুন তো। বউমার মাথার ঠিক নেই, আপনার চেয়ে কে বেশি জানেন? সময় সময় এমনি আবোল-তাবোল বকে। কোথায় ঠাণ্ডা করবেন—তা নয়, সেই তালে আপনিও তাল দিতে লাগলেন।

লীলার সঙ্গে কথাবার্তার পরে বেশ খানিকক্ষণ কেটেছে। কিন্তু ডাক্তার রহমান গুম হয়ে আছেন তখনো। গল্পগাছা আজ জমে না। হঠাৎ তিনি বললেন, মাথার ঠিক নেই একলা বউমার নয়, আমারও। খোঁজ নিয়ে দেখুনগে, মাথা-খারাপ এমনি লাখ লাখ রয়েছে—মনের আগুন চেপেচুপে তারা দিন কাটায়। আজাদির নামে বাংলাদেশের যে হেনস্তা হল, তার বদলা আমিও চাই। খোদার কশম খেয়ে বলছি, কথার কথা নয়—সত্যি সত্যি চাই আমি। মুশকিল হয়েছে—সাধারণ মানুষ সাদা-চোখে দেখে, অমুক হাতটা কোপ ঝাড়ল অমুকের কাঁধে। সেই লোককে দুশমন বলে সকলে চিনে রাখে। লোভ আর লালসার তোড়ে যারা তাকে কসাইবৃত্তিতে লেলিয়ে দিয়েছে, তাদের কেউ দেখতে পায় না। শিক্ষা কালচার দেশসেবা সদাচারের মুখোশ পরে তারা দিব্যি বহাল-তবিয়তে কাল কাটায়, রাজা-উজির হয়, টাকাকড়ি কুড়োয় দু-হাত ভরে। রাস্তাঘাটে হাসপাতালে যেখানে পারছে নাম জুড়ে দেয়

তাদের। নিত্যিদিনের কাগজ খুললেই তাদের ছবি আর বচনসুধা। দেখে দেখে আর শুনে শুনে চোখ-কানের ঘেন্না ধরে গেল। থাকত আমার হাতে ক্ষমতা, এক-একটাকে ধরে জনতার দরবারে দাঁড় করিয়ে কীর্তিকলাপ ব্যাখ্যা করে বোঝাতাম। শাস্তি দেবে তো সেই আসল আসামিদের দিক, আড়ালে দাঁড়িয়ে যারা কলকাঠি টেপে।

বীরেশ্বর বললেন, বউমাকে আপনি তো এসব বললেন না। বরঞ্চ উল্টো জিনিস—আপনার উপরেই বদলা নিতে বললেন। পাকিস্তানে হিন্দুস্থানে হামেশাই যা ঘটে থাকে—ধড়িবাজদের ধরা-ছোঁওয়া যায় না, নিরীহ ভালমানুষরা প্রাণ দেয়।

খলিলুর ক্ষিপ্তস্বরে বললেন, হাঁ তাই, মনের কথাই বলেছি আমি। ন্যায়-অন্যায় চুলোয় যাক—চাই আমি, ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে ফেলুক আমায় কেউ। সাহস নেই, তা হলে জাপানিদের মতন হারিকিরি করতাম। বাঁচতে আমার লহমার তরেও ইচ্ছে করে না। কী আমার আহা-মরি দেশ, তাই আশি-নব্বুই বছর বেঁচে-বর্তে থেকে সুখভোগ করতে হবে!

বড় উত্তেজিত হয়েছিলেন খলিলুর। ছেলেমানুষকে যেমনভাবে ভোলায়—হাসিয়ে রসিয়ে তেমনিভাবে বীরেশ্বর ডাক্তারকে শান্ত করলেন।

খলিলুর লজ্জিত হয়ে তারপর বলছেন, যা গতিক, ভাল মাথা পর্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। কে হিন্দু, কে মুসলমান—বাচ্চাদের মধ্যেও সেঁধিয়ে যাচ্ছে। যে সর্বনাশ আমাদের হবার তা হল, কিন্তু এমনি চললে ভবিষ্যৎ বলেও তো কিছু আর থাকবে না। শুনবেন? মজার গল্প—শুনে আমোদ লাগবে। কিন্তু তলিয়ে ভাবুন, চোখ ফেটে জল বেরুবে তখন। অবোধ ছেলেপুলেদের চোখে পর্যন্ত কী হয়ে যাচ্ছি আমরা! ইতিহাস আমাদের কোন চোখে দেখবে?

॥ আট ॥

বাংলাদেশ দু-খণ্ড, ভিন্ন রাষ্ট্রে চলে যেতে হবে—সেই মুখটায় কী উত্তেজনা। মনে আছে আপনাদের অনেকের। ডাইরেক্ট অ্যাকশন চলল, তার বদলাও চলছে—কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড। খুনখারাবি লুঠতরাজ নারী-লাঞ্ছনা অগ্নিকাণ্ড—সদাচার-মনুষ্যত্ব বলে কিছু আর নেই। অহিংস মতে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে মানুষ মানুষের কাছে প্রীতির কথা বলতে গেছে, ঘ্যাচ করে দিল ছোরা বসিয়ে। আদর করে কেউ আলিঙ্গন করলে, ভালবাসার রমণীও, বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করে—প্রেমিকারই মুঠোর মধ্যে হয়তো বা চকচকে ছুরি। লাঠিসোটা ইটপাটকেল সড়কি-বল্লম এবং বে-আইনি বন্দুক-পিস্তল—যে যদ্দূর পারে সংগ্রহ করছে। দেড়-যুগ অতিক্রান্ত হয়ে আজ এখন বোঝা যাচ্ছে চক্রান্ত রীতিমতো। দেশ-বিভাগ ছাড়া নান্যঃ গতিরন্যথা—জিনিসটা মানুষের হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায় গেঁথে দেওয়া।

শহরের সংবাদ দূর দূরান্তের পাড়াগাঁ অবধি যেতে বাকি নেই। কোন্ এলাকা পাকিস্তানে যাচ্ছে কতখানি হিন্দুস্থানে, তাও মোটা-মুটি জানা। তদনুযায়ী পালানোর হিড়িক। হিংস্র নেকড়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে—ভাবখানা হল এই। ম্যাপের উপর র‍্যাডক্লিফের লাল পেন্সিলের দাগ পড়তে যে কয়েকটা দিন দেরি। যথাসর্বস্ব ফেলে মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে কলজের নিচে প্রাণটুকু মাত্র নিয়ে। আর সাধ্যে যাদের কুলাল না, বাইরে যদিচ সহাস্য মুখ, কপালে সে করাঘাত হানে ঘরের মধ্যে গোপনে। মুখে অন্ন রোচে না, চোখের ঘুমও হরে গেছে। সুন্দরবনে বাঘ-কুমিরের মধ্যে কাঠুরে-বাওয়ালি যেমন বেড়ায়, এরাও তেমনি-ভাবে দেখেশুনে সতর্কভাবে বিচরণ করে।

তবু এসব মানুষ ভবিষ্যতের যা-হোক একরকম আন্দাজ করে নিয়েছে। আর কতকগুলো ঠাঁই আছে—ত্রিশঙ্কুর অবস্থা, সীমানা-লাইন এ-ধার দিয়ে না ও-ধার দিয়ে যাবে হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের মন-মর্জির উপর নির্ভর। মুর্শিদাবাদ তেমনি একটা জেলা—মুর্শিদাবাদ এবং তৎসহ ডাক্তার খলিলুর রহমানের বসতি আদমদীঘি। আজ শোনা গেল, বাঁটোয়ারা-অফিসের চাপরাশির মুখের খবর—মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানে ঢুকে যাচ্ছে। ডাক্তার রহমান লক্ষ্য করলেন, হিন্দু রোগিগুলো আজকে যেন বেশি বেশি দন্তবিস্তার করে হাসছে, এবং ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে মুসলমানদের দেদার 'আলেকুম-সেলাম' দিচ্ছে। আবার পরের দিন ঠিক উল্টো খবর: র‍্যাডক্লিফের খাস-বাবুর্চি বলেছে, মুর্শিদাবাদ হিন্দুস্থানে। হিন্দু একটি চোখে পড়লেই মুসলমান দু-হাতে অমনি সেলাম জানায়।

রহমান ডাক্তার আর শিবপদ ভৌমিক উকিলের পাশাপাশি বাড়ি। শিবপদর ছোট ছেলে টাট্টু আর রহমানের নাতনি হাসনার বছর পাঁচ-ছয় করে বয়স, একসঙ্গে খেলাধুলো করে, ভাব খুব দু'টির মধ্যে। রহমান ডাক্তার দুপুরের আহারান্তে দিবানিদ্রার জন্য শুয়ে পড়েছেন, বারান্দা থেকে দুই শিশুর আলাপন কানে এলো।

হাসনা টাট্টুকে জিজ্ঞাসা করে: হিন্দু কেমন রে? দেখেছিস টাট্টু, দেখলেই নাকি কেটে ফেলে?

রহমানের তন্দ্রা ছুটে গেল। কী সর্বনাশ।

বাড়িতে ইদানীং প্রধান আলোচনার বিষয় দাঁড়িয়েছে: অমুক জায়গায় হিন্দুরা মুসলমান মেরেছে—ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, হবু-পাকিস্তানের কোন তল্লাটে পালানো যাবে, কী তার বন্দোবস্ত—এই সব। শিশুর কানে অহরহ এই সমস্ত যাচ্ছে।

নেই আর তেমন। ঘরের বারই হন না—অহরহ নাতনির সঙ্গে মেতে আছেন, সময় কোথা অন্য ভাবনাচিন্তার?

বীরেশ্বরের সোয়াস্তি। লীলাও সুস্থ হয়ে উঠেছে, বলা যেতে পারে। কথাবার্তা চালচলনে কেউ বলতে পারবে না আর দশটা গৃহস্থবধূ থেকে সে আলাদা-কিছু। বিষাদের একটা করুণ ছায়া মুখের উপরে, হাসে কালে-ভদ্রে কদাচিৎ। কিন্তু ভয়ের নয় সে জিনিস, বড় বেদনার।

ফুল্লরা সর্বক্ষণ কমলবাসিনীর কাছে। সংসার নিয়েই আছে লীলা—মেয়ের শুধু রাত্রিবেলাটা মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক। সে সময়-টুকুও কমলবাসিনী নাতনিকে ছাড়তে চান না। প্রকাণ্ড খাটের ব্যবস্থা হয়েছে—তার একদিকে কমলবাসিনী অন্যদিকে লীলা, মাঝে ফুল্লরা। মেয়েকে দু'জনে দু'দিকে ঘিরে নিয়ে ঘুমোন। এই কিছুকাল বীরেশ্বরের পড়াশুনো বন্ধ হয়েছিল। কলেজ-লাইব্রেরিতে ইতিমধ্যে বিস্তর নতুন নতুন বই এসেছে, তিনি শুধু চোখ তাকিয়ে দেখেন—উল্টেপাল্টে চোখ বুলোবার মতোও মনের অবস্থা ছিল না। সম্প্রতি আবার রাশি রাশি বই বাড়ি আনতে লেগেছেন—গভীর রাত্রি অবধি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকেন আগেকার দিনের মতো।

কুন্তী একদিন পড়ার ঘরে ঢুকে ভগ্নদূতের মতন দুঃসংবাদ দিল: গতিক ভাল নয়।

কি হল আবার?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে ফিসফিসিয়ে কুন্তী বলল, রিভলবার এনেছে বউদি সঙ্গে করে। দিনরাতই তো কাছে কাছে ঘুরি—ঘূণাক্ষরে টের পাইনি। আজকে প্রথম দেখতে পেয়েছি।

ঠিক দুপুরবেলা। বীরেশ্বর কলেজে, বাচ্চাকে নিয়ে কমলবাসিনী

নিজের ঘরে ঘুমিয়ে গেছেন। রান্নাঘরে কুন্তী খেতে বসেছে, খেয়ে-দেয়ে বাসনকোসন ধুয়ে সে-ও ঘরে শুয়ে পড়বে। নিত্যিদিনের এই বিধি। লীলা এ সময়টা উপরের ঘরে থাকে—বই-টই পড়ে, ঘুমোয় কোন কোন দিন। রোদ খাঁ-খাঁ করছে, ছোট্ট বাসাবাড়ি একেবারে নিশুতি। উনুনে বেগুন পুড়িয়ে নিয়েছে কুন্তী, মাখতে গিয়ে দেখে লঙ্কা নেই। ঘরে না থাকুক, ক্ষেতে আছে—তুলে আনলেই হল। পাঁচিলের বাইরে তরকারি-ক্ষেতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, আমবাগানের ভিতর মানুষ একটা। স্ত্রীলোক—বউদিদি বলে তো মনে হয়। হাঁ, লীলাই। এই ভর-দুপুরে উপর থেকে নেমে পা টিপে টিপে আমবাগানে যায় কেন ঘরের বউ—কী কাজ তার এখন? আরও কিছু এগিয়ে কুন্তী অন্তরালে দাঁড়াল। রিভল-বার তাক করছে বউদিদি আমের গুটির দিকে। নিরিবিলি টার্গেট-প্রাকটিশ হচ্ছে। লীলার কথাবার্তাগুলো ধ্বক করে মনে পড়ে গেল কুন্তীর। প্রতিহিংসা মুখের কথাই নয় তবে। ভাই-বোন এদের আক্রোশ কথার তড়পানিতেই শেষ হয়ে যায় না—যা বলে, কাজেও ঠিক ঠিক তাই। রক্তাক্ত প্রতিহিংসা নেবার সংকল্প ফুটফুটে তরুণী বউয়ের। কুন্তীর গা কাঁপে, তাড়াতাড়ি সে রান্নাঘরে পালিয়ে এলো।

বীরেশ্বর পরদিন লীলাকে নিরিবিলি ডেকে বললেন, ছেলেকে একটা জিনিস দিতে হবে মা। না—বললে শুনব না।

প্রথমটা বুঝতে পারে নি। শুনে নিয়ে লীলা বেকবুল গেল না। একটুখানি চুপ থেকে বলল, কেন বাবা?

আমার ভয় করে। মাস্টারমানুষ তো, তায় বুড়ো হয়ে গেছি। ওসব জিনিসে বড্ড ভয় আমার।

কিন্তু এই তো সম্বল আমার বাবা। এই সম্বল হাতে পেয়েই বুকে জোর এল, আতঙ্ক দূর হয়ে গেল—আপনাদের নাতনি আপনাদের কাছে এনে পৌঁছানোর ভরসা পেলাম।

বলতে বলতে লীলার কণ্ঠে হাহাকার বেজে উঠল: সেদিন এমনি-কিছু হাতের কাছে পেলে লাঞ্ছনা কিছুতেই ঘটত না। কুন্তীর হাতে মরতে গেলাম, ভয়ে সে নিজেই কেঁপে মরে। অস্ত্র থাকলে মরণ কেউ রুখতে পারত না আমার। দুটো-চারটে দুশমনকেও শেষ করে যেতাম।

বীরেশ্বর ফোঁস করে একটা গভীর নিশ্বাস ফেললেন: এইটুকু বয়সে কত দুঃখই না পেয়েছ। হাজারের মধ্যেও একটা মেয়ের এমন হয় না। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন বলে ভেবে নাও মা। বাগে পেয়ে হিংস্র জানোয়ারে আক্রমণ করেছিল, সে আতঙ্ক চিরকাল মনে পুষে রাখতে যাবে কেন?

লীলা বলে, তর্ক করা অন্যায় হচ্ছে বাবা। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে আগেকার মতন আবার নিঃসম্বল হয়ে থাকতে বলেন?

ভুল ভেবেছ মা। জানোয়ার নয়, মানুষ। চারিদিকে কত সব ছাত্র আমার, তাদের একফোঁটা বয়স থেকে জানি। মানুষ বলেও সুখ হয় না—দেবতারাই যেন আমার ওইসব ছাত্রের মধ্যে রূপ নিয়ে আছেন।

লীলা বলে, লাহোরেও সবাই এমনি ভেবেছিল বাবা। কত কত অধ্যাপক-বন্ধু—প্রাণের দোসর। ভক্তিমান ছাত্রের দল সার বলতে অজ্ঞান। দুটো-তিনটে দিনের ভিতর কী হয়ে গেল, তখন আর পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পাইনে।

বলতে বলতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে সে কেঁদে পড়ল। বলে, কুপিয়ে কুপিয়ে মানুষ মেরে মরা-ইঁদুরের লেজ ধরে ছুঁড়ে দেবার মতন মড়া ফেলতে দেখেছি। নিজের এই চোখ দুটো দিয়ে দেখেছি বাবা, একটা-দুটো নয়—গাদা গাদা। আবার শুনতে পাই, বিনি-রক্তপাতে অহিংসার পথে না কি স্বাধীনতা এসেছে!

বীরেশ্বর চোখ নিচু করে ক্ষণকাল চুপ করে রলন। তারপরেই ধীরকণ্ঠে বলেন, তবু বলছি মা, বিশ্বাস করে আমার কাছে গচ্ছিত রাখো। খুব সাবধান করে রাখব। তোমার সঙ্গে-নিয়ে-আসা জিনিস কোন রকমে বেহাত হতে দেবো না। দরকারের মুহূর্তে পেয়ে যাবে। চাইতেও হবে না, আমিই তোমার হাতে গুঁজে দেবো।

॥ নয় ॥

রিটায়ার করার সময় আসন্ন, কিন্তু কলেজ-কর্তৃপক্ষ ছাড়তে নারাজ। কমিটির মধ্যে নুরুল্লাহ্। পুরানো ছাত্র আরও কয়েকজন আছে। সকলে মিলে আড় হয়ে পড়ল: কলেজে ইস্তফা দিয়ে আমাদের ছেড়ে পালাবেন, সে আশা ছেড়ে দিন মাস্টারমশায়।

বীরেশ্বর বললেন, ডিপার্টমেন্টের আইন। টেনেটুনে একটা বছর আরও না হয় টিকে থাকতে পারি। তারপরে আইন তো গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াবে। তার চেয়ে মানে-মানে হাসিখুশির মধ্যে চলে যাওয়াই তো ভাল।

নুরুল্লাহ্ বলল, আইন থাকে—আবার আইনের ফাঁকও থাকে নানান রকম। আইনের ভাবনা আমায় ভাবতেদিন মাস্টারমশায়। আপনার রেজিগনেশনের দরখাস্ত কমিটি সর্বসম্মতভাবে নামঞ্জুর করবে, ভিতরে ভিতরে আমাদের কথা হয়ে আছে।

সকাতরে আবার সে বলে, কত কষ্ট করে কলেজ একটা দাঁড় করানো গেছে, গাঁ-অঞ্চলের গরিব ছেলেদের পড়াশুনো হচ্ছে। আপনি চলে গেলে ইজ্জত-সম্ভ্রম ধ্বসে যাবে একেবারে।

কিছু বিরক্ত হয়ে বীরেশ্বর বললেন, চিরকাল বুঝি তোমাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম ঠেকনো দিয়ে রাখব? আমি মরব না?

না—

বলে বীরেশ্বরকে প্রণাম করে নুরুল্লাহ্ কথাবার্তার শেষ করে দিয়ে চলে গেল।

নিরুপায় বীরেশ্বর তখন বান্ধব খলিলুর রহমানকে ধরলেন। কলেজ-কমিটিতে তিনিও আছেন।

ডাক্তার আপনি। আমার অন্দরের কোনো খবর আপনার অজানা নয়। শখ করে মরতে চাচ্ছিনে, বুঝিয়ে বলুন আপনি ওদের। এতাবৎ আধা-পাগল স্ত্রীকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলাম, আর একজন—বউমা এসে পড়ল তার উপরে। কখন কি কাণ্ড করে বসে, সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে আছি।

বলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার ডাক্তারকে সতর্ক করেন: কথাগুলো এমন স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে যাবেন না কিন্তু ডাক্তার-সাহেব, আকারে-ইঙ্গিত ঠারেঠোরে বলবেন। ছাত্র ওরা সব, পুত্রতুল্য—মনে কোন রকম ব্যথা পায়, আমি সেটা চাইনে।

হাত ঘুরিয়ে অবহেলার সুরে ডাক্তার রহমান বললেন, ব্যথা কিসের? মুসলমানের উপর আক্রোশ, বাড়ির মেয়েরা মুসলমান-জাত ধরে বেধড়ক গালিগালাজ করেন—ডাক্তার হিসাবে আপনার অন্দরে ঢুকতে পাই বলে জ্ঞানটা আমার প্রত্যক্ষ। যাঁদের কথা বলছেন তাঁরা শিক্ষিত বুদ্ধিমান—তাঁদের কাছেও এ-জিনিস একেবারে অজানা নয়।

একটু থেমে আবার বললেন, আমার অন্দরের খোঁজ পান না আপনি। হিন্দু-অঞ্চলের ঘরবসত ফেলে আসতে হয়েছে—আমাদের মেয়েরাও হিন্দুর উপরে খাপ্পা, অষ্টপ্রহর গালিগালাজ করে। হতেই হবে—বিষবৃক্ষ পুঁতলে বিষফলই পাওয়া যায়। কিন্তু রিটায়ার করে আপনি পাকিস্তান ছাড়ছেন না—গাঁয়ের বাড়ি চলে যাচ্ছেন। শহর ছেড়ে গাঁয়ে থাকবেন, সেখানে তো আরও অসুবিধে। ভেবেচিন্তে দেখুন, ফ্রাইং-প্যান থেকে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়া হবে না তো? রাগ মুসলমানদের উপরে—ডাইনে-বাঁয়ে আগে-পিছে তারাই সব জমিয়ে আছে সেখানে। মাতব্বর সেরা হিন্দু যা আছেন, তাঁরা শহরের উপরে।

বীরেশ্বর সায় দিয়ে বলেন, ভারি ভারি দরের হিন্দু তাঁরা—উকিল, মার্চেন্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। ধনী-মানী জ্ঞানী-গুণী।

কিন্তু মুশকিল হল— শহরের যাঁরা মুসলমান, তাঁরাও সমান জ্ঞানী-গুণী। সংখ্যায় অনেক বেশি তাঁরা। স্বার্থের ঠোকাঠুকি শহরেই বেধে যায়। যত গণ্ডগোল, শহরে তার উদ্ভব। সর্বনাশের পাণ্ডা শহুরে ধনী-মানীরাই।

রহমান ডাক্তার ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করেন: কী বলেন! গাঁয়ে গণ্ডগোল নেই বুঝি?

বৈষয়িক কি সামাজিক গণ্ডগোল। ছোটখাট ব্যাপার— হিন্দু-মুসলমান নেই তার মধ্যে। হালে কিছু কিছু শুনি বটে, সে জিনিস শহরের মতলবী শিক্ষিতেরা শহর থেকে চালান করে দিচ্ছে। বিশেষ করে আমার গাঁয়ের কথাই বলি—বাপ-পিতামহের গ্রাম, আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। হিন্দু ছিল—বেশির ভাগই চাষাভুষো ক্ষেতমজুর, বড় জোর ছোটখাট জোতদার গাঁতিদার। ভয় ধরিয়ে দেওয়া হল তাদের, বাস তুলে তারা সরে পড়েছে। নিতান্ত গরিব নিরুপায় দু-চার ঘর আছে পড়ে। গ্রামবাসী প্রায় সবই এখন মুসলমান, সে আমি ভাল মতন জানি—নিরানব্বুই পার্সেন্টেরও বেশি।

গাঢ়স্বরে বীরেশ্বর বললেন, খোদার কাছে দোয়া করুন ডাক্তারসাহেব। বাইরে থেকে মাতব্বররা বিষ ঢোকাতে গিয়ে না পড়ে—রিটায়ার করে গাঁয়ের বাড়িতে শান্তিতেই থাকব আমরা।

দেড়-যুগ আগেকার কথা। ফুল্লরা একফোঁটা তখন। বাচ্চা মেয়ে কাঁধে তুলে শ্বশুর-শাশুড়ির পিছনে লীলা গাঁয়ের উঠানে গরুর-গাড়ি থেকে নামল।

যাবার মুখে লীলা রিভলভারের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল: জিনিষটা সঙ্গে নিয়ে যাবেন কিন্তু বাবা। মস্তবড় সহায়।

বীরেশ্বর অভয় দেন: নেবো বই কি। দুশমন দেখলে তোমার

হাতে তুলে দেবো—প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমি কি মিথ্যাচার করব মা তোমার সঙ্গে ?

দেড়-যুগ পরে বীরেশ্বরই এখন বধূকে পুরানো প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দেন : কত কষ্টে জোগাড়যন্তোর করে জিনিসটা এনেছিলে, আমার কাছে পড়ে পড়ে জং ধরে যাচ্ছে।

সহাস্যে লীলা বলে, কষ্ট আমায় একটুও করতে হয়নি বাবা। রওনা হচ্ছি, ছোড়দাই তখন হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে কোন কায়দায় পাচার করতে হবে, তালিম দিয়ে দিল। দুশমনের কাছে কান্নাকাটি আর অহিংসার বুলি কপচানোর গরজ না হয়, সেইজন্যে। বলেছিল, অন্য যারা করে করুকগে, আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়ের পক্ষে বেইজ্জতি। তা দুশমনই একটা তো পেলাম না এদ্দিনের মধ্যে। তা হলে চেয়েই নিতাম, দেবার জন্য তাগিদ দিতে হত না আপনাকে।

বীরেশ্বর নিরস্ত হলেন না : দুশমন এখন না থাক, কোন এক সময় মুখোমুখি এসে পড়তেও পারে। ভয় পেয়ে একদিন জিনিসটা আমি চেয়ে নিয়েছিলাম, সে ভয় কেটে গেছে। বুড়োমানুষ কবে মরে যাই—এবারে নিজের কাছে রাখো মা, আমি আর সামাল-সামাল করে বেড়াতে পারিনে।

লীলা তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, ফেলে দিন তবে বাবা। গাঙের জলে ছুঁড়ে দিন। আমার কোন দরকার নেই। ভারি সাংঘাতিক জিনিস—হাতে নিয়ে নেশায় পড়ে যাব, টার্গেট-প্রাকটিশ ধরব হয়তো আবার। ছটফটে দুরন্ত ছেলেপুলে নিয়ে আমার সংসার, কোনটা কোন দিক দিয়ে এসে পড়ে কখন—সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এই আঠারো বছরে লীলা মস্ত এক সংসার জমিয়ে নিয়েছে। ছেলে আর মেয়ে নিয়ে তিরিশের কাছাকাছি। সকলের সে মা-জননী।

ফুল্লরা অভিমান করে : পেটের মেয়ে আমি এক জন্মে মা'কে কাছে পাইনে, শতদলেরা সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে। মনে হয়, সৎমা তুমি আমার—ওরাই সব আসল।

লীলা স্নেহভরে তাদের একটি-দুটির দিকে চেয়ে জবাব দেয় : তোমার দাদা আছে, দিদা আছে—মা না হলেই বা কি! দুনিয়ার ভিতরে ওদের তো শুধুই আমি—একমাত্র মা ই শুধু।

শিশুদের একটা প্রতিষ্ঠান—শতদল নাম। শতদলের ব্যাপার নিয়েই ফুল্লরা মায়ের কাছে ঠোঁট ফুলায়। প্রতিষ্ঠাতা বীরেশ্বর, এবং তাঁর যৌবনবয়সের উৎসাহী বন্ধু কয়েকটি।

ছোট এক ঘটনা। যশোরে থাকতে ভোরবেলা কয়েক বন্ধু মিলে যথারীতি দড়াটানার মাঠে বেড়াচ্ছিলেন, অদূরে ভুঁইচাঁপা-বনের ভিতর দেখলেন পুঁটলি। কাছে গিয়ে ঠাহর হল, কাপড়চোপড়-জড়ানো সন্থপ্রসূত শিশু একটি। শেষরাত্রের দিকে ফেলে গিয়েছে কেউ।

বীরেশ্বর বসে পড়লেন সেই ঘাসবনের মধ্যে, বাচ্চা তুলে ধরলেন। ভুঁইচাঁপার জঙ্গলের ভিতর থেকে শতদল-পদ্ম যেন ঝলমল করে উঠল—আহা, কত দুঃখে বিসর্জন দিয়ে গেছে মা-হতভাগী। দেহ তখনো উষ্ণ, বুকের নিচে প্রাণটুকু ধুক-ধুক করছে। বীরেশ্বরের সঙ্গী একজন ছুটে গিয়ে একটু দুধ জোগাড় করে আনলেন একবাড়ি থেকে। রুমাল ছিঁড়ে ইতিমধ্যে সলতে পাকানো হয়েছে, বীরেশ্বর বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে দুধে ভিজিয়ে সলতে মুখে ধরেছেন, চুক-চুক করে কেমন খাচ্ছে স্তন্যপানের মতন।

এর পরে কোন ব্যবস্থা?

কমলবাসিনী শুচিবেয়ে মানুষ, কুড়ানো বাচ্চা নিজের বাড়িতে নিয়ে তোলা অসম্ভব। বন্ধুদেরও সেই অবস্থা—সাধ্যমত পয়সাকড়ির সাহায্য করতে রাজি, কিন্তু দায়িত্ব কে নিতে যাবে? ভেবেচিন্তে বাচ্চাটা কোতয়ালির থানায় নিয়ে জমা দিলেন।

ও. সি.-র ছেলে কলেজে পড়ে, সেই সূত্রে বীরেশ্বরের কিছু জানাশোনা ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি বললেন, আপনি বুকে করে নিয়ে এসেছেন, লোকত ধর্মত একটা কোন ব্যবস্থা করতে আমি বাধ্য। আইনতও বটে। কিন্তু উপায় ভাবতে গিয়ে থই পাচ্ছিনে। কলকাতায় নানা রকম সমিতি আছে—মফস্বল-শহরে কার মাথাব্যথা, এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবে? অথচ হেলাফেলাও আর চলে না—আখচার এই জিনিষ। পথে-ঘাটে জলে-জঙ্গলে রাত্রিবেলা চুপিসারে খই-মুড়ির মতন ছড়িয়ে যাচ্ছে। তবে সার, সবই প্রায় মরা—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নুন গালে পুরে মেরে রেখে যায়। আমাদেরও হাঙ্গামা কিছু নেই—খানিকটা হাই-হুই করে কচুরিপানার গাদে ঢুকিয়ে দিই। জ্যান্ত আছে বলেই না মুশকিল। সার্কল-অফিসার আমাদের হামিদ সাহেবের স্ত্রী বন্ধ্যা—শুনেছি তিনি একটা বাচ্চা মানুষ করতে চান। বলে-কয়ে তাঁর ঘাড়ে গছানো যায় কি না দেখি।

বীরেশ্বরকে পুনশ্চ অভয় দিলেন: নির্ভাবনায় চলে যান সার। আপনি হাতে করে দিলেন—ফেরত নিতে হবে না, ব্যবস্থা করবই। দু-এক দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে।

মিথ্যে স্তোক দেন নি ও. সি. সাহেব। ব্যবস্থা হয়েছিল, এবং দু-দিনের ভিতরেই। বাচ্চাকে আর ফেরত আনতে হয় নি—দু-দিন পরে খবর নিতে গিয়ে শুনলেন, মরে গেছে। কিন্তু ব্যবস্থাটুকু কে করে দিলেন—খোদা না মানুষ, জানবার উপায় নেই। বাপ-মায়ের ভুল হয়ে গিয়েছিল—নুন খাইয়ে প্রাণটুকু শেষ করে দেয় নি। সে ভুল অন্য কেউ সংশোধন করে সর্বসমস্যার সমাধান করে দিল কি না, বীরেশ্বরের চিরকাল সন্দেহ রয়ে গেল।

বীরেশ্বর তারপর উঠে-পড়ে লাগলেন। ভ্রূণহত্যা ও শিশুহত্যা অজস্র চারিদিকে—ডাক্তার-বন্ধুদের কাছে বিবরণ শুনে শিউরে উঠতে হয়। চোখ বুজে থাকলে হবে না। পাপ ও সামাজিক ক্ষতি-

রোধের চেষ্টা করতেই হবে। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ চলেছে, প্রৌঢ় বয়সে তখনও বীরেশ্বরের উদ্যম ও কর্মশক্তি প্রচুর। ভূতপূর্ব ছাত্রদের অনেকেই নানান বৃত্তি নিয়ে জমিয়ে বসেছে। বন্ধুবান্ধবও অনেক। সকলের শ্রদ্ধা-ভালবাসা বীরেশ্বরের উপর। যশোরের মতন সামান্য শহরে তাঁরা এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন পিতৃপরিচয়হীন ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মানুষ করে তোলার জন্য। নাম দেওয়া হল: পঙ্কজ-বিহার। বিহারের যারা বাসিন্দা তারা সব পঙ্ক থেকে উঠে এসেছে, সেই বিচারে নামকরণ। বিহারের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে এলেন মৃণালিনী দেবী নামে এক বিধবা ভদ্র-মহিলা। কাজটা তিনি ভালবেসে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করলেন। দেখতে দেখতে পঙ্কজ-বিহার জাঁকিয়ে উঠল, নাম ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। অনেক দূরের কলকাতা অঞ্চল থেকেও বাচ্চা বয়ে এনে বিহারে দিয়ে যায়।

তারপরে দুর্দিন এলো বিহারের। দেশ ভাগ হয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থা। মানুষ-জনের ছুটোছুটি—কে কোন দিকে পালাবে দিশা করতে পারে না। অনেক শতাব্দী ধরে যেমন তেমন চলে আসছিল —পলকের মধ্যে সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। পঙ্কজ-বিহারের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুস্থানে চলে গেলেন, কেউ কেউ মারাও গিয়েছেন ইতিমধ্যে। সকলের বড় সর্বনাশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মৃণালিনী দেবী মারা গেলেন—বিহারকে যিনি প্রাণের অধিক ভালবাসতেন। পঙ্কজ-বিহার টিমটিম করছে। পঞ্চাশ-ষাটটি বাচ্চা ছিল, সেখানে পাঁচ-সাতটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। সরকারি সাহায্য এখন কাগজে-কলমে হিসেবের মধ্যেই আছে, টাকা বড়-একটা হাতে আসে না। মৃণালিনীর পর যিনি নতুন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে এলেন, তাঁর মাস-মাইনেটাও জোটানো সঙ্কট হয়ে উঠেছে ইদানীং। কমিটির সভাপতি বীরেশ্বর একা আর সামাল দিতে পারেন না। তাঁরও মন ভাল নয়,

ছেলে-বউয়ের খবর নেই। তারপর কুন্তী কোন রকমে এসে পৌঁছল, তার কাছে লাহোরের বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। পুত্রশোকে কমলবাসিনী পাগলিনীপ্রায়। বিহারের দরজায় পুরোপুরি এবারে তালা পড়ে গেল।

রিটায়ার করার পর গাঁয়ে চলে গিয়ে প্রচুর অবসর, কাজকর্মের মধ্যে না থাকলে মন হু-হু করে। তবু নাতনিটা আছে। ফুল্লরা কিছু বড় হয়েছে, তাকে নিয়ে বুড়ো-বুড়ি দু'জনের দিব্যি কেটে যায়। বীরেশ্বর পড়ান ফুল্লরাকে—তারই সঙ্গে গল্পগাছা, বেড়ানো। গাঁয়ের উপর নতুন করে বিহার গড়ে তুলবেন, এই সময়টা মাথায় এলো। নাম পালটানো হল। পঙ্কজ-বিহার নয়—শতদল এবারের নাম। বাচ্চাদের কোথায় উদ্ভব সেটা তুলে ধরার কি গরজ? খানিকটা যেন নিষ্ঠুরতার ছায়া ছিল পুরোনো নামের মধ্যে। যা তারা হয়ে উঠবে, সেই বস্তু ঝলমল করছে এবারের নতুন নাম 'শতদলে'। অথচ অর্থের দিক দিয়ে মিল রয়েছে। পাকিস্তান হবার পর স্থানীয় কর্তা যাঁরা হয়েছেন, অনেকেই বীরেশ্বরের ছাত্র। প্রতিষ্ঠান যশোর থেকে গাঁয়ে সরিয়ে সম্পূর্ণ নিজের এক্তিয়ারে আনলেন। আগের সুনাম আছে—বাচ্চাও দু-চারটি এসে গেল।

বাচ্চাদের দেখিয়ে বীরেশ্বর লীলাকে বললেন, মুখের পানে তাকিয়ে দেখ মা। বড় দুর্ভাগা—দুনিয়ার উপর কেউ আপন নেই। বাপের সাকিন নেই, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান কোন ধর্মেরই ছাপ পড়ে নি এদের গায়ে—

বীরেশ্বর একটু হাসলেন: তোমার বদলা নেবার প্রতিজ্ঞা—সে এলাকার বাইরে পড়ে গেল এরা। মুসলমান কি হিন্দু কিম্বা অন্য-কিছু, ধরবার উপায় নেই। মাইনে দিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-মেট্রন অঢেল মেলে, কিন্তু মা হয়ে বাঁচিয়ে তুলবেন—মৃণালিনী দেবীর পরে তেমনটি আর পেলাম না। মৃণালিনীরা গণ্ডায় গণ্ডায় আসেন

না জানি। কিন্তু তেমনি একটি মেয়ের অভাবে যশোরের অমন বিহার ধ্বসে পড়ল। তোমায় ডাকছি মা আমার সঙ্গে। বাইরের সকল বন্দোবস্ত আমি দেখব, তুমি এদের মা-জননী হও।

আকুল প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলছেন, অস্বীকার করা কঠিন। তবু ইতস্তত করে লীলা বলল, কী অবস্থা আমার হয়েছিল সে কি ভুলে গেলেন বাবা? ডাক্তার রহমান বিস্তর কষ্টে ভাল করে তুলেছেন, মাথা আবার বিগড়াতে কতক্ষণ?

বাচ্চাদের কাজে যদি থাকো, বিগড়াবার মতন সময়ই পাবে না তোমার মাথা। ঝামেলা কী রকম, নিয়ে দেখ। পাকাপাকি ভার না নেবে তো নেহাৎ ছ'মাস-একবছরের জন্য নাও।

অনিচ্ছুক লীলা নীরবে মেঝের উপর আঁচড় কাটে পায়ের নখে। তাকিয়ে দেখে বীরেশ্বর বললেন, এমন একটা মহৎ জিনিষ লোকের অভাবে ঠিকমত চালু হতে পারছে না। কাজ চালাতে থাকো তুমি, আমিও লোকের সন্ধানে রইলাম। লোক পাই ভাল না-পাই ভাল, তোমার কাছে কথা দেওয়া রইল—অনিচ্ছা যে মুহূর্তে জানাবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমায় রেহাই দেবো। শতদলের স্বার্থ ভেবে আটকাতে যাব না।

এর পরে আর কিছু সে বলতে পারে নি। শতদলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লীলা। কাজটা অস্থায়ী ভাবে নিয়েছিল—দরকার হলেই ছেড়ে দিতে পারবে, এই চুক্তি। সেই থেকে চলছে—দরকার আজও হয় নি, হবে কোনদিন মনে হয় না।

একফোঁটা সেই ফুল্লরা কত বড় হয়ে গেল, কমলবাসিনী তাগিদ দিয়ে দিয়ে বীরেশ্বরকে পাগল করে তুলছেন: নাতনি সেয়ানা হল, তা যে মোটে নজরে পড়ে না। বিয়েথাওয়া দাও এইবারে, উঠে-পড়ে লাগো।

বীরেশ্বর খোঁজখবর নিচ্ছেন, একে তাকে বলেন।

॥ দশ ॥

ওপারের হিন্দুস্থানে একবার উঁকি দিয়ে আসি চলুন।

ধান নেই চাল নেই—মাঠের এত ধান দেখতে দেখতে কোন অন্দরে বেমালুম লুকিয়ে পড়েছে। মরশুমের গোড়াতেই এই অবস্থা, আস্ত কাল পড়ে রয়েছে এখনো।

আরও মুশকিল, লোকের মতিগতি ভাল নয়। মুখে মুখে বেয়াড়া কথাবার্তা। হবে না কেন? গান্ধিজী নেই—তাঁর এত আদরের খদ্দর এখন মীটিঙের সময় গায়ে ও মাথায় চড়ানোর জন্য যৎসামান্য লাগে। শিষ্য-প্রশিষ্যেরা মসনদে চেপে বসে কারণে-অকারণে গুলি চালিয়ে অহিংসানীতির পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন এই আঠারো-উনিশ বছর ধরে। আঁচ পেয়ে গান্ধিজী আগেভাগেই বলেছিলেন: Cease to be rulers and become friends. কেবা শোনে কার কথা! রাজত্ব করব না তো জেল খেটেছি কিসের জন্য?

আচার্য কৃপালনী—গান্ধিজীর পয়লা-নম্বুরি সুহৃৎ ও সাগরেদ, পরম অহিংস—তিতবিরক্ত হয়ে বলছেন, অনশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যদি না জানানো হয়, সেটা হবে দেশের পরম দুর্দিন। আমি বলি, অনশনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই পরম কর্তব্য। সরকার মানুষ হত্যা করছে, বিরোধীরা সেই জিনিস রাজনৈতিক কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে—এ অভিযোগের মানে হয় না। এই বাংলাদেশেই পঞ্চাশের মন্বন্তরে তিরিশ লক্ষ মরেছিল—অথচ খাদ্যশস্য গুদামে বোঝাই, দোকানে থরে থরে খাদ্যসামগ্রী সাজানো। কোনখানে লুঠতরাজ হয় নি—এমনি অধঃপতন তখন দেশের! তোমাদের সরকারের মনোভাব, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করলেই দায়িত্ব খালাস। মানুষকে খাওয়ানোর দায়িত্ব যেন তাদের নয়,

ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক সে দায়িত্বও নয়। দেশের কুশাসন আর জনসাধারণের দুর্গতির সব দায়িত্ব অপদার্থ সরকারের।

অন্য কেউ নয়—গান্ধিবাদী পরমপ্রাজ্ঞ নেতা কৃপালনীর মুখের বাক্য এই। আর লোহিয়ার তো চাঁচাছোলা বুলি, লোকসভার ভিতরেই বোমা ফাটিয়েছেন: বিরোধীদল যদি মনে করেন, অহিংস পন্থায় সরকারকে সরানো যাবে না, তবে সচিবালয় দখল করে নেওয়াই হবে উত্তমপন্থা।

লোকের মুখে মুখেও এমনি সব কথা: রক্ষে নেই সিন্ধবাদের দল আরো যদি ঘাড়ে চেপে থাকে। হাড় খাবে, মাংস খাবে, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে—

শুষ্কমুখের উপর ভয়ার্ত দৃষ্টি। গুটি গুটি দু'টি মানুষ চলেছে। একজনকে বিলক্ষণ চিনি—হরিহর খাঁ। যাঁর কাছে ধান কিনতে গিয়ে প্রণব একঝুড়ি হাহাকার শুনে ফিরে এসেছিল। শুধু 'খাঁ' বলা ভুল হয়েছে, 'চৌধুরি' জুড়ে দিতে হবে—হরিহর খাঁ-চৌধুরি। পিতামহ জীবনচন্দ্র খাঁ। কতগুলো আবাদে কত যে ধানজমি, লেখা-জোখা ছিল না। খাঁয়েরা ধান্যের শাহান-শা—সেই আমন থেকেই। হরিহরের পিতা রসময় খাঁ ধান ছাড়াও ব্যাপার-বাণিজ্যে ঝুঁকলেন। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্ধং কৃষিকর্মণি। অর্ধেকে কেন খুশি থাকতে যাবেন—লক্ষ্মী পুরোপুরি হাসিল হয়ে যান, তার আগে ছাড়াছাড়ি নেই। রাখি-মালের কারবার—মরশুমে ফসল কিনে গুদামজাত করেন, মুনাফা রেখে অসময়ে সেই মাল ছেড়ে দেন। তস্য পুত্র হরিহরের আমলে উন্নতি আকাশ-ছুঁই-ছুঁই করেছে। কৌলিক উপাধি শুধুমাত্র 'খাঁ' ছিল, অতিরিক্ত ধনী হয়ে 'চৌধুরি' চড়িয়েছেন। কোন্ তদ্বিরে 'পদ্মভূষণ' চড়ানো যায়, সেই এখন সকলের বড় চিন্তা। এবং একটা এম. এল. এ.। তদতিরিক্ত একটা এইচ. এম. অর্থাৎ অনারেবল মিনিস্টার যদি হতে পারেন

তবে তো সোনায়-সোহাগা—পুরো মন্ত্রী না-ই হলেন, আধা-মন্ত্রী অর্থাৎ ডেপুটি-মিনিস্টার হতেও আপত্তি নেই।

সবই হতে পারত। অদ্ভুত ঘড়েল লোক, সে তো পয়লা পরিচয়েই ধরে ফেলেছেন। ফলাও চালানি কারবার—এক জায়গায় অনড় হয়ে কেনা-বেচা নয়, মাল এখন এদেশ-সেদেশ ছুটোছুটি করে বেড়ায়। পারমিট যেন পোষা-পাখি। শিস দিলেই ঝাঁকে ঝাঁকে চলে আসে। যেগুলো খুশি কাজে লাগালেন, বাকি সব যত্রতত্র দান-বিক্রি করেন। নাম কেনেন এমনিভাবে, এবং কৃতার্থ মানুষগুলোকে হুকুমের গোলাম করে রাখেন। সেই কৃতার্থদের একটিকে এই সঙ্গে নিয়ে চলেছেন—রাজীব ত্রিপাঠি নাম। ত্রিপাঠি এতাবৎ হরিহরের নিত্যসঙ্গী ছিল—সে মানুষও পাকছাট মারে, কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মতিচ্ছন্ন মানুষজনের—উচিত পাওনাগণ্ডা বলে বরাবর যা জেনে-বুঝে এসেছে, আপোসে তাই হাতে তুলে দিলেও এখন তারা খুশি নয়। এবং আইন মেনে অহিংস পথে দাবি-আদায়ের আন্দোলন চালাবে, সে জিনিসও আর থাকছে না। গান্ধিজী মহাপ্রয়াণ করলেন—খদ্দর বাতিল হল, তাঁর অহিংসনীতিও যায়-যায়। এ বাবদে শিষ্যজনেরাই অবশ্য প্রথম দৃষ্টান্ত দেখালেন।

কখন কী ঘটে যায়—মন-মেজাজ হরিহরের অতিশয় খারাপ। সেই হেতু চায়ের দোকানে চলেছেন। একলা চলাচল কোন দিনের অভ্যাস নয়, আর এখন তো দরজায় খিল দিয়েও নিঃসঙ্গ থাকতে গা-ছমছম করে। ত্রিপাঠিকে টেনেটুনে নিয়ে চলেছেন।

ভর দুপুর। পঞ্জিকা মতে বসন্তকাল, কিন্তু আবহাওয়া গরম দস্তুরমতো। প্রাকৃতিক আবহাওয়া, এবং রাজনৈতিক। বড় সুবিধা, পথ একেবারে জনশূন্য।

ত্রিপাঠি বারবার সেই কথা বলছে, কেউ দেখছে না—তাই

বেরুতে পারলাম হুজুর। আপনার আশ্রয়ে থেকে অনেক খেয়েছি অনেক পেয়েছি, একটা-কিছু বললে 'না' করতে পারিনে। বাবুদিগর কিন্তু একসঙ্গে এমন পথে বেরুনোর আদেশ করবেন না। নিজেও আপনি না-ই বা বেরুলেন। যা দিনকাল পড়েছে, সামাল হয়ে চলাফেরা ভাল।

কথায় কথায় চা-খানায় এসে পড়লেন। বাড়ি থেকে সামান্য পথ, প্রভূত জানাশোনা। মন খারাপ হলে এই দোকানের চায়ের তৃষ্ণা পেয়ে যায়। এখানে আপনি-আমি চায়ের বাটি নিয়ে বসে যাই—হরিহরের জন্য পৃথক একটু কামরা ও গুহ্য রকমের পানীয়। না-না করেও ত্রিপাঠি শুধু এই দোকানের নামেই চলে এসেছে। 'তু' বলতে কুকুরের মতন পিছন ধরে চলত, সেই মানুষও মাতব্বরির বচন ছাড়ে। হরিহর মনে মনে গর্জাচ্ছিলেন—শোধ নেবেন এইবার। তীরে এনে তরী ডুবিয়ে দেবেন।

বললেন, কাজ আছে বলছিলে—তবে আর আটকাব না ত্রিপাঠি। এইবারে তুমি যেতে পারো।

কী আশ্চর্য, ত্রিপাঠি একপায়ে-খাড়া। বলার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভরে পথের ধূলার উপরেই প্রণাম করল। গদগদ হয়ে বলে, বাঁচালেন ছুটি দিয়ে। হুজুরের সকল দিকে দৃষ্টি। বড়লোক আপনি, ভালমন্দ খেয়ে উৎকৃষ্ট গতর বানিয়েছেন—পেটে খেলে পিঠে সয়। কিন্তু আপনার ভাগীদার ভেবে আমায় যদি ভাগ দিতে আসে, আমি তো এক ঘা না পড়তেই মারা পড়ব।

সুজলাং সুফলাং—'বন্দেমাতরম্' গান বাঁধলেন বঙ্কিমচন্দ্র। জাতীয় সঙ্গীত। বাংলাদেশে তা-ই ছিল, স্বচক্ষে দেখেই বঙ্কিম লিখে গেছেন। ঘরে ঘরে গোলা, গোলা-ভরতি ধান—সে গোলাও একটা-দুটো নয়। হরিহরের ঠাকুরদাদা জীবন খাঁয়ের কথা বলি। ক্ষেতের ধান তুলেপেড়ে রাখাই তাঁর কাছে সকলের বড় সমস্যা।

গোলা বেড়েই চলেছে—চারটে, পাঁচটা, সাতটা। ভিতর-বাড়ি, বাইরে-বাড়ি, গোয়াল-বাড়ি, তেমনি আরও একটা—গোলাবাড়ি। ধান হলেন লক্ষ্মী—ধান-চাল যতই থাকুক, একটি কণিকার যেন অবহেলা অপচয় না হয়। লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। চালের একটি দানা কোথাও পড়লে খুঁটে নেন ঘরের লক্ষ্মী মেয়েরা।

জামির দপ্তরি এক টাকার ধান কিনেছে জীবন খাঁয়ের কাছে। এইমাত্র অপরাধ। গোলা থেকে ধান পেড়ে কুলোর বাতাসে চিটে উড়িয়ে পালি মেপে গোলাবাড়ির উঠোনে রেখেছে। পুরো টাকার ধান—চাট্টিখানি কথা নয়। এই স্তূপাকার হয়েছে। কেনা-ধান জামির বয়ে বয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। বইছে তো বইছেই। বেলা ডুবে ঘোর হয়ে যায়, ধান বওয়া শেষ হয় না তবু। জামিরের সন্দেহ হল, খাঁ মশায় লোক সুবিধের নন—ভিতরে কারসাজি আছে নিশ্চয়। শ্রান্ত জামির দু-এক কথায় মেজাজ হারিয়ে ফেলল: ফেরেব্বাজ মানুষ তুমি খাঁ মশায়—এক-শ বার বলব, হাজার বার বলব। নির্ঘাত তুমি ধান মিশিয়ে দিচ্ছ।

বিষম কলহ, মারামারি হবার যোগাড়।

লোকজন জমে গেল: কী ব্যাপার? কী হয়েছে দপ্তরি ভাই?

জামির বলে, দশ মুরুব্বি তোমরাই বিবেচনা করে দেখ। ধান তো এক টাকার—তা সেই বিকেল থেকে বইছি, গাদা যেমন-কে-তেমনি। কমে না।

জীবনের সাফ জবাব: আমি তার কি জানি? গায়ে তাগত নেই মিঞার। এক-এক খুঁচি নিয়ে গজেন্দ্রগমনে যাচ্ছে। এখনো হয়েছে কি—রাত পুইয়ে সকাল হবে, ধান বওয়া তবু সারা হবে না।

জামির সকলকে মধ্যস্থ মানে: শুনলে কথা! ধানের বোঝায় ঘাড় বেঁকে যাচ্ছে, মড়াত করে ভেঙে দু-খণ্ড না হয়ে যায়—আর

বলে কিনা এক-এক খুঁচি করে বইছি। ধান কাটা চলেছে এখন, গোলা খালাসের গরজ—আমি যেই এক বস্তা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, আলাদা ধান সেই ফাঁকে মিশাল দিয়ে দিচ্ছে।

হাতজোড় করে জনতাকে বলে, কেউ একটু পাহারা দাও—এক-ছুটে বাড়ি গিয়ে বড়দাকে ডেকে আনি। বড়দা দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি বইব। তবে যদি বওয়া শেষ হয়। ও-মানুষ আমার ঘাড় ভেঙে গোলা-খালাসির তালে আছে।

মাতব্বরেরা জীবনকে নিন্দেমন্দ করেঃ না জীবন, মানুষটা কেনা-ধান তোমার উঠোনে বিশ্বাস করে রেখেছে—এমন কারসাজি করতে নেই। বেইমানি বলে একে।

জীবনের নাতি হরিহর। গোলাবাড়ি নেই এখন, সবটা ঘিরে বিশাল কম্পাউণ্ডের ভিতর হাল ফ্যাসানের অট্টালিকা। গোলার পাকা ভিটে কয়েকটা স্মৃতিচিহ্নের মতন রয়ে গেছে।

হরিহর শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, জমিজমা গভর্নমেণ্ট কি আর থাকতে দিয়েছে? গোলা তো এক্ষুনি বানিয়ে নিতে পারি, কিন্তু রাখবার জিনিস কই?

সে কথা সত্যি। জীবন খাঁয়ের আমল নেই—ধান সোনার চেয়ে মূল্যবান। সে জিনিস বাঁশের-বেড়ের খড়ের-ছাউনির গোলায় রেখে ভরসা করা যায় না।

শ্রীমন্ত ডাক্তার আর হর্ষনাথ উকিল সত্যিকারের শুভানুধ্যায়ী—সর্বক্ষণের বন্ধু। নতুন বিল্ডিং বানানোর সময় তাঁরা উপদেশ দিলেনঃ মাটি খুঁড়ে ফেলে পাতালে একটা তলা আলাদা করে বানিয়ে নাও। লড়াই কবে আবার লেগে যায়, ঠিক নেই। বোমার ভয়ে তখন তো ইঁদুর হয়ে গর্ত খুঁজে বেড়াতে হবে। আগে ব্যবস্থা থাকা ভাল।

যুক্তিটা মনে ধরেছিল। হরিহর মেঝের নিচে কংক্রীটের জল্ট

বানিয়ে নিয়েছেন। বোমা না-ই পড়ল, পাতাল-তলাটা থেকে ইদানীং বড্ড কাজ দিচ্ছে।

নতুন আইনে পঞ্চাশ বিঘের বেশি ধানজমি একজনের নামে থাকতে পারে না। আইন যাঁরা করেছেন তাঁদের নিজেদেরই বিস্তর স্বার্থ—ভেবেচিন্তে খসড়া বানানো জমিদার-জোতদারদের যথোচিত ওয়ার্নিং দিয়ে। এমনিধারা একটা জিনিস আসছে, আনতেই হল, ঠেকানো গেল না—যা করবার তাড়াতাড়ি সেরে ফেল বাবাসকল।

জমি বিক্রি এর পর ঊর্ধ্বশ্বাসে চলল। ছেলে-মেয়ে ভাই-বোন মামা-মাসি যে যেখানে আছে নির্বিচারে জমি কিনে নিচ্ছে। কাজে খুঁত পাবেন না—পাট্টা-কবলুতি নিয়মদস্তুর রেজেষ্ট্রি-করা। খুঁত ধরতে যাচ্ছেই বা কে, উপরওয়ালাদেরও আখের দেখতে হয়। টানতে টানতে এমনি খোদ মিনিস্টার অবধি চলে যান না। ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়।

হরিহরের ধান পাতালের গুপ্তকক্ষে অদৃশ্য। সামনের দরদালানে আউড়ি বেঁধে কিছু অবশ্য চোখের সামনে রেখে দেন। ভেনে-কুটে সংসার-খরচা চলুক, লেভি আদায় করে নিক, দান-খয়রাত হোক, পড়শির কুনজর পড়ুক—সমস্ত কিছু ঐ আউড়িটা নিয়ে। বাড়ির কাছাকাছি গাঙ—ভদ্রাসন বাছাইয়ের মধ্যেও পূর্বপুরুষের দূরদৃষ্টি কত বুঝুন। নিশিরাত্রে তাক বুঝে ভল্টের ধান চুপিসারে নৌকোয় গিয়ে ওঠে।

বন্দোবস্ত অতিশয় পাকা। কিন্তু মানুষজন ত্যাঁদোড় হয়ে সব বুঝি বানচাল করে দেয়। এত ইনিয়ে-বানিয়ে হরিহর বলেন, শ্রোতার এক কানে ঢুকে অন্য কানে বেরিয়ে যায়। নেপথ্যে কি বলাবলি হয়, সে তো প্রণবদের বাড়ি খানিকটা শুনে এসেছি। হরিহর একলা নন, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ অবধি বেড় দিয়ে বলে।

সেই কারণেই বোধহয় হর্ষনাথ উকিল ও শ্রীমন্ত ডাক্তারের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। পাটোয়ারি মানুষের উকিল তো পদে পদে প্রয়োজন। লেভির পুরানো একটা নোটিশ হাতে নিয়ে হরিহর নিজে একদিন হর্ষ-উকিলের বাড়ি এসে হাজির।

উকিল সতৃষ্ণ নয়নে পথের দিকে চেয়ে চেয়ারে উবু হয়ে বসে বিড়ি টানছেন।

হরিহর অভিমানের সুরে বললেন, ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছেন উকিলবাবু। আপনি তো যাবেন না, হাঁটতে হাঁটতে আমিই তাই চলে এলাম।

হর্ষনাথ আমতা-আমতা করেন: মানে' বুঝলেন কি-না— মক্কেলের বড্ড ভিড়। রোজই যাই-যাই করি, কিন্তু নিশ্বাস ফেলার ফুসরত পাই নে।

হরিহর মনে মনে বলেন, ভিড় তাতে সন্দেহ কি। বিড়ি ফোঁকার ধরন দেখেই বুঝেছি।

স্ত্রীর বাতব্যাধি—হাঁটুর মালা ফুলে সম্প্রতি সুডৌল ফুটবলের আকার নিয়েছে। ডাক্তারের কারণে অতএব অজুহাত বানাতে হল না। রোগের নামে ডাক্তারও না এসে পারেন না।

হরিহরের সোজাসুজি প্রশ্ন: আসা-যাওয়া একেবারে ছাড়লেন যে?

শ্রীমন্তের জবাব: রোগির ঠেলায় আহার-নিদ্রা দুটোই বন্ধ হবার জোগাড়। কোন্‌দিন শুনতে পাবেন, নিজেই আমি শয্যা নিয়েছি—অন্য ডাক্তারে দেখে যাচ্ছে।

আহা রে, কী দুর্দিন দেশের! মামলা ও ব্যাধি দুটোরই দুরন্ত প্রাদুর্ভাব।

এক অন্ধকার রাত্রে আনাচ-কানাচ ভেঙে ত্রিপাঠি এসে পায়ের ধুলো নিল। বউ নাকি বাপের বাড়ি যাবার জন্য পাগল।

বাসন-কোসন তোষক-মাদুর ছেলেপুলে সুদ্ধ তথায় চালান করে দিয়ে এই ফিরছে। নৌকো আঘাটায় ধরে নেমে পড়ছে।

মুখে আতঙ্কের কথা: গতিক সুবিধের নয়। হুজুরের আশ্রয়ে অঢেল করে-কর্মে খেয়েছি—তাই ভাবলাম চুপচাপ সরে পড়লে ধর্মহানি হবে, বলে-কয়ে আসা উচিত। আচ্ছা, আসি এই-বারে হুজুর। নৌকো জঙ্গলে বেঁধেছে—মশায় ওদের সবখানি রক্ত শুষে নিল এতক্ষণে।

হরিহর বিরক্ত হয়ে বলেন, কী বলতে এসেছ—বললে না তো কিছু ?

বলা হয়ে গেছে। গতিক খারাপ। যাবতীয় মালপত্তর সরিয়ে এসেছি, আমিও এবার সরব। আপাতত আর দেখা হচ্ছে না। মোটমাট এই দুটো কথা আমার।

ত্রিপাঠি গড় হয়ে পদতলে প্রণাম করল। লোকটা ভক্তিমান, এবং ধার্মিকও বটে।

হরিহর মুখে মুখে বড়াই করেন: কেন পালাচ্ছ বুঝিনে। আমি তো দিব্যি রয়েছি হে। বাড়ির ভিতরের ওরাও সব আছে।

ত্রিপাঠি বলে, ভিতর ফাঁকা করুন হুজুর, দেরি করবেন না। নিজেও সরে পড়ুন—হয় কলকাতা শহরে, নয় তো সুন্দরবনের জঙ্গলে। গা-ঢাকা দেবার পক্ষে দুটোই আহা-মরি জায়গা।

ঢোক গিলে আবার বলে, যে-জিনিসের নাম মুখের ডগায় আনেন না, তা-ও হুজুর তাড়াতাড়ি ফাঁকা করে ফেলুন। যত আক্রোশ ঐ পাজি জিনিস নিয়ে। একটা চিটের নিশানাও বাড়িতে পড়ে না থাকে।

আবার প্রণাম করে রাজীব ত্রিপাঠি সাঁ করে বেরিয়ে পড়ল।

॥ এগারো ॥

পাত্র কোথা পাকিস্তানে? ভাল পাত্র যা ছিল, বিলকুল বর্ডার-পারে চলে গেছে। রদ্দি মাল দুটো-চারটে পড়ে আছে, ফুল্লরার যোগ্য তারা নয়।

কমলবাসিনী বলেন, বর্ডার পার হয়ে তবে খোঁজখবর করগে। ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়। লোকে তো পট-পট করে পার হয়ে যাচ্ছে।

নিজের বিয়ের ব্যাপার হলেও ফুল্লরা ঠাকুরমার কাছে গিয়ে ফোড়ন কাটে: অত হাঙ্গামা দাদু পেরে উঠবেন না।

না পারলে কে আর পারবে? যার করবার কথা সে যে ফাঁকি দিয়ে গেছে।

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে কমলাবাসিনীর। ধারাপতন শুরু হয় আর কি। ফুল্লরার কৌশল আছে—কলহ জুড়ে দেয় অমনি: বুঝি গো বুঝি দিদা, আমায় তাড়ানোর ফিকির। কতগুলো করে খাই তোমাদের? না-হয় এক বেলা করে খাবো এখন থেকে।

কথার মোড় ঘুরল। হাসি চিকচিক করে ওঠে কমলবাসিনীর মুখে। নাতনির থুতনি ধরে নাড়া দিয়ে বললেন, তাড়ানোর ফিকির—তাই বটে! নিজের যেন ইচ্ছে হয় না! তোর বয়সিরা দুটো-তিনটের মা হয়ে ছেলে-মেয়ে কোলে-কাঁখে নিয়ে দিব্যি সুখে ঘরসংসার করছে।

শিউরে উঠে ফুল্লরা বলে, রক্ষে করো দিদা। ছেলে-মেয়ে কোলে-কাঁখে নেবার শখ নেই আমার অত।

নাছোড়বান্দা ঠাকুরমা বল্লেন, দরকারও নেই—কোলে-কাঁখে আমরাই করব। ছুঁতেও দেবো না তোকে। শখ তোর না থাকুক আমাদের আছে—ঘরবাড়ি আলো-করা নাদুসনুদুস একটা

নাতজামাই আনব। কোমর বেঁধে লেগে গেছেন তোর দাদু। চিঠিপত্তোর লিখছেন, যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই বলছেন। জুটে যাবে শিগগির, দেরি হবে না।

ফুল্লরা বলে, নাতনি তোমাদের অনেক তো আছে। আমায় রেহাই দাও, তাদের নিয়ে পড়ো গে।

বুঝতে না পেরে কমলবাসিনী সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন।

শতদলের নাতনিরা। ছোটদের বাদ দিলাম, তোমাদের হিসেব মতো দুটো-তিনটে তো দস্তুরমতো অরক্ষণীয়া। বিয়ে-থাওয়া দাও তাদের, ঘরজামাই এনে চব্বিশ ঘণ্টা চোখের উপরে রেখে মনের শখ মেটাও।

ঘেন্না! ঢিল-পাটকেলের মতন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা—তারা নাকি নাতনি!

মুখ বাঁকিয়ে কমলবাসিনী সরে গেলেন।

কমলবাসিনী মিথ্যো বলেন নি। পাত্রের সন্ধানে বীরেশ্বর উঠেপড়ে লেগেছেন। ফুল্লরা তাঁর উপরে হুঙ্কার দিয়ে পড়ল: তোমার নাতনির কত কুড়ি বয়স হয়েছে দাদু, যে বিয়ে না দিলে ঘর ভেঙে পালাবে? আট বছরে গৌরীদান হত, দিদার কাছে গল্প শুনে থাকি। কিন্তু সে-কাল পার হয়ে অনেক তো এগিয়ে এসেছি। বিয়ে ধরো না-ই হল আমার।

বীরেশ্বর বললেন, তোর ঠাকুরমা উতলা হয়ে পড়েছে। তাকে নিয়েই ভয়। সাংঘাতিক অবস্থা হয়ে উঠেছিল, তুই তখন একফোঁটা শিশু। তোকে পেয়ে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তোর সুখের সংসার হবে, এবারে তার সেই ঝোঁক। না হলে হয়তো ক্ষেপে যাবে আবার।

ঘোর বেগে খোঁজাখুঁজি চলল। সত্যি, কঠিন হয়েছে উপযুক্ত পাত্র জোটানো। এক-একটা খবর আসে, বীরেশ্বর পুত্রবধূর সঙ্গে

পরামর্শ করতে বলেন। আদ্যোপান্ত বিবরণ দিয়ে প্রশ্ন করেন: বলো দিকি সোনার-পদ্ম মেয়ে এমন ছেলের হাতে কেমন করে দিই?

হনুমান-মেয়ে—

জানলার ওধারে ফুল্লরা পড়াশুনোয় আছে—উঁচু গলায় মেয়ের কানে পৌঁছানোর মতো করে লীলা বলল।

বীরেশ্বর চটে গেলেন: কোন্ চোখ দিয়ে দেখে তুমি হনুমান বলো?

ফনফন করে গাছ বেয়ে উঠে যায়, এ-গাছ থেকে ও-গাছ লাফ দিয়ে পড়ে—হনুমান ছাড়া কি। হুপ হুপ আওয়াজটাই কেবল করে না।

হেসে পড়ল লীলা। হাসতে হাসতে বলে, মিছে চেষ্টা বাবা। কার্তিক কি কন্দর্প যে পাত্রই আসুক, পছন্দ হবে না। নাতনি চলে যাবে, ভাবতেই আপনার মন বিগড়ে যাচ্ছে।

ভুল ধারণা তোমার। পছন্দ হয় কি না দেখবে। পাকিস্তানে ভাল পাত্র নেই, পার হয়ে সমস্ত চলে গেছে। ও-পারের খোঁজ নিতে হবে। নিচ্ছিও।

লীলা বলে, ভাল বিয়েথাওয়া পাকিস্তানেও অঢেল হচ্ছে বাবা। পাত্র-পাত্রী পাকিস্তানেরই।

হচ্ছে বই কি! হবার যাদের, হচ্ছে—

ঢোক গিলে বীরেশ্বর আবার বললেন, পাত্র-পাত্রী কেন ভাল হবে না। সোনার টুকরো ছেলেমেয়ে, আমারই ছাত্র কতজনা। হিন্দু-মুসলমান আমার কাছে বাছবিচার নেই। ধর্ম জীবনের সমস্যাই নয় আজকের দিনে। লোকটা খৃস্ট ভজে না কৃষ্ণ ভজে, বুদ্ধ ভজে না আল্লাহ্ ভজে, কারও কোন মাথাব্যথা নেই তা দিয়ে। ভুল বললাম, আছে সামান্য-কিছু লোকের—কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখ, নিছক ঐহিক স্বার্থ তার মূলে। এদেরও দিন ফুরিয়েছে, দ্রুত লয় পেয়ে যাচ্ছে ধর্মধ্বজীরা।

একটু থেমে আবার বললেন, তোমার শাশুড়ি বেঁচে রয়েছে। তার চোখের উপরে হতে পারছে না। ধর্মের চেয়েও বড় বাধা বুকের ক্ষত। সে-কালের সেই ক্ষত আজও শুকোয় নি, জীবন থাকতে শুকোবে না। উপরে একটা পর্দা পড়ে আছে, সামান্য নাড়াচাড়া খেলেই ঘা দগ-দগ করে উঠবে। মুখ দিয়ে তোমরা কেউ এ ধরনের কথা উচ্চারণও করবে না।

মা হনুমান বলেছে, কায়দা পেয়ে ফুল্লরা এবারে শোধ নিয়ে নেয়। দাদুর কাছে নালিশ করে: আমার নাম মা 'জোহরা' দিয়ে রেখেছে। ডাকে—ফুল্লরা নয়, জোহরা।

নাতনির নালিশ বীরেশ্বর উড়িয়ে দেন: নামে কি আসে যায়? তুই দিদি আমাদের যে গোলাপ, সেই গোলাপই—যে-নামে খুশি ডাকুকগে।

লীলারই প্রতিবাদ এবার: না বাবা, নামের অনেক দাম। জোহরা নামে ফুল্লরাকে ডাকি আমি—ধর্মে সে মুসলমান হবে কিম্বা মুসলমান পাত্র বিয়ে করবে, সে-সব কিছু নয়। মেয়ে বড় হয়ে পরিপুষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে পছন্দমতো বিয়ে করবে, আমি অন্তত তাতে বাধা দিতে যাব না। বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই, আমি ভাবি অন্য জিনিস। পূর্ব-পাকিস্তানে অহরহ মুসলমানের সঙ্গে মেলামেশা—হিন্দুর সঙ্গে তিলমাত্র ফারাক দেখিনে তো ওঁদের। কেন হতে যাবে—বাঙালি উভয়েই, এক ভাষা, একই রকমের চালচলন। বিভেদপন্থীরা রন্ধ্র খুঁজে খুঁজে মাথা গলাতে চায় তবু। তার মধ্যে একটা হল—নাম। সর্বাংশে এক হলেও নামের মধ্য দিয়ে সন্দেহ আসে, বুঝি-বা পৃথক আমরা!

একটু থেমে আবার বলল, হরেন মুখুজ্জে মশায় ধর্মে খৃস্টান, কিন্তু নামের সঙ্গে মাইকেল এডোয়ার্ড স্টিফেন কোন-কিছুই জোড়া ছিল না। গেঞ্জি গায়ে থেলোহুঁকোয় তামাক-খাওয়া দানবীর পবিত্র মানুষটি দশজনের থেকে কোনো দিক দিয়ে আলাদা-কিছু,

ভুলেও কেউ ভাবতে পারত না। কোন ধর্মেই বিধান নেই মানুষের নামকরণ অমুক ভাষায় করতে হবে। বাংলা ভাষার জন্তে মুসলমান কিশোররা সকলের আগে প্রাণ দিয়েছেন, নামে কেন তাঁরা বাংলা নিচ্ছেন না বুঝতে পারিনে।

ফুল্লরা বলে ওঠে, ঘরব্যাভারি প্রায়ই তো বাংলা নাম। মীরা ছন্দা সন্ধ্যা—আমারই বন্ধু তারা। এমন কি লক্ষ্মী নামেরও একটি। লক্ষ্মীর মা বলেন, এ হল আমার মেয়ে লক্ষ্মী। ঐ নামের এক হিন্দু দেবী আছেন বলে এখন মিষ্টি নামটা বাতিল করে দিতে পারিনে।

লীলা বলে, পোশাকি নামেই বা বাধা কিসের ?

বীরেশ্বর ঘাড় নেড়ে বললেন, কিছু না, কিছু না। ইসলাম ঝড়ের বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, আরবি নামেরও তার সঙ্গে আমদানি। চীনারা কিন্তু এ বাবদে গোঁড়া—চীনা মানুষ ইসলাম গ্রহণের পরেও চীনা নাম আঁকড়ে ধরে রইলেন। সোবিয়েতের মুসলমানরা আরবি নামের পিছনে রুশ-প্রত্যয় জুড়ে মিশাল করে নিয়েছেন। বাংলা দেশে বাংলা-নাম ইতিমধ্যেই ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে, বাইরে বেরুতেও বেশি আর দেরি হবে না।

লীলা বলে, কত দিনে বেরুবে—আমরাই বা ততদিন চুপচাপ থাকি কেন ? ফুল্লরার আর-এক নাম জোহরা। ওঁরা বাংলার দিকে এগোচ্ছেন, আমরাও না-হয় আরবি-ফারসির দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলাম। শত্রু তো ছুতো খুঁজে খুঁজে বেড়ায়—দুই তরফেই যদি এমনটি চলে অমুক জিতল তমুক হারল, কথা উঠতে পারবে না। কত বাঙালি মেয়ের নাম মেরি ডলি কুইনি, তা হলে লায়লা জোহরা নাজমা মিষ্টি মিষ্টি নামগুলোই বা কী দোষ করেছে ? নামে নামে মিলেমিশে যাক—কে হিন্দু কে মুসলমান নামের ভিতর দিয়ে বল্লম উঁচিয়ে না থাকে।

দাদুর দিকে একবার চোখ টিপে ফুল্লরা খিলখিল করে হেসে উঠল।

মেয়ের হাসির মর্ম লীলা বোঝে, এ প্রসঙ্গ আগেও হয়েছে। তবু না বোঝার ভান করে বলে, হাসি কিসের এত?

কলকাতা থেকে ছোটমামার সঙ্গে পাকিস্তানে এসে পড়লে—তখন মা তুমি মানুষ নও, গনগনে একখানা আগুনের চাংড়া। এসেছিলে, কোলের মেয়েটা দাদু-দিদার হেপাজতে ছুঁড়ে দিয়ে বদলা নিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে—রিভলভার-কার্তুজ নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছিলে।

অনেকবারই এসব কথা হয়েছে, তবু লীলা লজ্জা পেয়ে যায়। বলে, হ্যাঁ, কোলের মধ্যে থেকে আগুনের আঁচ পেয়েছিলি বুঝি তুই—সর্বাঙ্গ ঝলসে গিয়েছিল? রিভলবার-কার্তুজ সব পুটপুট করে দেখেছিলি একবছুরে মেয়ে?

আমি আর দেখব কী করে, দাদুর কাছে গল্প শুনে থাকি। দাদু কেন বানিয়ে বলতে যাবেন? যা তোমার মতলব ছিল মা, অর্ধেকখানি দিব্যি হাসিল করেছ। মেয়েকে দিদা-দাদুর হেপাজতে দিয়ে ভারমুক্ত হয়ে গেছ—মুখের একটা 'মা'-ডাক ডাকব, তারও ফুরসত খুঁজে পাইনে। তোমার নতুন ছেলেমেয়েরা ঘিরে থেকে দিনরাত 'মা' 'মা' করছে, আমার একলা গলার ডাক কান অবধি পৌঁছয় কেমন করে?

লীলা মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিল। সামনের উচ্ছৃঙ্খল চুল ক'টি ঠিক করে দিয়ে মৃদু হেসে বলল, তাই যদি বলিস, মতলবের বাকি অর্ধেকও হাসিল করে ফেলেছি। সেটা দেখতে পাস নি কেন, জানিনে।

ফুল্লরা সবিস্ময়ে বলে, বদলা নেওয়া শত্রুর উপরে?

তাই, ঠিক তাই—

সগর্বে লীলা বলে ওঠে: শত্রু একেবারে শেষ হয়ে গেছে। রিভলভার চালাতে হয় নি, রিভলভারে এমন করে নির্মূল হয় না—এক শত্রু মেরে ফেললাম, তার জায়গায় দশ-শত্রু নতুন করে জন্মায়।

রিভলভার কোথায় জং ধরে পড়ে আছে, খবরও রাখিনে। অথচ একটা শত্রু নেই দেখ্ কোনোদিকে—সবাই আপন, সবাই আত্মীয়। এর চেয়ে জোরের বদলা কে কবে নিয়েছে। অমুক অমুক জাতে হিন্দু, অতএব অমুক অমুক জাতে মুসলমান—এমনি করে ভাববার ক'টা মানুষ আছে, বের কর দিকি আজ এত বড় দেশের মধ্যে।

ফুল্লরা ফস করে বলল, খুঁজতে হবে না, ঘরেই তো একটি। আমার দিদা।

ওঁরাই আছেন কয়েকটি, বোধকরি আঙুলে গণা যায়। সয়ে যেতে হবে। শঙ্কার কিছু নেই—মারধোর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যাচ্ছেন না বুড়োমানুষরা। যে ক'টা দিন জীবন আছে, শান্তিতে থাকুন নিজেদের সংস্কার-বিশ্বাস নিয়ে। কিন্তু এই বস্তু ওঁদের কাছ থেকে নিয়ে নেবার মানুষ আর জন্মাচ্ছে না—ওঁরা যেদিন যাবেন, সংস্কার-বিশ্বাসও সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের চিতায় উঠে যাবে।

যশোর শহরে, জানাশোনার মধ্যে, ভাল এক ঘটক আছেন। ঘটকালি করে বিস্তর বিয়েথাওয়া দিয়েছেন তিনি। ফুল্লরার বাপ-মায়ের বিয়েও তাঁর যোজনা। ঘটকমশায় বুড়ো হয়ে পড়েছেন, ঘটকালি বৃত্তিও তেমন আর চালু নেই। কাজটা বহু ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নিজেরাই কাঁধে নিয়ে নেয়। তবে আমাদের ঘটক-মশায়ের খুব একটা অসুবিধা নেই। ছেলে-মেয়ে যাদের একদা যোজনা করে দিয়েছিলেন, তারা এখন প্রবীণ। অভাবে পড়লে ঘটকমশায় তাদের বাড়ি চলে যান। একটা বেলার পরিপাটি ভোজন-ক্রিয়া এবং একটা-দুটো টাকা দক্ষিণা মিলে যায়। পাকিস্তান হবার পর পালানোর হিড়িক পড়ে গেল, ঘটকমশায় নড়লেন না: নতুন জায়গায় কে চেনে আমায়? পেটের ভাত জোটাতে পারব না—অনাহারে মরতে হবে এই অন্তিম বয়সে।

থেকে গেলেন তিনি। বুদ্ধির কাজ করেছিলেন। মুসলমান

ঘরেও ছেলেমেয়ের বিয়ের ঘটকের প্রয়োজন পড়ে। কিছু মক্কেল সেখানেও জুটেছে। কেটে যাচ্ছে কোনরকমে। হিন্দুস্থানে গিয়েই বা কী লাটসাহেব হতেন!

কমলবাসিনী ঘটকমশায়কে নিজের হাতে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন: নাতনি অরক্ষণীয়া। ওর বাপ-মায়ের সম্বন্ধ আপনি করেছিলেন; মেয়েটাকেও এবার পাত্রস্থ করে দিন। পাকিস্তানে সুপাত্র দুর্লভ, কিন্তু আপনার উপর আমাদের বড় ভরসা। এপার-ওপার খুঁজে-পেতে উপযুক্ত পাত্র জুটিয়ে দিন। আপনার পাওনাগণ্ডায় কৃপণতা হবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

বৃদ্ধ হয়েছেন, তবু উঠেপড়ে লাগলেন ঘটকমশায়। এবং অচিরেই ভাল একটি সম্বন্ধ জুটিয়ে ফেললেন। পাত্র চাটার্ড একাউণ্টান্ট—কলকাতায় থাকে, নতুন পাশ করে অন্যের অফিসে বসছে আপাতত। আদিবাস যশোর শহরেই কাছাকাছি এক গ্রামে। ডাকসাইটে বনেদি পরিবার।

পাকিস্তান হবার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বাস তুলে বাড়ি সুদ্ধ তারা কলকাতায় গিয়ে উঠেছে। বিষয়সম্পত্তি ও ঘরবাড়ির বন্দোবস্ত সারা হয় নি, কথাবার্তা চলছে। পাত্রের পিসেমশায় যশোরের পশারওয়ালা উকিল, ওকালতি ছেড়ে তিনি যেতে পারেন নি। তিনিই তাড়াহুড়ো করতে দেন নি, ধীরেসুস্থে হলে মনের মতন দর আদায় করে দিতে পারবেন। পাত্রের বাপের সেই সূত্রে যশোরে আসা-যাওয়া আছে। ঘটকমশায় তক্কেতক্কে ছিলেন, ধরে ফেললেন সেই সময়। পাত্রের বাপ, পিসে এবং জনা-দুই ভদ্রলোক কনে দেখতে বীরেশ্বরের বাড়ি উপস্থিত হলেন।

ফুল্লরাকে দেখে গেলেন তাঁরা। দেখতে সুশ্রী, পালটি ঘর, বীরেশ্বর হাতে ধরে নাতনিকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন—অপছন্দের কিছু নেই। তাহলেও আর একটু আছে—আরও একবার

কষ্ট করতে হবে মা-জননীকে। আজকালকার ছেলেপুলে—আমাদের সেকেলে পছন্দে ওদের মন ভরে না। বন্ধুবান্ধব নিয়ে পাত্র নিজে একদিন আসবে। ছেলের মায়েরও সেই রকম ইচ্ছা। কথার তলে আমরা থাকতে চাইনে—পাসপোর্ট-ভিসা করে এখানেই আসবে তারা, আপনাদের কষ্ট করে ওপার অবধি যেতে বলছিনে।

বেশ তো, বেশ তো—

তটস্থ হয়ে বীরেশ্বর সায় দিলেন। মুরুব্বিদের সঙ্গে সঙ্গে বাস-রাস্তা অবধি গিয়ে বাসে তুলে আপ্যায়িত করে এলেন।

বাড়ি ফিরলে নাতনি ঝঙ্কার দিয়ে পড়ে: কেন তুমি রাজি হয়ে গেলে দাদু? মানা করে চিঠি দাও, আসতে হবে না। আমি যেন জেলের ডালায় মাছ—কেনার আগে খদ্দেরে কানকো তুলে পরখ করছে। একবার এক দলের পরীক্ষায় হবে না—দলের পর দল।

বীরেশ্বর বোঝাচ্ছেন: কথা দিয়ে ফেলেছি, এসে যাক এবারে। এই শেষ, আর নয়। তাতে বিয়ে হোক আর না-ই হোক। সত্যি সত্যি ভাল সম্বন্ধ। পাকিস্তানে পাত্র জোটানো ভারি মুশকিল। মনের মতন একটি পাওয়া গেছে কপালক্রমে—

লীলাও দেখি, শ্বশুরের সঙ্গে একমত। মেয়েকে বলে, মন্দটা কিসে হল? তোকেই শুধু দেখবে না, তুইও তাকে দেখে নিবি। পছন্দ-অপছন্দ তোরও আছে—তার মস্তবড় সুযোগ পেলি। বরই যেন ইন্টারভিউ দিতে আসছে—সেইরকমটা ধরে নে। ফাঁকতালে আমাদেরও দেখা হয়ে যাবে। শতেক হাঙ্গামা করে বাড়ির উপর আসছে, এতে কেন বাগড়া দিবি তুই?

॥ বারো ॥

খাঁ-খাঁ করছে হরিহর খাঁর বাড়ি। হঠাৎ এ কেমন ভাব। হিসাব মিলছে না আর যেন। এতকাল যেমনধারা জেনে বুঝে এসেছি, বিলকুল তার উল্টো। লোকের তোয়াজ পেয়ে পেয়ে এমন হয়েছে, একটি ঘণ্টা সময়ও হরিহর মোসাহেব-শূন্য হয়ে থাকতে পারেন না—সেই মানুষগুলো অকস্মাৎ ঘোরতর কুলীন হয়ে গেছে। রাজীব ত্রিপাঠি পর্যন্ত। আগে ছিল, তাড়িয়ে দিলেও নড়ত না—ডেকে আনবার জন্য তার বাড়ি হরিহর ভৃত্য পাঠিয়েছিলেন। বাড়িতে হাজির থেকেও রাজীব ইচ্ছা করে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, বাড়ি নেই বলে দে খুকী লোকটাকে।

ভৃত্য বলরাম রসিকতা করে বলল, যে আজ্ঞে ত্রিপাঠিমশায়, বাবুকে আমি তাই গিয়ে বলব।

এতেও ভয় পায় না ত্রিপাঠি। বেরিয়ে এসে দুটো খোশামুদি কথা বলে ভৃত্যের মন ভোলাবে, তা নয়। রাগে রাগে ফিরে এসে বলরাম ত্রিপাঠির বৃত্তান্ত মনিবের কাছে ডালপালা জুড়ে সবিস্তারে বলল। হেন ক্ষেত্রে কত হম্বিতম্বি আশা করেছিল হরিহরের মুখে। যথা: ত্রিপাঠিটাকে বাড়ি ঢুকতে দিব্বিনে আর কখনো, দরজা থেকে ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে পথে নামিয়ে দিবি—ইত্যাদি। কিছুই নয়। রাগের বদলে বরঞ্চ হরিহরের শুকনো মুখ অতিরিক্ত রকম বিমর্ষ হল।

একদিন দুই অচেনা ছোকরা এসে হাজির। বলরাম গিয়ে বলল, আহ্নিকে বসেছেন বাবু।

রোয়াকের উপর চেপে বসল দু-জনে। হাত উল্টে ঘড়ি দেখে

নিয়ে চড়া মেজাজে বলল, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে সেরে আসতে বলো।

বলরাম পুরানো লোক, অতিশয় চৌকস। বলল, ভগবানের নাম করা অমন ঘড়ি ধরে চলে নাকি ? ভাব এসে গেল তো আধ-ঘণ্টাতেও কুলোবে না।

ভাব না আসে যেন, ঠেকাতে বলো গে। আমরা ব্যস্ত মানুষ—

আর একজনে বলে, চরম দিন এসে গেলে ভগবান ভাবতে তখন সিকি-মিনিটও তো মঞ্জুর করবে না।

হরিহর আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। অনতিপরে আবির্ভূত হলেন : কী বলছেন ?

ধান-চাল যা আছে ছাড়ুন। আপনারা পেট মোটা করবেন, মানুষ না খেয়ে মরবে—সেটি হচ্ছে না এবারে।

অপর জন বলল, উপোস করবে লোকে, আর 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' রামধুন গাইবে—সে দিন পালটে গেছে। হাতিয়ার তুলে নেবে হাতে।

হরিহরের কাঁপন এসে গেছে। চেপেচুপে তবু ধীরকণ্ঠে বললেন, কোথায় ধান ?

সব মুখে ওই এক রা। ধান কোথা ? সরকার মজুতদার সবাই। কিন্তু মানুষে ঘাস খায় না—খবরাখবর রাখে। দরকার মতো দেখিয়ে দেবে, ধান কোথায় আছে। সরকার এই সব বলে দায়িত্ব এড়ায়, খুশি মতন রেশন কমায়। যেন পেটের ক্ষিধের হ্রাস-বৃদ্ধি ওদেরই মরজি মতন ঘটবে।

অপর জন তিক্তকণ্ঠে বলল, আঠারো বছরের রাজত্বে মজুত টাকাগুলো নয়-ছয় করে দেশকে ভিখারির বেহদ্দ বানিয়ে এখন ঐসব ছেঁদো-কথা কানে নিতে যাবে কেন মানুষে ! থাকে না কেন ধান—কারা দায়ী ? সাধারণ মানুষ নিশ্চয় নয়।

আগের ছেলেটা করজোড় করে বলে, ধান-চাল যা আছে,

আপোসে বের করে দিন। চোখ রেখেছি আমরা, ব্ল্যাকে বিক্রির আশা ছেড়ে দিন। নেতামশায় কথা দিয়ে নিজে আবার চোক গিললেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি আমরাই রাখব বলে সঙ্কল্প নিয়েছি।

অপর ছেলেটা বলল, সে নেতা জওহরলাল। কালোবাজারি পেলেই নাকি ল্যাম্প-পোস্টে ঝোলাবেন। তিনি পারেন নি—কলকাতার বড় বড় রাস্তায় আমরাই মজবুত দেখে ল্যাম্প-পোস্ট সব বাছাই করে এসেছি।

হরিহর শশব্যস্তে বলেন, তা করুন গে। ভালই তো। কিন্তু আমায় কেন ওসব শোনাতে এসেছেন? আমার তো হাটুরে বাড়ি—যে কেউ এসে যথা ইচ্ছা ঢুকে যান, খুঁজে-পেতে দেখুন। পরের মুখে ঝাল খাবেন কেন? ধান তো টাকাপয়সা নয় যে কলসি ভরে মাটির নিচে পুঁতে রেখেছি।

পুঁতে রেখেছেন কিম্বা কী করেছেন আপনি জানেন। তবে পাচার করেন নি, এটা ঠিক। খুঁজে-পেতে সহজে কক্ষনো পাবো না—তেমন কাঁচা লোক আপনি নন। তবে সদয় হয়ে আপনাদেরই কেউ যদি হুলুকসন্ধান বাতলে দেন, সদলবলে আসব সেদিন। হিসেবে যা পাওয়া যাচ্ছে, ধান পর্বতপ্রমাণ রয়েছে।

ইত্যাদি শাসিয়ে সে দুটি আপাতত বিদায় হয়ে গেল। কথাগুলো হরিহর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবছেন। আপন লোকের মধ্যে কেউ ফাঁস করে দেবে, সেই ওদের প্রত্যাশা। একজন আপন তো রাজীব ত্রিপাঠি। সুদিনের অতিশয় আপন। এখন কি রকম, সঠিক জানা নেই।

হরিহর নিজেই অতএব ত্রিপাঠির বাড়ি চললেন। টিনের ঘর—দরজা বন্ধ, জানলা বন্ধ। লখিন্দরের লোহার বাসর করে রেখেছে—সাপ কিলবিল করছে যেন বাতাসের সঙ্গে, ঢুকে পড়তে না পারে।

দরজায় ঘা দিলেন। শব্দসাড়া নেই। ডাকছেন হরিহর: সাড়া দাও ত্রিপাঠি। আমি খাঁ-বাবু, নিজে তোমার কাছে এসেছি। বলরামকে সেদিন বলেছিলে, বাড়ি নেই ত্রিপাঠি। আজকে আছ কি নেই, বলবে তো সেটা! রা কাড়ছ না কেন?

মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। যুক্তকরে ত্রিপাঠি বলে, ভিতরে ঢুকে পড়ুন হুজুর। পাড়াটা ভাল নয়।

এবং হরিহরকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরজায় খিল আঁটল। বলে, পাড়া ধরেই বা বলি কেন, অঞ্চল জুড়ে এই গতিক। খবরের-কাগজে দেখছি, সন্দেহ হলেই মারধোর। পশ্চিমবঙ্গের কোনখানেই প্রায় বাদ নেই।

হরিহরের কণ্ঠে হাহাকার বেজে উঠল: পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে ত্রিপাঠি। এদ্দিন যেভাবে চলে এসেছে, এখন একেবারে উল্টো। টাকাকড়ির সঙ্গে মানসম্ভ্রম জড়ানো ছিল, লোকে কত খাতির করত। এখন ঘেন্না করে—তাদেরই হকের ধন মেরে বড় হয়েছি, এমনিতরো ভাব। ধর্মপথে আইন মোতাবেক প্রতিটি পয়সার রোজগার, বাপান্ত-দিব্যি করে বললেও মানবে না।

তক্তাপোষে মাদুর পাতা ছিল। হাত দিয়ে একটু ঝেড়েঝুড়ে তার উপরে ধোপদুরস্ত একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে ত্রিপাঠি আপ্যায়ন করে: বসুন হুজুর—

ত্রিপাঠি নতুন সংবাদ দিল, তার মতো সামান্য লোকের কাছে এসেও ধমকধামক দিয়ে গেছে: বড়লোকের মোসাহেবি করে আর মুনাফা হবে না। ওরা নিপাত যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও। খাঁ-বাড়ির কোথায় কী আছে দেখিয়ে দেবে চলো, রে-রে করে দলবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়িগে।

রাজীব ত্রিপাঠি বলে, রে-রে করে পড়বে শুনেই তো হুজুর বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরে গেল। বউ ছেলেপুলে মায় গরু-বাছুর ছাগল-হাঁস অবধি পাচার হয়ে গেছে। নিজে পাহারাদার হয়ে ভিটের

উপর আছি, নয় তো ক্ষুদকুড়ো যেটুকু আর পড়ে আছে, লয় পেয়ে যাবে। তবে পা বাড়িয়ে আছি, বেগতিক বুঝলেই টুক করে সরে পড়ব।

হরিহর বললেন, সরতে তো আমাকেও হবে—কোথায় যাই বলো দিকি ?

পোড়া পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে নয়। আগুন সবখানে। কোথাও বাইরে দাউ-দাউ করে জ্বলছে, কোথাও মনে মনে জ্বলছে। দপ করে ফুটে উঠলেই হল।

হরিহর ব্যাকুল হয়ে বললেন, উপায় কী তবে ?

ত্রিপাঠি বলে, উপায় পাকিস্তান। ওর চেয়ে ভাল জায়গা হয় না। দেশ-ভাগের সময় কর্তারা কত দূর তলিয়ে ভেবেছিলেন, দিনে দিনে তা মালুম হচ্ছে। এপারের হামলা বর্ডার পার হয়ে পাকিস্তানে পৌঁছুতে পারবে না, অথচ জায়গাটা কাছাকাছিও বটে। আমার শ্বশুরবাড়ি কপালক্রমে ঐ ঘেরের ভিতরে পড়ে গেছে। সে-বাড়ির সবাই পার হয়ে হিন্দুস্থানে এসেছে, ভিটেয় পিদদিম দিতে বুড়ো শাশুড়ি রয়ে গেছেন। ঠাকরুনকে বড্ড কাজে লেগে গেল—বউ পাগল হয়ে উঠল মাকে দেখবার জন্য, ছেলেমেয়েগুলোও নেচে উঠল। লটবহর-সুদ্ধ তাদের পাকিস্তানের শ্বশুরবাড়ি রেখে এলাম।

হরিহর বললেন, কিন্তু বিনি-পাশপোর্টে গিয়ে ওঠা—তারপরে যদি ধরা পড়ে যাই ? ইণ্ডিয়ার মানুষ বেমক্কা চলে গেছে—ওদের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ তো আমাদের—

কে বলেছে ?

হাত ঘুরিয়ে ত্রিপাঠি একেবারে উড়িয়ে দিল : বিবাদ-বিসম্বাদের কথা সরকারি চাঁইদের কাছেই শুনবেন, লোকে কিছু জানে না। ঐসব বলেই সরকারি মানুষে ভয় দেখায় : ওপারে বাঘ-সিংহি ঘুরে বেড়াচ্ছে—খবরদার, উঁকিঝুঁকি দিতে যেও না। বর্ডারের এত কড়াকড়ি করেও তবু আলাদা রাখা যাচ্ছে না। সর্ব রকমে চেষ্টা

দেখছে, একেবারে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। কিন্তু পারল না। ক'দিন শাশুড়ির কাছে থেকে চাক্ষুষ দেখে এসেছি হুজুর। পাড়া-গাঁয়ের মানুষ পুরানো-পড়শি—তারা বর্তে গিয়েছে যেন এদের পেয়ে। শাশুড়িঠাকরুনের মেয়ে-নাতিনাতনি তো তাদেরই বাড়ির মেয়ে-নাতিনাতনি। এমনি খাতিরযত্ন। তারা কেউ ধরাতে যাবে না। মফস্বল থানায় বাঙালি পুলিশ-দারোগা—তারাও না। বিপদের আঁচ পেলে তারাই বরঞ্চ প্রাণপণ চেষ্টায় সামাল দেবে।

হরিহর অতখানি অবশ্য বিশ্বাস করেন না। শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসে রাজীব পাকিস্তান সম্বন্ধে গদগদ। তবু বড় বিপদের মধ্যে সমাধানটা উড়িয়ে দিতে পারেন না একেবারে। ভাবছেন।

ত্রিপাঠি ফিক-ফিক করে হাসে। বলল, পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হয়ে এক দিক দিয়ে বড্ড সুবিধা। খুন-রাহাজানি করে লোকে আখছার বর্ডার পেরোচ্ছে। খাও কলা—ওপারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা কলা দেখায়। আবার ওপারে যখন গোলমাল লাগে, সুড়ুত করে এপারে চলে এলো। সেই জন্যে বলি হুজুর, ওপারেও একপ্রস্থ আস্তানা বানিয়ে রাখুন। রাজি হন তো শাশুড়িঠাকরুনকে বলি। ঘরে ঘরে তালা ঝুলিয়ে একটা চালাঘরে মাসি-পিশি বা মামা-জেঠা একটিকে স্থাপনা করে হিন্দুস্থানে এসে রয়েছে, এ রকম অনেক পাবেন। তেমনি কোন-একজনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে লেনদেন হতে পারে। কোন রকম ঝামেলা পোহাতে হবে না—সেই মাসি বা পিসি সুদ্ধ ধরেই বন্দোবস্ত। তখন তিনি আবার আপনার মাসি হয়ে রইলেন।

হরিহর বললেন, শিরে-সংক্রান্তি—ওসব ভাবনাচিন্তা এখনকার নয়। তোমার হল গরু-জরু সামাল নিয়ে সমস্যা—ভগবান সে বাবদে একটি শাশুড়িও মজুত রেখেছেন পাকিস্তানে। আমার বেলা অত সহজ নয়। অন্য সমস্ত না-হয় হল—

বলতে বলতে থেমে গেলেন হরিহর। বন্ধ ঘরের মধ্যেও

অকারণে এদিক-ওদিক দেখে নেন। ফিসফিসিয়ে বললেন, সেই যে নাম-করতে-মানা—তাই নিয়েই তো বিষম মুশকিল ত্রিপাঠি।

ত্রিপাঠি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়েঃ খবরদার, খবরদার—ওসব তালে কদাপি যাবেন না হুজুর। ধানচালের জন্য গুলি খেয়ে মানুষজন হন্যে হয়ে রয়েছে, ধর্ম-বুদ্ধি বিচার-বিবেচনা কিছু নেই। আপনার বাড়ির চৌদিকে এমনিই তো গন্ধে গন্ধে বেড়ায়—হাতে-নাতে পেয়ে গেলে রক্ষে রাখবে না। তুলসী মাড়োয়াড়ির গুদামে পেয়েছিল সামান্য পাঁচ-সাত বস্তা চাল। বয়সে বুড়ো, ধার্মিক মানুষ। দান-ধ্যানও যথেষ্ট। রাগের মাথায় কোন বিচারই রইল না—বুড়োকে চিত করে ফেলে পনের-বিশটা হাতে মুঠো মুঠো চাল মুখে ঠাসতে লাগলঃ খা, একলাই খা তুই—দেশের মানুষ না খেয়ে মরুক। কাঁচা-চাল গলায় বেঁধে অক্কা পেয়ে গেল বুড়ো। এ তো সেদিনের ঘটনা। হীরে-মুক্তো পাচার করুন, চাল একটি দানাও সরাতে যাবেন না জায়গা থেকে।

তবে কী হবে?

বলব?

প্রশ্ন করে ত্রিপাঠি হরিহরের মুখে তাকিয়ে থাকে।

বলো না। পরামর্শ নিতেই তো পায়ে হেঁটে চলে এসেছি। তুমি ছাড়া কার কাছে এসব কথা বলা যায়?

দান করুন। মাতব্বর ক-জনাকে ডেকে সোজাসুজি বলে দিন, অমুকখানে আমার ধান মজুত আছে। মানুষের কষ্ট দেখে মন কেঁদেছে। সমস্ত ধান তোমরা নিজেদের মধ্যে বিলি-বাঁটোয়ারা করে নাও গে। ধারে-কাছে যাবো না আমি। ধন্য-ধন্য পড়ে যাবে, দেখবেন। ধান এদ্দিন লুকিয়ে রেখেছিলেন, সে-দোষ চাপা পড়ে যাবে। কাগজে নাম উঠবে। দেখবেন কী কাণ্ড!

হরিহর চুপ করে থাকেন, প্রস্তাবটা মনে সাড়া দেয় না। পরের

জিনিস বলেই সদাব্রতের দরাজ উপদেশ। নিজের হলে ভিন্ন উপায় ভাবত। ভাবতে লাগলেন হরিহর।

ধান দান করে দিতে বলল। গোপন মজুতের দোষ কেটে গিয়ে দাতাকর্ণ বলে কাগজে নাম বেরুবে নাকি—তদ্বির করলে ছবিও বেরুতে পারে। হরিহর কানে নেন না। নিজে তো জরু-গরু, বাটি-ঘটি মায় কাঁথাখানা কম্বলখানা অবধি পাকিস্তানে পাচার করে দিয়েছ, দিয়ে ন্যাংটেশ্বর শিব হয়ে বসেছ—মুখে তাই লম্বা লম্বা জবান!

ঘরের মধ্যেও এই ব্যাপার। স্ত্রী শান্তিলতা বাতে শয্যাশায়ী। বাতব্যাধি, আহা, মুখে ধরে না রে! পা দুটো গিয়ে মুখ দুনো-তেদুনো খর হয়েছে। হরিহরকে সামনে পেলেই ঝঙ্কার ছাড়েঃ সকলের হিংসা আমাদের উপর, ছুটকো ছোঁড়ারা নিত্যিদিন শাসিয়ে যাচ্ছে। তেমন-তেমন হলে তোমরা বেপাত্তা হবে, আমি যে উঠে দাঁড়াতেও পারব না। ধান এখন বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষ বাড়িঘরে রেখো না—শিগগির সরাও, শিগগির।

বিরক্ত হরিহর বলেন, আগে তো তোমায় সরাই। আর কি করি না করি, ভেবে দেখব।

হর্ষনাথ-উকিলের সেরেস্তায় ছুটলেন হরিহর। দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্ভাবনা—এস-ডি-ও'কে বুঝিয়ে বাড়ির দরজায় পুলিশের বন্দোবস্ত করা যায় কিনা।

এমন যে প্রাণাধিক বন্ধু হর্ষ-উকিল—ভাবভঙ্গি তাঁর একেবারে বদলেছে। হরিহরকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ঢাউশ আইনের বই খুলে নিলেন তিনি। নাকি কোন শাঁসালো মক্কেলের ঘোরতর মামলা।

এখন নয়, এখন নয়, পরে এক সময় শোনা যাবে।

ঘাড় হেঁট করে উকিল-আইনে নিবিষ্ট হয়ে গেলেন।

সেখান থেকে সরাসরি শ্রীমন্ত-ডাক্তারের ডিস্পেনসারিতে। ভণিতা নয়, মুখ শুকনো করে গোড়াতেই স্ত্রীর কথা তুললেন : পা আরও ফুলেছে, নড়ানো সরানো যায় না। পক্ষাঘাতে না দাঁড়ায়। আহার-নিদ্রা গিয়ে দিনরাত চিল্লাচ্ছে। চলুন একবার।

ডাক্তার হয়ে বিপদ হয়েছে, পুরানো রোগি ঝেড়ে ফেলা যায় না। লক্ষণ শুনে নিয়ে শ্রীমন্ত ওখান থেকেই ব্যবস্থা দিচ্ছিলেন, হরিহর নাছোড়বান্দা হয়ে বাড়ি নিয়ে চললেন। শান্তিলতাকে শেখানো ছিল : রোয়াকে উঠেই গলা-খাঁকারি দেবো, মোক্ষম চেঁচানি জুড়ে দিও তুমি অমনি।

শ্রীমন্তের গা টিপে হরিহর বলেন, শুনতে পাচ্ছেন ?

শ্রীমন্ত বললেন, ডাক্তার মানুষ—হরবখত এ রকম শুনে থাকি। টানাটানি করে কেন আমায় নিয়ে এলেন বুঝিনে। ব্যস্ত হবার কি আছে ? যাপ্য ব্যাধি—দু-দশ দিনে মুছে নেবার নয়।

বেজার মুখে বলতে লাগলেন, এমন করে ডাকাডাকি করবেন না খাঁ-বাবু। ধান গাপ করে রেখেছেন, আপনাকে লোকে বদনাম দেয়। আমার আসা-যাওয়ায় সন্দেহ করবে, চিকিচ্ছে-টিকিচ্ছে মিছে কথা—শলাপরামর্শ হচ্ছে দু'জনার মধ্যে। হাজার-টাকা লাখ-টাকা আপনার হাতের ময়লা—আপনি সামলে নিতে পারবেন, মারা পড়ব আমিই।

সাফ মাথা শ্রীমন্ত-ডাক্তারের—হরিহরের পরামর্শদাতা শুভানুধ্যায়ী সুহৃৎ। বাড়ি তৈরির সময় পাতালের ভল্ট তাঁরই বুদ্ধিতে বানানো। সেই ভল্ট এবারে কী কৌশলে খালি করা যায়—কিন্তু গতিক বুঝে কথাটা তোলারই সাহস হল না। পা রেখে দাঁড়ানোর মাটি পাওয়া যাচ্ছে না, নিশ্বাসের বাতাসও যেন অপ্রতুল। আপন-হাত জগন্নাথ—যা করতে হবে সম্পূর্ণ নিজেকেই।

হরিহর বললেন, ভাল করে দেখেশুনে প্রেস্কৃপশন করে দিন। সেইজন্য কল দিয়েছি। ওষুধ-মালিশ সব কিনে দিচ্ছি—ভাইয়ের

বাড়ি চলে যাক। বড় গৃহস্থ তারা, বিস্তর লোকজন। সেবাযত্নেরও ভাল ব্যবস্থা হবে। ছেলেপুলে নিয়ে থেকে আসুক দিনকতক।

ডাক্তারকে বিদায় করে দিয়ে হরিহর শান্তিলতাকে বললেন, ঝড়ের মুখ থেকে সরে পড়ো এগুিগেণ্ডি নিয়ে। তোমরা ভাল থাকগে—আমি একলা রইলাম আমার ধান আর আমার কপাল নিয়ে। লাভে কাজ নেই, অর্ধেক দাম পেলেও ছেড়ে দিই। একবার ঝাড়া-হাতপা হতে পারলে চোতা শহরের মুখে ঝাড়ু মেরে আমিও শ্বশুরবাড়ির দেশে আবাদ-অঞ্চলে ঘরবাড়ি বানাবো। ইনক্লাব পথ খুঁজে পাবে না সেই অতদূর।

॥ তেরো ॥

কনে দেখতে চারজন এসেছে। ফুল্লরা এসে দাঁড়াল। নমস্কার করে সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল একবার। যে চেয়ারটা খালি ছিল, তার উপরে বসে পড়ল।

পাত্র এবং বন্ধুরা হকচকিয়ে গেছে। গাঁয়ের মেয়ের এতখানি সপ্রতিভতা ভাবতে পারে নি।

মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে রইল ফুল্লরা। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না?

চারের মধ্যে এক ছোকরার ছাঁটাই-করা মনোরম গোঁফ ও দাড়ি, গায়ে ছাপা-সিল্কের বুশসার্ট। কথাবার্তা যত-কিছু সে-ই বলছে। তাকে লক্ষ্য করে ফুল্লরা বলল, কিছু প্রশ্ন থাকে তো বলুন।

ছোকরা বলল, শিক্ষা-দীক্ষার ভার যিনি নিয়েছিলেন, তাঁর খ্যাতি দেশ-জোড়া। আমিও কিছুদিন তাঁর ছাত্র ছিলাম। বিস্তর গাধাকে উনি ঘোড়া বানিয়ে দিয়েছেন।

মুখ টিপে হেসে ফুল্লরা বক্তাকে তাকিয়ে দেখল। ছোকরা থতমত খেয়ে যায়। গাধাকে ঘোড়া বানানোর কথা বলল—তার চেহারার ভিতর পূর্বতন গাধাকে খোঁজে নাকি মেয়েটা?

কথা শেষ করে দিল ছোকরা: প্রশ্ন আবার কী থাকবে?

বোবা কিনা, অন্তত সেই পরীক্ষার জন্যেও তো জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়।

ছোকরা হেসে বলে, কথা বলে আপনি নিজে থেকেই তো সন্দেহভঞ্জন করে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলে আপনি চলে যেতে পারেন।

ফুল্লরা উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তকাল ইতস্তত করে বলে, সুব্রতবাবুটি কে আপনাদের মধ্যে ?

পাত্রের নাম ধরে পাত্রী জিজ্ঞাসা করে—হতভম্ব হয়ে গেছে সকলে। ছাঁটা-গোঁফদাড়ি সেই ছোকরাই বলে ওঠে, উঠে দাঁড়া সুব্রত। তোকে দেখতে চাইছেন।

ফুল্লরা সহজভাবে বলে, কৌতূহল আসে কিনা বলুন। দয়া করে এত দূর যখন পদধূলি দিয়েছেন, ওটা কেন বাকি থাকে। চারজনের মধ্যে তিনি কে, জিজ্ঞাসা করে নিলাম। দোষের হল নাকি ?

না, দোষের কী আর। বেশ হল, উভয়পক্ষেরই চাক্ষুষ দেখা হয়ে গেল।

ফুল্লরা চলে যাচ্ছে, মুখফোঁড় ছোকরা আবার বলে, পছন্দ হল কিনা, বলে যান।

ঘাড় ফিরিয়ে ফুল্লরা বলে, বলি তাই, আর বেহায়া বলে নিন্দে রটে যাক। তা ছাড়া ব্যাপারটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ আপনাদের রায়ের উপরে। আপনাদের পক্ষই সর্বেসর্বা। প্রশ্নটা আমাদেরই বরঞ্চ করার কথা।

ছোকরা বলে, আমাদের রায় দিতে এক মুহূর্তও সময় লাগবে না। সুব্রতর পছন্দ—ঘোরতর পছন্দ। পরমানন্দে সে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আমাদের সর্ববাদীসম্মত অভিমত এই। এইবার শুনব আপনার নিজের কথা।

জবাব না দিয়ে ফুল্লরা যুক্তকরে নমস্কার করল।

হাসিমুখে বলে, আমি যাই। আমি গেলে দাদু এসে বসবেন। দাদুকে আমি মানা করেছিলাম : তুমি থাকলে ওঁদের অসুবিধা হবে, মন খুলে জেরা করতে পারবেন না। তা জেরা তো একেবারেই করলেন না। দাদু উঠোনে পায়চারি করছেন। নাতনি বেচারি না-জানি কত নাকানি-চোবানি খাচ্ছে—এই সমস্ত ভাবছেন আর কি !

প্রসন্ন ভঙ্গিতে ফুল্লরা চলে গেল।

যেতেই উচ্ছ্বসিত কলরব উঠল : এমনই তো চাই। জবড়জং শাড়ি-গয়নার পুঁটলি নিয়ে আজকের দিনে ঘর করা যায় না।

পাত্র শুভ্রব্রত মুখ টিপে হেসে বলল, পুঁটলির একটা সুবিধা যেখানে যেমন নিয়ে রাখো, চুপচাপ তেমনিভাবে থেকে যাবে। তর্কাতর্কি করবে না, বিদ্রোহ করবে না। মতামতের বালাই নেই। পাকা উকিল-ব্যারিস্টারের মতন এ-মেয়ে আমাদের পেটের ভিতরের সবগুলো কথা শুনে নিয়ে চলে গেল, নিজের মতামত একবর্ণ বলল না।

আর বলবে কেমন করে? হাত ধরে টেনে বলবে নাকি, চলো এক্ষুনি ছাতনাতলায় গিয়ে বসিগে?

উভয়পক্ষেরই পছন্দ, মোটামুটি বুঝতে পারা গেল। এবং গয়না বরসজ্জা ও পণের টাকার দর-কষাকষি আজকাল বড় হয় না। তবে আর কি, দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলা যাক। দু-হাত এক করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। শুভকর্ম তাড়াতাড়ি সমাধা হওয়ার দরকার— সেকেলে গিন্নিমানুষ কমলবাসিনী মেয়ে সেয়ানা বলে বলে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন।

শুভকর্ম কোনখানে সম্পন্ন হবে, বরের বাবা প্রশ্ন তুললেন। নিরর্থক প্রশ্ন—পুরুষ-পুরুষান্তর ক্রমে যেমনধারা বিধি। সারা-জন্ম নিয়ে ব্যাপার—লক্ষণ-অলক্ষণ আছে, বাড়ির মানসম্ভ্রমও জড়িত আছে। পুরানো পদ্ধতির এক চুল এদিক-ওদিক হবে না— হতে দেবেন না কমলবাসিনী যতদিন বর্তমান আছেন।

বীরেশ্বর বললেন, আমার বাড়িতে পদধূলি পড়বে আপনাদের সকলের। বাজি-বাজনা করে ষোল-বেহারার পালকি হুমদাম আওয়াজ তুলে বর নিয়ে আসবে। শহুরে এক রাত্রির বিয়ে নয়— টিমটিমে আলোয় দশ-পনেরোটা মন্তোর পড়ে পুরুত বলে দিলেন

হয়ে গেল বিয়ে। রাত পোহাতে না-পোহাতে শোনা গেল, বরকনে বিদেয় হয়ে গেছে। বউভাতের আগেই কনে ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বেঁধে সংসারধর্মে লেগে গেল। আমাদের গাঁ-গ্রামের বিয়ের এলাহি ব্যাপার। সাঁজো-বিয়ে হয়ে গেল রাত্রিবেলা, পরের দুপুরে বাসি-বিয়ে। দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্—এসো-জন বসো-জন খাচ্ছে বিয়েবাড়িতে মাসখানেক ধরে। নিমন্ত্রিত-অভ্যাগতজনের থাকবার জন্য অস্থায়ী চালাই বা তোলা হয়েছে কত। গ্রামের কোনো বাড়ি উনুনে হাঁড়ি চাপছে না বিয়ের আগে-পিছে হপ্তা-খানেক ধরে—

বর্ণনার মাঝখানে সুব্রতর বাপ বলে উঠলেন, এই নিত্যি-আকালের দিনে শুনতে খাসা লাগছে। ছিল বটে এমনি দিনকাল।

বীরেশ্বর বলেন, একমাত্র এই নাতনি। বাপ নেই। সবখানি না পেরে উঠি—ওর ঠাকুরমার বড় ইচ্ছে, খানিকটা অন্তত করতেই হবে আমায়।

বরের বাপ বললেন, আমার তরফেও ঠিক সেই সমস্যা। ছেলের বিয়ে প্রথম এই আমার। পাঁচ মেয়ের পর ছেলে—আত্মীয়জনেরা মুকিয়ে আছে। বিস্তর বাদসাদ দিয়েও তো বরযাত্রী শ'য়ের নিচে নামানো যাবে না।

বীরেশ্বর বললেন, বাদ দিতেই বা কেন যাবেন? কুটুম্ব-আত্মীয় যিনি আসতে চান সবাইকে আনবেন। এক-শ দেড়-শ কেন, বেশি হলেও অসুবিধে নেই। লোক বেশি তো চাই-ই, লোক জমজমাট না হলে আবার বিয়ে কিসের? ভাববেন না আপনি। বরযাত্রী যেমন ইচ্ছা আনবেন। সংখ্যাটা মোটামুটি আগে একটু জানিয়ে দেবেন, আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে পাতে পাতে চাট্টি ডাল-ভাত দেওয়া কঠিন হবে না।

বরের বাপ বললেন, ডাল-ভাত নয় পোলাও-কালিয়া, সেটা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু মুখের কথা বলে দিলেন, তাতেই তো লোক এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে না। যে রকম অবস্থা, তাতে

একলা বর এনে হাজির করতেই আমার নাভিশ্বাস উঠে যাবে। হাজারো হয়রানি ভিসা-পাশপোর্ট পেতে—বিশগণ্ডা হাত মুঠো মেলে রয়েছে, ঘুষ দিয়ে মুঠোগুলো এঁটে এঁটে দিন। না মশায়, বাড়ির মধ্যে বড়ছেলে—একলা বর এসে বিয়ে করে চুপিসারে চলে যাবে, সে জিনিস হতে পারবে না।

বীরেশ্বর জোর দিয়ে বললেন, আমাদের তরফেও ঠিক এই কথা। আগেই বলে দিয়েছি। কী হতে পারে, ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করুন এবারে।

বিবেচনার কী আছে ? দিন স্থির করে আপনারা কলকাতায় চলে আসুন।

বীরেশ্বর বললেন, সে-ও তো একরকম শুকো-মেয়ে নিয়ে হাজির করা। বিয়ের আগে পাত্রপক্ষের জায়গায় মেয়ে নিয়ে তোলা—'তোলা-বিয়ে' তাকে বলে। খুবই অপমানের ব্যাপার। তেমন ক্ষেত্রে আমার আত্মীয়স্বজনরাও বিয়েয় যোগ দিতে পারবেন না।

কেন, পার হয়ে কতই তো হিন্দুস্থানে গিয়ে আছেন। বেশি তো তাঁরাই। আত্মীয়ের অভাব হবে কিসে ?

ঘাড় নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বীরেশ্বর বললেন, অনেক তবু রয়ে গেছেন এপারে। দুঃখকষ্ট উপেক্ষা করে পিতৃপুরুষের ভিটার উপর আছেন। পাকিস্তানে রয়ে গেছেন বলেই সমাজ-সামাজিকতার ব্যাপারে বাদ পড়বেন, এ জিনিস হতে দিতে পারিনে। একত্রে আমরা অহরহ হাজারো রকম দুশ্চিন্তা বয়ে বেড়াই—আমোদ-উৎসবের বেলা সেই মানুষদের ছেড়ে টুক করে ওপারে উঠতে পারিনে।

পাত্রের বাপ অপ্রসন্ন মুখে বললেন, সমস্যা শুনে গেলাম—বাড়ি গিয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখিগে। এখন অকাল চলছে—শুভকর্ম ফাল্গুন কি বৈশাখের আগে হচ্ছে না। দেখা যাক ভেবেচিন্তে।

পছন্দের মেয়ে। নাতনিকে দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারে বীরেশ্বর

কৃপণতা করবেন না, সে-ও জানা। ইত্যাদি বিবেচনা করে বরের বাপ সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিতে পারলেন না। লম্বা সময় হাতে নিয়ে তিনি বাড়ি ফেরত চললেন।

ফুল্লরা বীরেশ্বরকে বলল, বেশ শুনিয়ে দিয়েছ। দাদু তুমি এমন খাসা!

বীরেশ্বর বলেন, কি জানি, আমি আরও কত কী ভাবছিলাম। বর পছন্দ হয়ে গেছে, রকমারি ফ্যাকড়া তুলে মিলনের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি আমি—চটেমটে তুই কথাই বলবিনে আমার সঙ্গে!

ফুল্লরা অবহেলা ভরে বলে, পছন্দর জন্যে কি? কানা-খোঁড়া গলাকাটা না হলেই হল। বলে দিচ্ছি দাদু, পুরোপুরি-আস্ত যে-কোন পাত্র হাজির কোরো—সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ করে ফেলব। আমার অত বায়নাক্কা নেই। তা-ই বা কেন—তুমি একলাই পছন্দ কোরো, তোমার পছন্দে আমার পছন্দ। তুমি হুকুম করবে, মাথায় ঘোমটা তুলে সুড়সুড় করে অমনি ছাতনাতলায় গিয়ে বসব। ভালমন্দ একটি কথাও বলতে যাব না। পাত্রপক্ষের কোর্ট ষোল-আনা বজায় থাকবে, মেয়ের পক্ষ বলে আমাদের কথার দাম হবে না—এ জিনিস কক্ষনো হবে না। ঠিক করেছে তুমি দাদু, বড্ড বাঁচান বাঁচিয়ে দিয়েছ। নইলে তুমি ঠিকঠাক করে ফেলেছ, রওনা হবার মুখে কনেই হয়তো বেঁকে বসল। ঝাঁকা-মুটের মতন মেয়ে ঘাড়ে নিয়ে হাজির হবে, তাতে আমাদের অপমান।

ঠাকুরদা-নাতনিতে চুপিসারে কথাবার্তা।

কমলবাসিনী ইতিমধ্যে ঘটকমশায়ের কাছে সবিস্তারে শুনেছেন। শুনে তো মারমূর্তি বীরেশ্বরের উপর: নিজেদের উদ্যোগে কিছু তো হয় না—এত চেষ্টায় ঘটকমশায়কে দিয়ে ভাল সম্বন্ধ জোটানো গেল, দিলে সেটা ভেস্তে। থুবড়ো মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে লোকে বর্তে যায়, ঘটা হতে পারবে না বলে উনি এখন মোচড় দিতে গেলেন।

বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠাণ্ডা করেন বীরেশ্বর: ভেস্তে গেল কিসে? বাড়িতে শলাপরামর্শ না করে উনি জবাব দিতে পারলেন না। গিয়েই চিঠি দেবেন। তার পরে আমরাও লিখতে পারব। কথাবার্তার সবে তো শুরু—লাখ-কথা ছাড়া বিয়ে হয় না। ডাকে ছেড়েছেন চিঠি এদ্দিনে, ছ-পাঁচ দিনের মধ্যে এসে যাবে। পাকিস্তান থেকে চিঠি এসে পৌঁছানো চাট্টিখানি কথা নয়।

এক মাস যায় দু মাস যায়, এলো না কোন চিঠি সুব্রতর বাপের কাছ থেকে।

কমলবাসিনী অধীর হয়ে উঠেছেন: চিঠি লিখতে তাদের বয়ে গেছে। ওসব ছেলে পড়তে পায় না। এত ফৈজত করে বাড়ি অবধি এসে উঠল, সে মাণিক হেলায় হারালে। ওসব জানিনে, এ বছরের মধ্যে নাতনিকে সাত-পাক আমি ঘোরাবই। এ ছেলে না হয়, অন্য ছেলে।

তারই পরে লড়াই বাঁধল পাকিস্তানে আর হিন্দুস্থানে। হায়রে হায়, এক দেশ কেটে দু-খানা করে সুখ নেই, খবরের-কাগজ ও রেডিও'র বেধড়ক গালিগালাজেও যথেষ্ট হল না—রণমত্ত দুই শত্রুদেশ। এই না হলে এত চক্রান্তের ভাগাভাগির ফলটা কী? হুবহু একই রকমের মানুষজন ভুঁইক্ষেত সাজপোশাক কথাবার্তা—কোন্ দিন হয়তো শোনা যাবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভাব জমিয়ে একেবারে এক-দিল হয়ে গেছে। হয়ে আসছেও তাই—বিষম তাড়াতাড়ি। অতএব আর দেরি নয়—ডাঙায় ছুটাও ট্যাঙ্ক, আকাশে বম্বার। মানুষ যত ঘায়েল হল আর না হল—মিলমিশের যে বেয়াড়া কথাবার্তা উঠছিল, গুলিগোলা ছিন্নভিন্ন করে দিক সেগুলো।

তবু জুত হল না তেমন—লড়াই বাইশ দিনের বেশি জিইয়ে রাখা গেল না। এবং দুই বাংলার মধ্যে তো একেবারে কিছুই নয়। তবে অজুহাত পাওয়া গেল বটে। পাশপোর্ট-ভিসা বন্ধ

করো উভয় বঙ্গের মধ্যে। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হলে প্রাণের টান কমে আসবে।

হরি—হরি! কলসির মুখে জল ঢালতে দেবে না—কিন্তু এ যে সেই পৌরাণিক ছিদ্রকুম্ভ। ছিদ্রপথে শতেক ধারে জল পড়ছে। আগেও ছিল না যে তা নয়। পাশপোর্ট করে যারা যেত, হিসাবের মধ্যে পাওয়া যেত তাদের—তার বাইরেও চলাচল বিস্তর। কিন্তু এবারের এই কাণ্ড ভাবতে পারা যায় না। আইনের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়ে আবালবৃদ্ধ ব্লাকের পথে দেখতে দেখতে পুরোদস্তুর ওস্তাদ। ব্লাকে চলাচল, ব্লাকে ব্যাপার-বাণিজ্য। এর পরে দরাজ হাতে পাশপোর্ট ছাড়লেও লোকে কি আর কষ্ট করে লাইন দিতে যাবে? ব্লাকে বিস্তর সুবিধা—ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে পড়লাম। ছ-মাস আগে থেকে এ-বাবুকে খোশামুদি, ও-সাহেবের কাছে ধন্না দেওয়া—ইত্যাদি তদ্বির করে বেড়াতে হবে না। খরচা উভয়ত্র। কিন্তু ব্লাকে দরদাম চলে, ঘাটোয়ালরা বিবেচনাশীল সহৃদয় মানুষ—লোকের অবস্থা বিশেষ ব্যবস্থা। ঝামেলা বিন্দুমাত্র নেই—কী কী মাল পাচার করছেন, কাকে কাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন, এপারে-ওপারের কোন ব্যক্তি চোখ তুলে দেখতে যাবে না।

কমলবাসিনী দিন-কে-দিন ক্ষেপে যাচ্ছেন। নাতনির ছেলেপুলে দিয়ে বংশের ধারাটা বজায় থাকত, সে আর হবার নয়। কুসুমা চির আইবুড়ো থেকে যাবে এমনি যেন সন্দেহ আসে। বীরেশ্বর এর মূলে। স্বাধীনতার পর থেকে সর্বনাশ চতুর্দিকে, এরই মধ্যে উনি আগের মতন জাঁকজমকের বায়নাক্কা তুললেন। এত বয়স্ক এবং এমন পণ্ডিত মানুষ হয়েও বুঝলেন না, সে-জিনিস অসম্ভব। পাত্র বাড়ির উপরে এসেছিল—রতনমাণিক হাতের মুঠোয় পেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ঘটকমশায়কে কাকুতি-মিনতি করে কমলবাসিনী পুনশ্চ চিঠি দিয়েছিলেন। জবাব এলো না। লোক পাঠালেন যশোরে, ফিরে

এসে সে-লোক খবর দিল ঘটকমশায়ও হিন্দুস্থানে সরেছেন। স্বাধীনতার গোড়াতেই ঘটকের দুই ছেলে ওপার গিয়ে উঠেছিল, লড়াই অন্তে এবারে বাপকেও জোরজার করে নিজেদের কাছে নিয়ে তুলেছে। ব্যস, হয়ে গেল। ছুটোছুটি করে এবং চিঠিপত্র লিখে সম্বন্ধ নতুন করে জুড়ে-গেঁথে দেবার মানুষ কেউ রইল না।

যত রাগ এখন বীরেশ্বরের উপরে। সময় সময় ক্ষেপে ওঠেন কমলাবাসিনী, চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখে বীরেশ্বর শঙ্কিত হয়ে পড়েন। আবার সেইরকম মাথা খারাপ না হয়, লাহোরের সর্বনাশের পর যেমনধারা হয়েছিল।

কী করা যায় এখন ?

গ্রামের বাসিন্দা রঘুনাথ দাস মহকুমা-শহরে থেকে মোক্তারি করে। ঘুঘু-লোক—মোক্তারির বাইরেও নানান ফিকিরে রোজগার। ভাইয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে রঘু দাস বাড়ি এলেন কয়েকদিনের জন্য। বীরেশ্বর তাঁর কাছে চলে গেলেন। কমল-বাসিনীর কথা সব বললেন। বললেন, নাতনির বর না জোটালে উপায় নেই মোক্তারমশায়। ঘটকমশায় ওপারে, তাঁকে আর পাচ্ছিনে। ওপারেও অনেক ছাত্র আমার, বিস্তর বন্ধুবান্ধব। গিয়ে পড়লে বেছেগুছে সম্বন্ধ একটা ঠিক করা যাবে না, এমন মনে করি নে। তা ছাড়া নিজেও ওসব দিকে কতদিন যাই নি—একই তো ছিলাম আমরা, মন কেমন করে ওঠে সময় সময়।

মোক্তার এক-কথায় বলে দিলেন, সেই ভাল। চলে যান নাতনিকে সঙ্গে করে নিয়ে।

যাই কী করে ? লড়াই থেকে পাশপোর্ট বন্ধ, যাতায়াতের কড়াকড়ি।

রঘু দাস মোক্তার ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, ঘোড়ার ডিম! গরজ বড় বালাই। লাইন কেটে মাটি ভাগ করলেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষ

অমনি ভাগ হয়ে যায় না। বর্ডার সিল করে দেবার পর যাতায়াত আরও বিস্তর বেড়েছে। হররোজ দেখতে পাচ্ছি।

বীরেশ্বর বললেন, গিয়ে একবার উঠতে পারলে তারপরে অসুবিধা নেই। ফুল্লরার ছোটমামা হিন্দুস্থানে। সেখানে রেখে যত খুশি মেয়ে দেখানো যাবে। ভাল সম্বন্ধ একটা-না-একটা যাবেই গেঁথে।

মোক্তার জোর দিয়ে বললেন, বেরিয়ে পড়ুন—দেরি কিসের জন্যে। মানুষ পটাপট চলে যাচ্ছে, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন জানিনে।

বীরেশ্বর ইতস্তত করে বলেন, ব্লাকে যাওয়া কিনা। চিরকেলে মাস্টার-মানুষ—বাঁকা পথে চলি নি কখনো। তায় বুড়ো হয়ে পড়েছি, আর সঙ্গে থাকবে সোমত্ত মেয়ে।

ভয় দেখে মোক্তার হাসতে লাগলেন। বলেন, নির্ভাবনায় চলে যান। পাশপোর্ট-ভিসা করে বেনাপোলে পেট্রোপোলে দাগি আসামির মতন দু দুবার খানাতল্লাসি আর হয়রানি—তার চেয়ে অনেক ভাল যেতে পারবেন।

মল্লিকঘাটের কথা তাঁর মুখে শুনলেন তখন। পথ কিছু ঘুর হলেও সেই ঘাটে পার হওয়া ভাল। উপাদেয় ব্যবস্থা, এপারে ওপারে ঘাটোয়াল দুটিও ভাল। এপারের ঘাটোয়াল আনোয়ার। কাজিবাড়ির ছেলে, বনেদি বংশ—আমার সঙ্গে যথেষ্ট কাজকর্ম আছে। যাবার মুখে আমার বাসা হয়ে যাবেন, চিঠি দিয়ে দেবো আনোয়ারের নামে।

॥ চৌদ্দ ॥

বাড়ির নিচেই নদী। খিড়কির দরজা খুলে—হাঁটতেও হবে না, ছোট্ট এক লাফ দিলেই শরবনে গিয়ে পড়বেন। জোয়ার বেলা হাঁটুভর জল সেখানে। শরবনের একটা অংশ পরিষ্কার করে ঘাট হয়েছে—খাঁ-বাবুর নিজস্ব ঘাট। মনে মনে হরিহর পিতৃপুরুষদের তারিফ করেন। তাঁরা যেন দিব্যচক্ষে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন—বেছে বেছে এমনি জায়গায় তাই বাস্তুভিটা নির্বাচন। ঘাটের পথ দিয়েই মা-লক্ষ্মী কমল-চরণ ফেলে খাঁ-বাড়ি সেঁধিয়েছেন—সেই পিতামহের আমল থেকে এই ঘাটে কত মালের চলাচল, লেখা-জোখা নেই।

পালান মাঝি পুরুষানুক্রমে চাকরান খেয়ে আসছে, অতিশয় বিশ্বাসী। নৌকো নিয়ে নিঃসাড়ে সে ঘাটে বসে আছে। দু-জন মাল্লা—তারাও পুরানো লোক। এদিক-সেদিক যতটা নজর চলে, জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। রাত ঝিমঝিম করছে।

হরিহর এক সময় খিড়কি-দরজা খুলে দিলেন, পালান তার লোক দুটি নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল।

ছেলেপুলেরা ঘুমিয়ে গেছে, একে একে কাঁধে বয়ে পালান নৌকোয় এনে শোয়াল। মাল্লারা খেপে খেপে জিনিসপত্র বয়ে আনছে। হেরিকেন-লণ্ঠন আছে নৌকোয়। আলো জ্বালতে হরিহরের মানা। ফাঁকা নদীতে দিব্যি নজর চলবে, এক বাঁক দু-বাঁক পার হয়ে গিয়ে তার পরে না-হয় লণ্ঠন ধরিও।

শান্তিলতাকে, দেখা গেল, খিড়কি-দরজায় দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছে। স্বামীকে গণ্ডগোলের মধ্যে রেখে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে কষ্ট হচ্ছে তার। আলগোছে ধরে হরিহর স্ত্রীকে আগনৌকোয়

তুলে দিলেন। পালান হালে গিয়ে বসেছে। সর্বশেষ দুটো বস্তা মাথায় নিয়ে মাল্লা দু'জন আসছে—কাঁথা বালিশ ইত্যাদি। হরিহর মতলব করে ওগুলো বস্তায় ঢুকিয়ে মুখ বেঁধে দিয়েছেন।

দাঁড়াও—

শরবনের ভিতর থেকে গর্জন উঠল। ঠিক এমনি সন্দেহই ছিল হরিহরের, পরখ করে নিলেন।

মেজাজ দেখানোর বিন্দুমাত্র বাধা নেই এখন। বললেন, কোন লাটসাহেব হে ? বেরিয়ে দাঁড়াও না, মুখ দেখে নিই।

টর্চ জ্বলে ওঠে। মানুষ লাফিয়ে পড়ে ডাঙায়—একের পর এক পড়ছে। শরবনে ডিঙি ঢুকিয়ে নিঃসাড়ে বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছিল। পারেও বটে!

কারা তোমরা ? কী দেখতে চাও—দেখবার কোন্ এক্তিয়ার আছে ?

উত্তর না দিয়ে ছোকরারা হেঁচকা-টান দিয়ে বস্তা দুটো ভুঁয়ে নামিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বলে, নিয়ে যাও।

হরিহর ব্যঙ্গ করে বলেন, খুলে দেখলে না যে ?

ডাহা বেকুব। পালান ও দুই মাল্লা হি-হি করে হাসতে লাগল।

হাসির ঢঙে হরিহরও দাঁত মেললেন। বুকের মধ্যে কিন্তু ধড়াস-ধড়াস করছে। সর্বনেশে কাণ্ড—নজরবন্দী করে রেখেছে। অষ্টপ্রহরের বন্দী, বাড়ির চতুর্দিক ঘিরে নজর।

বউ-ছেলেপুলে পাঠিয়ে দিয়ে এত বড় বাড়ির মধ্যে এখন হরিহর একেবারে একলা। তিনি আছেন, আর আছে ভাবনা-চিন্তা। কখন কী ঘটে যায়—তটস্থ হয়ে থাকেন। মানুষজন বৈঠকখানায় পেলে বর্তে যান। কেউ বড়-একটা আসে না—নির্জনতায় অধীর হয়ে তিনিই সময় সময় চলে যান কোন অন্তরঙ্গ-জনের বাড়ি।

কী দিনকাল! মগের মুলুকে বাস যেন আমাদের। নাকে সরষের তেল দিয়ে সরকার নিদ্রামগ্ন। এখানে ডাকাতি, ওখানে রাহাজানি, সেখানে লুঠতরাজ। হক-না-হক আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে-জ্বালিয়ে দিচ্ছে। খুনখারাপি একেবারে ডাল-ভাতের মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনদুপুরে দরজায় কড়া নেড়ে বাইরে ডাকল। বেরিয়ে দাঁড়াতেই—কথা নয়, বার্তা নয়, ঘ্যাচ করে দিল ছোরা বসিয়ে। দিয়ে পানের দোকান থেকে দুটো বাংলা-খিলি মুখে পুরে জ্বলন্ত দড়ির মুখে সিগারেট ধরিয়ে আস্তে-ব্যস্তে চলল—নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরে যাচ্ছে, ভাবখানা এমনি।

হরবখত এই সমস্ত হরিহরের কানে পৌঁছায়। কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলে দু-এক কথার পর অনিবার্যভাবে এই প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ইচ্ছে করেই শোনায় বলে হরিহরের সন্দেহ। শুকনো মুখে কাষ্ঠহাসি আনবার প্রাণপাত প্রয়াস করেন তিনি তখন।

বলরাম বড় বিশ্বাসী। এবাড়ি কাজ করতে করতে চুল পাকিয়ে ফেলেছে। ফিসফিস করে সে খবর দিল: আপনার নামও খুব উঠেছে কিন্তু বাবু। সকলের মুখে আপনার কথা।

হরিহর তাচ্ছিল্যের ভাবে বললেন, এ-বাজারে দুটো ডাল-ভাত করে খাচ্ছি, হিংসুটেদের নজর পড়ে গেছে।

তা হোক, তা হোক—বড্ড গরম চারদিকে, আপনিও কোনখানে সরে পড়ুন। খবরবাদ নিয়ে তবেই আমি বলছি।

মনের মধ্যে যা-ই হোক, মুখে হরিহর খুব সাহস দেখাচ্ছেন: সরবো কোন্ দুঃখে? বলি বাড়িটা আমার বই তাদের তো নয়। গ্যাঁট হয়ে আছি বসে, কে কী করতে পারে দেখা যাক।

বলরাম বলে, আমি তবে দেশে-ঘরে চলে যাই। ছেলেরাও তাই বলছে। বুড়ো বয়সে অপঘাতে প্রাণ দেবো না।

হরিহর বিরক্তকণ্ঠে বললেন, প্রাণ কিসে যাচ্ছে শুনি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। দিনকাল বিষম খারাপ। মানুষ হন্তে হয়ে গেছে, ধর্মাধর্ম মানে না। কখন হামলা দিয়ে পড়ে ঠিক-ঠিকানা নেই। বোমা-টোমা ফাটালে একসঙ্গে পাইকারি মরণ—তার মধ্যে বাছাবাছি করবে না।

মুখে তম্বি, বুকের ভিতরে কিন্তু ধড়াস-ধড়াস করে। ভাগ্যিস সে আওয়াজ লোকে শুনতে পায় না। সন্ধ্যার পর গা-ঢাকা দিয়ে হরিহর থানায় গেলেন। গুরু-প্রণামীর মতন নিয়মিত বন্দোবস্ত আছে, সেই হিসাবে দারোগার সঙ্গে দারুণ মাখামাখি। অন্তুতপক্ষে তাই এতকাল বুঝে এসেছেন।

নিজের কথা না বলে অন্যের বকলমে চালাচ্ছেন: চাট্টি ধান আছে একজনের। মুশকিলে পড়েছে। আপনি আমার বড্ড আপন—সেইজন্য পরামর্শ নিতে এলাম।

বসুন, বসুন—

খাতির করে বসিয়ে দারোগা সোৎসাহে বলেন, কার ধান, লোকের নাম বলুন।

নাম পরে শুনবেন। ধান লুঠ করবে, শোনা যাচ্ছে। পুলিশ-প্রোটেকশন চাইছে। আপনাদের যা প্রাপ্য, তার ত্রুটি হবে না। অগ্রিম নিয়ে নেবেন—আদেশ হলে আমিই এসে দিয়ে যাব।

এত সব লোভনীয় কথাবার্তা দারোগার কানেই গেল না যেন। নামের জন্যে চাপাচাপি: বাইরের মানুষ গিয়ে পড়বার আগে আমরাই ধান সীজ করে আনি। নামটা বলুন দিকি। ধান ধরতে পারছিনে বলে নানান কথা ওঠে। চাকরি ঠেকাতে গরজ হয়ে পড়েছে।

ভিখ চাইনে, তোর কুত্তা ঠেকা—সেই গতিক। নাম-ঠিকানা বলতেই হবে—দারোগা নাছোড়বান্দা। হরিহর জোড়হাত করলেন: বলি কেমন করে দারোগাবাবু, বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা

হবে। আচ্ছা, যাই তো এখন—বাড়ি গিয়ে ভেবেচিন্তে দেখিগে।

বিস্তর কষ্টে হাত ছাড়িয়ে উঠে পড়লেন। ঘুঘুলোক দারোগা, ঠিকই আন্দাজ করেছেন। কাজ হল না তো গালি দিয়ে মুখের সুখ করে নিচ্ছেন: খবরটা যখন দিলেন, ছাড়ব না খাঁ-বাবু। ভাবুনগে এখন। বাড়ি গিয়ে আমি জেনে আসব। নাম-ঠিকানা পেলে শালার মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে কোমরে দড়ি বেঁধে বাজারের উপর ঘোড়দৌড় করাব।

শুনতে শুনতে বেরুলেন হরিহর থানা থেকে। ত্রিপাঠি হেন ব্যাঙ-মানুষও দুঃসময় দেখে হাতির পিঠে লাথি ঝেড়েছে সেদিন—দেখাসাক্ষাৎ করতে মুখের উপরে মানা করে দিয়েছিল। তার কাছেই তবু চললেন। মানসম্মান নিয়ে টং হয়ে থাকবার দিন আজকে নয়।

ত্রিপাঠি আরো ঘাবড়ে দেয়। বলে, সময় থাকতে, কতবার সামাল করলাম হুজুর, পাজি জিনিস খালি করে ফেলুন। যে দর পান, তাতেই ঝেড়ে দিন। কানে নিলেন না, ব্লাকের বাজার চিনে ফেললে সামান্যে আর মন ওঠে না। কম-বেশি যা-হোক কিছু তখন সিন্দুকে উঠত। ধুন্দুমার গুরুর মুখেও, মনে করে দেখুন, বুদ্ধি দিতে কসুর করি নি। দাতাকর্ণ হয়ে স্বেচ্ছায় মাল দান করতে বলেছিলাম।

দোষ-ঘাট মেনে নিয়ে হরিহর অধীর কণ্ঠে বললেন, এখন কি করতে পারি বলো ত্রিপাঠি। অক্ষরে অক্ষরে তাই করব।

ত্রিপাঠি বলল, শ্রীগোবিন্দের পায়ে সর্ব-সমর্পণ করে সরে পড়ুন পৈতৃক প্রাণ নিয়ে। প্রাণ বাঁচানো বড় কথা। দেখছি হুজুর, ধান-চাল থাকাও পাপ, না থাকাও পাপ। যাদের নেই, না খেয়ে মরে যাচ্ছে তারা। যাদের আছে, পিটিয়ে তাদের মেরে ফেলছে। মরণ থেকে বাঁচার উপায় নেই।

সারাদিন হরিহর বিস্তর ছুটোছুটি করলেন, ভরসা কেউ দিল না, ভয়ের কথাই সকল মুখে। নিন্দেমন্দ কটূক্তির বান বয়ে যাচ্ছে—পাপ-কলি যেন হরিহর নাম নিয়ে মূর্তি ধরে এসেছে, এমনিতরো কথাবার্তা সকলের। এবং শুধু মুখের গালিগালাজেই শোধ যাচ্ছে না—হাতে-কলমে কলি-দমনেরও নাকি বিবিধ উদ্যোগ-আয়োজন। হিতার্থী যার সঙ্গেই দেখা হয়, ত্রিপাঠির কথাই একবাক্যে বলে: যদি পারেন তো সরে পড়ুন। তিলার্ধ দেরি নয়।

'যদি' বলছ কেন হে? খালি হাতে চলে যাবো—তাতেও বাধা হবে নাকি?

কড়া-নজরে রেখেছে, টের পান না? আর বলে কি জানেন?

ঢোক গিলে মানুষটা বলল, বলছে জাঁড়ে কইমাছ জিইয়ে রাখা—

আত্মগতভাবে হরিহর শেষটুকু যোগ করে দেন: জিয়ানো মাছ ইচ্ছে মতন তুলে নিয়ে মুণ্ডু ছেদন করবে। উঃ, মাগো!

॥ পনেরো ॥

ফাল্গুন পড়ে গেছে, অতএব বসন্তকাল। আনুষঙ্গিক মলয়-পবন কোকিলকূজন চূতমুকুলের গন্ধ ইত্যাদিও আছে। আছে গ্রামের ভিতরে—মাইল চারেক দূরে। আপাতত ধূধূ-করা মাঠ—চড়া রোদ, ধুলোর সমুদ্র। পাথুরে-কালো বলে চিরদিন হ্যাক-থু করেছেন—ধুলোর মহিমায় সেই মানুষদের চেহারা দেখুন নয়ন ভুলে। রীতিমত গৌরমূর্তি। চলতি বাসে আয়না জোটানো মুশকিল—জোটাতে পারলে কিন্তু দিব্যি হত। ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি বন্ধ করে কালোকোলো মানুষগুলো আয়না ধরে মুগ্ধ হয়ে আপন আপন রঙের জৌলুষ দেখত।

ভিড় হোক যা হোক, বাস তবু চলছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর নড়ে না। ড্রাইভার এটা টেপে, ওটা ঘোরায়, তার পাকিয়ে ওখানটা জুড়ে-গেঁথে দেয়। প্যাসেঞ্জাররা ব্যাকুল: কী হল, ঘুমিয়ে গেল নাকি তোমার মোটর?

ড্রাইভার গনি মিঞা বলে, ঘুমুলে ছাড়ছে কে? নগদ পয়সায় অগ্রিম টিকিট কেটে তবে সব গাড়িতে চেপেছেন—মাংনা নয়। ভালোয় ভালোয় মোকামে পৌঁছে দে, ঘুমোলি কি মরে গেলি তখন সে আবদার কানে নেবো।

ইঞ্জিনের উদ্দেশ্যে বলা। ইঞ্জিন জবাব দিতে পারে না, নিঃশব্দে শুনে যায়, তাই রক্ষা। নইলে যা রেগেছে গনি মিঞা, মুখোমুখি জবাব হলে স্টার্ট-দেওয়া হ্যাণ্ডেল তুলেই দমাদম পেটাত।

এ্যাসিস্টাণ্ট আছে একটি। গলা ফাটিয়ে প্যাসেঞ্জার ডাকে, টিকিট দেয় পয়সা হিসাব করে নিয়ে, হ্যাণ্ডেল মেরে মেরে স্টার্ট

দেয়, খানাখন্দ থেকে বালতি ভরে ইঞ্জিনে জল ঢালে—হরেক রকম কাজ। ড্রাইভার হাঁক দিয়ে ওঠে: যন্তোরের বাক্স বের কর্ বলাই, এমনি এমনি হবে না। হাতুড়ির ঘা পড়ুক, প্লাসের মোচড় খাক, তাঁাদড়ামি তবে ছাড়বে।

সিট ছেড়ে নেমে এসে গনি মিঞা বনেট খুলে ফেলল। যন্তোরের বাক্স বেরিয়ে এসেছে। হাতুড়ির ঘা এবং প্লাসের মোচড় খাওয়া সত্ত্বেও ইঞ্জিন রা কাড়ে না।

খানিকক্ষণ নানারকমে চেষ্টাচরিত্র করে এবারে সে রায় দিল: মাদুর পেতে ফেল্ বলাই। ভোগাবে।

মাদুর গোটানো থাকে ড্রাইভারের সিটের পাশে। চট করে বলাই ইঞ্জিনের তলায় মাদুর বিছিয়ে ফেলল। মাদুরে শুয়ে কাজ করবে, ধুলো লাগবে না। এমনি অবস্থা হামেশাই নিশ্চয় ঘটে, বুঝেশুজে তাই মাদুরের ব্যবস্থা আছে।

চিত হয়ে কনুইয়ের ধাক্কায় গনি মিঞা ধীরে ধীরে মোটরের তলায় অদৃশ্য হল। অ্যাসিস্টাণ্ট লোকটা তটস্থ হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে—কখন কোন্ জিনিসের হুকুম পড়ে, হাতের কাছে এগিয়ে দেবে।

মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। ধান কেটে-নেওয়া শুকনো মাঠ, এতটুকু ছায়া নেই কোনদিকে। প্রখর রোদে মাথার চাঁদি ফেটে যাবার জোগাড়, তবু অনেকে নেমে পড়েছে। ইঞ্জিন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্বাস পড়ে কি না পড়ে। কতক্ষণে গনি মিঞা বেরিয়ে এসে 'হ্যাণ্ডেল মারো' বলে বলাইয়ের উপর হাঁক পাড়বে।

বেরুল অবশেষে। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দেহের আড় ভেঙে নিল। সকলে উদ্‌গ্রীব: যাবে গাড়ি?

না গিয়ে উপায় আছে। গাড়ির বাবা যাবে, গাড়ি তো ছেলেমানুষ। মবলগ টাকার জিনিস—মালিক কি রাস্তায় এমনিধারা শুইয়ে রেখে দেবে? দেরি হবে খানিকটা। খাওয়া-

দাওয়া আরাম-আয়েস করতে লাগুন আপনারা ততক্ষণ—শহরে গিয়ে মেকানিক আনি গে। আমার চেষ্টায় হল না।

হুদ্দমুদ্দ ঠাসা বাস, বাড়তি একটা পিঁপড়ে ঢুকবে সে জায়গা নেই। বৃদ্ধ শিশু এবং স্ত্রীলোকও রয়েছে। কলরোল উঠল: তেপান্তরের মাঠে ফেলে বলছে কি না খাওয়া-দাওয়া আরাম-আয়েস করুন। বেড়ে ইয়ার্কি!

ড্রাইভার চটে গিয়ে বলে, মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? শহর তো ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়—হাঁটুন না গুটগুট করে, সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছে যাবেন।

লড়াই কবে খতম, লোকের জওয়ানি মেজাজ আজও তবু ঠাণ্ডা হয় নি। কলহ দেখতে দেখতে জমে উঠল, মুখ থেকে হাতে নামবার গতিক।

হেনকালে অমলেশ।

কলরব উঠল যাত্রীদের মধ্যে। অমু, অমল, অমলবাবু—কত নাম। বলে, অমল এসে পড়েছে—উপায় হবেই।

ধবধবে পাজামা, সিল্কের হাওয়াই-শার্ট, চকচকে জুতো। ক্রিং-ক্রিং বেল বাজিয়ে অমলেশ সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

কী হয়েছে?

যাত্রীরা শতকণ্ঠে ড্রাইভারকে দুষছে। গনি মিঞার উপর অমলেশও ধমক দিয়ে ওঠে: জবাব ওঁদের দিয়ে কয়দা নেই। আমায় বলো, কী হয়েছে।

ড্রাইভার-এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সকলকে চেনে অমলেশ। নাম-ধাম জানে। বলে, বনেটটা তোল্ বলাই। দেখি।

সেই দেখা চলল বেশ খানিকক্ষণ। এটা-ওটা নিয়ে খুটখাট চলল। মুখ তুলে তারপর অমলেশ বলে, ইঞ্জিনের তো বারোটা বেজে গেছে। ইংরেজ আমলে খেটেছে, দেশি আমলে এই উনিশ বছর ধরে খাটছে। গ্যারেজে নিয়ে ইঞ্জিন

নামিয়ে খোল-নলচে পালটে ফেল। তালি-তুলিতে আর চলবে না।

প্যাসেঞ্জারদের আর্তনাদ: গ্যারেজ তো শহরে। অচল গাড়ি সেই অবধি নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। গনি মিঞা পায়ে হেঁটে চলল, পৌঁছুতেই তো বেলা পড়ে যাবে—

গনি মিঞা সংশোধন করে দেয়: রাত্তির হয়ে যাবে, তাই বলুন। গিয়ে তারপরে লরি ভাড়া করা—মবলগ খরচা, মালিককে বলে-কয়ে রাজি করাতে হবে আগে—লরি এসে শিকলি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাবে।

ওরে বাবা, রাত পুইয়ে সকাল হয়ে যাবে যে।

ড্রাইভার পুনরপি বলে, সকাল কি বলেন, সন্ধ্যে হয়ে যাবে তাই বলুন। সারা দিনমান কেটে গিয়ে কালকের সন্ধ্যে। রাত্রে লরি নড়বে না, তাদের কোন্ দায় পড়েছে? হয় যদি তো পরের দিন সকালের দিকে। সকাল মানে রাতের খোয়ারি ভেঙে চা-বিস্কুট খেয়ে তারপর। বসে থাকুন ততক্ষণ ঠাণ্ডা হয়ে। খালি বাস নয়, মানুষজন শুদ্ধ বাস টেনে নিয়ে যাবে, সেই চুক্তি করেই আনব।

অমলেশ হেসে বলে, ভয় দেখাচ্ছে আপনাদের। গনিটা এক-নম্বরের পাজি। গ্যারেজ অবধি কষ্টে-সৃষ্টে আমিই না হয় পৌঁছে দেবো।

পারবে তুমি?

অমলেশ বলে, দেখিই না চেষ্টা করে। হ্যাণ্ডেল আমায় দাও দিকি, বলাইকে দিয়ে হবে না।

নিজ হাতে হ্যাণ্ডেল মারছে। একবার ঘোরাতেই গর্জন। পাড়াগাঁয়ের বাসে কে না চড়েন, কিন্তু একবারে স্টার্ট হতে কবে দেখেছেন বলুন।

ফুল্লরা ও বীরেশ্বর এই বাসে যাচ্ছেন। কাজকর্ম চোখে দেখে

ও মানুষজনের মুখে বিবরণ শুনে অবাক হয়ে গেছেন—ছোকরা দৈব-শক্তিধর না হয়ে যায় না। ঠিক তাই।

অমলেশের মুখেও দেখি সেই কথা। সকলের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে সগর্বে বলে, মন্তোর জানি আমি—হ্যাণ্ডেল ধরে বিড়-বিড় করে মন্তোর পড়ছিলাম, দেখলেন না? সাইকেল হাতে তুলে দে বলাই, দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধ, পড়ে না যায়। গ্যারেজ অবধি না গিয়ে উপায় নেই, পথের মধ্যে আবার যদি বিগড়ায় গনি মিঞা বাগ মানাতে পারবে না।

সবাই একবাক্যে সায় দিয়ে বলে, তাই—তাই। তুমিই চলো অমল। শহরে পৌঁছে দিয়ে সেখানে ইচ্ছা যেও—গনির হাতে ছেড়ো না।

অনতিপূর্বে গনি মিঞা কলহ করেছিল, মওকা পেয়ে তার উপরে শোধ তুলছে: চালু ড্রাইভারদের লড়াইয়ে টেনে নিয়ে গেল, মাঠের গোরু-ছাগল ধরে ধরে তখন লাইসেন্স দিয়েছিল। গনি মিঞা সেই আমলের ড্রাইভার।

মন্তোরই জানে অমলেশ, মিছা নয়। গাড়ি আর বজ্জাতি করে না—মহকুমা-শহরে টুক করে এনে পৌঁছে দিল। একেবারে গ্যারেজের ভিতরে।

বলে, বিস্তর তোয়াজে পথটুকু এনেছি। ভাল মতন চিকিচ্ছের পর তবে যেন গাড়ি বেরোয়। নয় তো বিপদ হবে। ব্রেক ধরছে না, গড়িয়ে পগারে পড়তে পারে। ইঞ্জিনে আগুন ধরে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

যাত্রীরা নেমে পড়ল। এতক্ষণে সোয়াস্তি। গ্যারেজের মিস্ত্রির সঙ্গে অমলেশ কথা বলছে। বীরেশ্বর এগিয়ে এসে বলেন, বিপদভঞ্জন মধুসূদন হয়ে তুমি বাবা আবির্ভূত হলে। নইলে কী যে হত!

ইঞ্জিনের ত্রুটি মিস্ত্রি লোকটাকে অমলেশ বুঝিয়ে দিচ্ছে, বুড়োমানুষের কৃতজ্ঞতা-বচন তার মধ্যে কানে ঢোকে না।

বীরেশ্বরও নাছোড়বান্দা: আমার কথাটা শোন বাবা—

হেসে উঠে অমলেশ বলে, শুনেছি বই কি। আমি এসে বিপদভঞ্জন করলাম। কিন্তু বিপদ তো দেখতে পাইনে। সদর-রাস্তার উপর লাইনের বাস—এটা খারাপ হল তো পরেরটায় উঠে পড়তেন।

ওকিবহাল একজন মাঝখানে টিপ্পনী কেটে উঠল: পরের বাস তো এক পহর রাতে। শীত বেশি পড়লে, কিংবা বৃষ্টি-বাদলা হলে সে বাস আবার বেরোয় না, ড্রাইভার গাঁজা টেনে শুয়ে পড়ে।

কৈফিয়ৎ যেন অমলেরই দেবার কথা। বলে, যত গাড়ি লড়াইয়ে রিকুইজিসন করে নিয়েছিল। সামান্যই ছেড়েছে। গাড়ির বড় টানাটানি।

আবার সে মিস্ত্রিটাকে নিয়ে পড়ল। গাড়ির কাজও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানে—গড়গড় করে বলে যাচ্ছে, মিস্ত্রি ঘাড় নেড়ে প্রতিটি কথা মেনে নেয়।

বীরেশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন। অমলেশের নজর পড়ল: কথা আছে বুঝি?

বীরেশ্বর বললেন, বাসের মধ্যে বলাবলি করছিল, অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা ধরো তুমি।

অমলেশ হেসে বলে, কোন্ সব অসাধ্য-সাধন দু-পাঁচটা তা-ও বলেছে নিশ্চয়।

সে কথা এড়িয়ে গিয়ে বীরেশ্বর বললেন, এখানে এক রঘু দাস মোক্তার আছেন, তাঁর বাসায় গিয়ে উঠবার কথা। কিন্তু তার আগে কথাটা তোমায় বলব বলে দাঁড়িয়ে আছি।

নিভৃত আমতলার দিকটায় অমলেশকে নিয়ে চললেন। সেখানে মৃন্ময়া—উড়ন্ত চুল, রোদে আরক্ত মুখ। ক্লান্ত চেহারা।

বীরেশ্বর স্থন্দরাকে দেখিয়ে বললেন, কলেজ থেকে অবসর নেবার পর একটা দিনের তরে আর গ্রামছাড়া হই নি। নাতনির দায়ে প্রথম এই পথে নামলাম।

আত্মপরিচয় দিলেন বীরেশ্বর। অমলেশ তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিল।

বীরেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, আমার ছাত্র তুমি? কই, চেনামুখ তো নয়। ছাত্র আমি ভুলিনে।

অমলেশ বলে, আপনার পায়ের নিচে বসবার ভাগ্য হয় নি সার। কলেজেই বা পড়লাম ক'দিন! আপনার ছাত্রের লেখা-জোখা নেই—ক্লাসে না পড়েও অনেক অনেক ছাত্র আপনার। একলব্যের মতন। পড়াতেন ইতিহাস—কিন্তু আসল যে পাঠ, সে হল মনুষ্যত্বের।

তা যদি বলো, আমার ছাত্রেরাই আজকের গুণী-জ্ঞানী মানুষ—দেশের মাথা। কী করল তারা বলো দিকি? আত্মগ্লানি হয়, অপদার্থ শিক্ষক আমরা। বড় বড় কথা কপচে গিয়েছি, কিন্তু মন ছুঁতে পারি নি।

শিক্ষকের চোখদুটো বুঝি অতীত স্মৃতিতে ছলছলিয়ে উঠল, কণ্ঠ হাহাকারের মতো শোনায়। বলেন, স্বাধীন হয়ে কত-কি হবে—ছাত্রকাল থেকে ভেবে এসেছি। স্বাধীনতার পয়লা মহড়ায় ছেলে আমার বলিদান দিলাম—আমারই মতন নিরীহ মাস্টার-মানুষ। শোক সামলে নিয়ে তারপরেও ভাবছি, চরম তো হয়ে গেল—আর কী হবে? বাঁচার পথ ভাববে এবার মানুষে।

সেই জিনিসই ভাবছে সার, আপনার মনের কথা আজ হাজার-লক্ষ মানুষের। ঝোঁকে পড়ে কী করলাম, এ কী হয়ে গেল! বাংলা ভাগ হয়ে পশ্চিম-পূর্ব দু-ভাগই আমরা মারা পড়ছি।

বিচলিত কণ্ঠে অমলেশ বলতে লাগল, হিন্দু আর মুসলমান

পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান বলে ফারাক নেই আজ। বিশেষ এই বাংলাদেশের মানুষ যারা। মার খেয়ে খেয়ে ধুঁকছি—মরণ তো আমাদেরই সকলের আগে। কেমন করে বাঁচা যায়, সেই এখন ভাবনা। ঘরের বার হন না বলেই এ খবর হয়তো তেমনভাবে আপনার কানে পৌঁছয় নি।

গিয়ে পড়েছে তখন আমতলায়। অমলেশকে দেখে ফুল্লরা আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলল। সেই সঙ্গে বুঝি পথের কষ্টও।

বীরেশ্বর বললেন, কাজকর্মে অবসর নিয়ে জীবনের বাকি ক'টা দিন, ভেবেছিলাম, পড়াশুনো আর সাধ্যমতন সমাজ-সেবা নিয়ে গাঁয়ের ভিতরে কাটিয়ে দেবো। ছিলামও তাই, কিন্তু নাতনি আমায় বিষম ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফেলল বাবা। অকূল পাথার দেখছি।

যাকে নিয়ে বলা, তার মনে কিন্তু একবিন্দু আঁচড় কাটে না। টিপে টিপে হাসছে কি ফুল্লরা ?

বৃদ্ধ বললেন, নাতনিকে নিয়ে ওপার যেতে হবে।

অমলেশ বলে, যাবেন—তার জন্যে কি !

পাশপোর্ট-ভিসার যোগাড় করতে পারি নি। কিন্তু যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় নেই।

অমলেশ হেসে বলে, পাশপোর্ট থেকেও আজকাল যাওয়া যায় না সার। বাইরে চলাচল নেই বলে খবর রাখেন না। লড়াই হয়েছিল পাকিস্তানে হিন্দুস্থানে—আমাদের বাংলায় কিছুই নয়, সেই কোন কাঁহা-কাঁহা মুলুকে। কাগজে পড়েছি, ছবিতে দেখেছি, রেডিও-য় কানে শুনেছি। তা-ও থেমে গেছে কতকাল, কিন্তু জের কিছুতে মেটে না।

ফুল্লরার দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখে অমলেশ বলে, যাওয়া-আসা তাই বলে কি বন্ধ ? পথ কে রুখতে পারে ? লড়াই যখন

চলছে, সেই বাইশটা দিনও পথ বন্ধ ছিল না। গরজ বড় বালাই, হুকুমে গরজ থেমে থাকে না। হাজার হাজার মাইল জুড়ে বর্ডার—বহতা গাঙ কত আর বাঁধ দিয়ে ঠেকাবে। সবাই যাচ্ছে আসছে—শক্ত কিছু নয়।

যতই বলো, ভয় ঘোচে না। মাস্টার-মানুষ, তায় বুড়ো হয়ে পড়েছি। সঙ্গে মেয়েছেলে। নিতান্ত দায় বলেই বেরিয়ে পড়েছি।

খপ করে বীরেশ্বর হাত জড়িয়ে ধরলেন: বাসের লোকে বলাবলি করছিল, তোমাদের কাছে এসব ডাল-ভাতের শামিল। কপালগুণে পেয়েছি তো ছাড়তে চাচ্ছিনে। সাথেসঙ্গে থেকে তুমি যদি আমাদের পার করে দাও।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অমলেশ পুনশ্চ বীরেশ্বরের পাদস্পর্শ করল। বলে, মোক্তারমশায়ের বাসায় তো যাচ্ছেন। বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন গে। কয়েকটা কাজ সেরে সন্ধ্যের দিকে আমি আসব।

বীরেশ্বর বললেন, তোমার কাজ আমাদেরই মতন হয়তো জরুরি। রঘু দাস মোক্তারকে যৎসামান্য জানি। ব্লাকের কাজ-কারবার করে শুনে ধর্না দিতে চলেছি। একলা আমি হলে কপাল ঠুকে সোজা গিয়ে বর্ডারে উঠতাম। নাতনিকে নিয়ে ভাবনা। কিন্তু তোমায় পেয়ে গেছি বাবা, আর আমার মোক্তারে গরজ নেই। যেখানে নিয়ে যাবে যাব, যা করতে বলবে করব।

অমলেশ বলে, এক্ষুনি যেতে চান, বিশ্রাম চাইনে?

এক্ষুনি, এক্ষুনি। অবিশ্যি তোমার দিক দিয়ে যদি বাধা না থাকে। চিঁড়ে-বাতাসা আছে, তাই চিবিয়ে ফুল্লরা একঢোক জল খেয়ে নেবে।

অমলেশ একটু ভেবে নিয়ে হনহন করে আবার গ্যারেজে ঢুকল। ছোকরার কি বসুধা জুড়ে চেনা-জানা? ধরেছে একটাকে: সাইকেল তোমার জিম্মায় থাকল আবদুল। বাসের ছাত থেকে পেড়ে ঘরে নিয়ে যাও।

ফিরবে কখন ?

সাইকেল তো খেতে দিতে হবে না, ভাবনা কি তোমার ? প্রতি বারেই ফিরে ফিরে আসি, এবারে হয়তো ফিরলাম না। মজা তোমার, সাইকেলটা তোমার হয়ে যাবে।

কথার সমাপ্তির আগেই আবছুলের হাতের ঘুষি। ঘুষি খেয়ে হাসতে হাসতে অমলেশ আমতলায় ফিরে গেল।

একটা সাইকেল-রিক্সা নেওয়া যাক—কেমন ? মেয়েছেলে নিয়ে ভাবনা—আমরা হলে পায়ে হেঁটে সটান ঘাটে গিয়ে উঠতাম।

ফুল্লরার দিকে চেয়ে বক্তব্য শেষ করল : তাহলেও হাঁটতে হবে। না হেঁটে পারঘাটে ওঠা যায় না।

ফুল্লরা বলে, ভাবনা দাছুকে নিয়ে। আমার কি—হাঁটতে আমি খুব পারি। দু-দু'খানা পা রয়েছে, সে তো হাঁটবারই জন্মে।

বীরেশ্বরও সহাস্তে সায় দিয়ে ওঠেন : মেয়ে হয়েও নাতনি আমার ললিত-লবঙ্গলতা নয়। দায়ে পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে আছে। নইলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমগাছ-তলায়, ডালে ডালে আমের গুটি—

অমলেশ তারিফ করে ওঠে : বেশ তো, বেশ তো।

ফুল্লরাকে চেয়ে দেখে এবার ভাল করে। প্রীতির চোখে দেখে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে, অনিশ্চিত পথঘাট—একমুখ হাসি নিয়ে তবু চলেছে।

সাইকেল-রিক্সা মিলল। দু-জন ধরে যাবে—অমলেশ বলে, উঠুন আপনারা।

ফুল্লরা বলে, পয়সা দিচ্ছি তো ছাড়ব কেন ? উঠে পড়ুন—দাছু আর আপনি দু-জনেই।

অমলেশ অবাক হয়ে বলে, আমি ?

হ্যাঁ। বুড়োমানুষের সঙ্গে অতিথি মানুষ।

তাই হয় বুঝি।

ঘাড় নেড়ে অমলেশ ঝেড়ে ফেলে দিল : মহিলা হাঁটবেন আর আমি যাব রিক্সায় বাবুয়ানা করে। কখনো তা হয় না।

পথের খানিকটা সুরাহা হওয়ায় বীরেশ্বরের মুখেও হাসি দেখা দিয়েছে। হেসে উঠে বললেন, দেখছিস কি দিদিভাই, মহিলা হয়ে গেছিস তুই। ছেলেটি এই প্রথম তোকে দেখলেন, আমিও কিছু শিখিয়ে দিই নি। ভালে ভালে গুটি ধরেছে, অথচ মহিলা হয়ে তলায় কেমন চুপটি করে আছিস—এখন থেকে ঠিক এই জিনিস চলবে।

ফুল্লরা এসব কানেই নেয় না, আগের কথার জের ধরে বলছে, রিক্সায় দাদু আর আপনি। আমাদের দায়ে নিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে কেন কষ্ট করতে দেবো?

অমলেশ বলে, হাঁটায় বুঝি কষ্ট?

না, সুখ। মহিলা সুখভোগ করতে চাচ্ছে, কেন তাতে বাগড়া দিচ্ছেন বলুন তো।

অমলেশ বলে, সে সুখে কেউ-ই বঞ্চিত হবেন না। বললাম তো। রিক্সায় মাইল তিনেক—জোড়াপুকুর অবধি। সাধ মিটিয়ে সুখভোগ তার পরে। সারও বাদ যাবেন না।

তর্কাতর্কিতে সময় যাচ্ছে। যেতে হবে বিস্তর দূর। বীরেশ্বরকে নিয়ে কথা নেই, তাঁকে উঠতেই হল রিক্সায়। একলা তিনি। আর দু-জনে রিক্সা অনুসরণ করে পাশাপাশি চলেছে। অবিরাম কথাবার্তা। হাত-পা চোখ-নাক-মুখ সবই যেন কথা বলছে। অবাক লাগে, এই মেয়েই বাসের মধ্যে এতক্ষণ কাঠের পুতুল হয়ে ছিল।

বলো হরি, হরিবোল—

মড়া নিয়ে চলেছে। শ্মশানবন্ধুগুলোর রীতিমত তাগড়াই চেহারা। গণতিতেও ডজন দেড়েক। জাঁকের মড়া, সন্দেহ কি!

অমলেশ হি-হি করে হাসে : গঙ্গায় দিতে চলল। আমাদের পাকিস্তানে গঙ্গা নেই, পার হয়ে তাই চলে যাবে।

মড়া যাচ্ছে, তাতে হাসির কী আছে এত ? এ কেমন হৃদয়হীন মানুষ !

বলো হরি, হরিবোল—

মড়া চলেছে দূরে দূরে। রিক্সায় বীরেশ্বর। পিছনে ফুল্লরা ও অমলেশ। জোর-পায়ে যেতে হচ্ছে, রিক্সা বেশি পথ এগিয়ে না পড়ে।

হঠাৎ দেখা যায়, সদর-রাস্তা ছেড়ে মড়ার দল মাঠে নেমে পড়ল। অপথ-কুপথ ভেঙে পোঁ পোঁ করে দৌড়চ্ছে।

অমলেশ আবার এক চোট হাসে। অবাক হয়ে ফুল্লরা বলে, কী হল ?

মড়া পালাচ্ছে—দেখতে পান না ? আহা রে, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ঐ যে একটা।

ফুল্লরা বলে, সত্যি, বেশ তো গুটি গুটি যাচ্ছিল। পালানোর কী হল হঠাৎ ?

দেখা দিতে চায় না, আবার কি ! কাছাকাছি হলে একটা দুটো ওর মধ্যে বোধহয় চিনে ফেলতাম। আমাকেও হয়তো চেনে ওরা।

ফুল্লরা বলে, 'হয়তো' কেন, নিশ্চয় চেনে। তল্লাটের ভিতরে আপনাকে আবার না চেনে কে ? সাইকেল থেকে যেইমাত্র নেমে দাঁড়ালেন, বাস-ভরতি মানুষ হৈ-চৈ করে আপনাকে নিয়ে বলতে লাগল।

বটে, বটে !

চোখ মিটমিট করে অমলেশ বলে, কি বলতে লাগল—নিন্দে না প্রশংসা ?

ফুল্লরা জবাব দেয় না।

নিন্দে, বুঝতে পারলাম। বলছিল বোধহয়, বাউণ্ডুলে সাকিনশূন্য লোক একটা। পথে পথে হুড্ড-হুড্ড করে বেড়ায়।

ফুল্লরা বলে, না, ফেরিস্তা দেবদূত বলছিল। আচমকা আবির্ভাব ঘটে, বর দিয়ে পলকে অন্তর্ধান করেন।

বটে?

সকৌতুকে অমলেশ বলল, যশের কথা মিথ্যে হলেও শুনে সুখ।

ফুল্লরা বলে, মিথ্যে আর কই তেমন। আবির্ভাব আমরাও তো চোখে দেখলাম। না হলে ঐ পথে এখনও হা-পিত্যেশ দাঁড়িয়ে আছি।

অমলেশ হাসতে হাসতে বলল, এই ফেরিস্তা-গিরির ধকলে সময় সময় প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ। আমি যদি আত্মকথা লিখতাম, ডিটেকটিভ-নবেল ফেলে লোকে তাই পড়ত।

আবদারের ভঙ্গিতে ফুল্লরা বলে, লিখুন না—

কাঠমুখ্যু মানুষ—লিখব কী করে? লেখার জিনিসও নয়। কর্তারা কায়দাকানুন সব জেনে ফেলবে, বেমক্কা যশ কুড়ানো বন্ধ হবে আমার।

জোড়াপুকুরে পৌঁছে গেল। দামে-আঁটা পাশাপাশি দুই প্রাচীন পুকুর। পুকুরের পাড় ঘেঁসে সদর-রাস্তা মাঠ পার হয়ে সোজা চলে গেছে। রাস্তা ধরে আর নয়। জুজুর ভয়—দুটো মোড় ঘুরে রাস্তার পাশেই মিলিটারি তাঁবু। একটা পিঁপড়ে গলতে দেবে না—হরেক বায়নাক্কা, একগাদা কাগজপত্র দেখিয়ে তবে নাকি ছাড় মিলতে পারে। কে জানে কারা দেয় সে কাগজপত্র, কোনখানে কী পদ্ধতিতে মেলে। অত হাঙ্গামে কে যেতে যাচ্ছে, গরজই বা কি?

জোড়াপুকুরের পাড়ে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে রিক্সা ছেড়ে দিল।

রাস্তা ছেড়ে জঙ্গল-জাঙাল এইবারে। নিরিখ করে দেখুন সার, পথের চিহ্নও পাবেন। পায়ে পায়ে পথ পড়ে গেছে।

উঁচু রাস্তা থেকে অনেকখানি নেমে পড়ল তারা।

অমলেশ বলে, এতক্ষণে এইবারে ঘাটের পথ ধরা গেল। মল্লিকঘাট। ঘাট তো আগুন্তি, কিন্তু মল্লিকঘাটের বন্দোবস্ত আলাদা। এপারে ওপারে ওয়েটিংরুম, একবেলা দু-বেলা দরকার মতন থাকতে পারা যায়। দায়ে পড়লে লোকে বেশিও থাকে। যত্নআত্তি করে—খদ্দেরও তাই বেশি। লড়াইয়ের সময় থেকে বাজার মন্দা চলছে। এমন ঘাটও আছে, দিবারাত্রির মধ্যে খদ্দেরের টিকি দেখা গেল না। কিন্তু মল্লিকঘাটে কাজকারবার কোন সময় বন্ধ নেই। লড়াইয়ের মধ্যেও বন্ধ ছিল না।

ঝিঞ্জিপথ—কোনরকমে এক একখানা করে পা ফেলা যায়। তারপরেই ধানক্ষেত—ধান কেটে নিয়ে গেছে, খোঁচা খোঁচা নাড়া-বন, তার মধ্যে হাঁটা যায় না। আলের উপর উঠে সন্তর্পণে যেতে হচ্ছে।

অমলেশ হেসে বলে, হাঁটায় কত সুখ বুঝুন এইবারে। সে সুখ সার অবধি পাচ্ছেন।

বীরেশ্বর বলেন, এত মানুষের চলাচল—পথটা একটু ভাল করে নিলে তো পারে।

পথ আবার কি! ঘাটের আন্দাজ করে নিয়ে সেইখানে কোনরকমে পৌঁছানো নিয়ে কথা। এই যা দেখছেন—পায়ে পায়ে ঘাসবন মরে এমনি হয়েছে। হাঁটতে পারলেই হল, তার বেশি লাগছে কিসে? বেশি-কিছু হলেই বিপদ। দু'কোদাল মাটি ফেলে পথ যদি একটু চৌরস করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি বসিয়ে পথের মুখ আটক করে দেবে।

বীরেশ্বর পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিলেন, ফুল্লরা পিছন থেকে ধরে ফেলল। তীক্ষ্ণ চোখ রেখে সে দাদুর পিছন পিছন চলেছে।

একবার বলল, চৌরস রাস্তা গাড়ির জন্ত লাগে। পালকি তো সবখানে চলে।

অমলেশ সায় দিয়ে বলে, এখানেও চলে। গাঁ-গ্রামে বিয়ের বরকনের পালকি চেপেই চলাচল।

ফুল্লরা মৃদুকণ্ঠে বলে, দাদুর জন্যে একটা পালকির ব্যবস্থা করলে হত। এখন বোধহয় উপায় নেই।

খোঁজখবর করে পালকি হয়তো এখনো জুটোনো যায়, কিন্তু চাপবার উপায় নেই। ব্লাকের পথে হাঁটতেই হবে, গাড়ি পালকি অচল।

তর্কের সুরে ফুল্লরা বলে, কানা-খোঁড়া কিম্বা বাচ্চা ছেলেপুলে—

অমলেশ বলল, হাঁটবে।

ফুল্লরা বলে, একেবারে বুড়োঅথর্ব, দাদুর চেয়ে অনেক বুড়ো—

ঘাড় কাত করে অমলেশ বলে, হুঁ-উ—

পথের মধ্যে ধরুন অসুস্থ হয়ে পড়ল কোন লোক। ঘোরতর অসুস্থ—

অসুস্থ কেন, ধরে নিলাম মরেই গেছে সে। তবু হাঁটতে হবে। না হেঁটে বর্ডারে হাজির হওয়া চলবে না।

হেসে অমলেশ বলে, ঐ যে মড়াটা কাঁধে চেপে বেরিয়ে গেল, তাই দেখেই তো তাজ্জব লাগছিল আমার।

রহস্যটা প্রাঞ্জল করে দিচ্ছে: বর্ডার আইন রয়েছে—লড়াইয়ের আমল থেকে সে আইন অতিশয় কড়া। বর্ডার-পুলিশ আছে এ-পক্ষের ও-পক্ষের। হালফিল আবার মিলিটারি বসেছে। ফৌজিরা বিদেশি লোক, তোয়াজে থাকে—তাদের এড়িয়ে মাঠে নেমে পড়েছি। কিন্তু পুলিশ কিছুতে এড়ানো যায় না। তবে বন্দোবস্তে আসা যায় বটে। পাকা রকমের বন্দোবস্তই হয়ে আছে —মাছি গলবে না কর্তাদের আইন, এদিকে কিন্তু হাজারে হাজারে হাতি পাচার হচ্ছে। তবে করবেন সেটা চুপিসারে। পালকি চেপে

হুমহাম করে সর্বচক্ষুর উপর দিয়ে বর্ডার পার হচ্ছেন—সেটা হবে দেখিয়ে শুনিয়ে আইন-অমান্ত। গুটগুট করে হাঁটতে হাঁটতে এই চলেছি—বর্ডারে পৌঁছে গেলাম, আস্ত আস্ত মানুষগুলো বর্ডার পার হয়ে বেরিয়েও গেল, পুলিশে তা দেখতে পাচ্ছে না। বন্দোবস্ত ক্রমে ঘাড় ভিন্ন দিকে ঘুরে আছে। ভিন্ন দিকে চোখ তাকিয়ে স্বভাবের শোভা দেখছে।

হাঁটতে হাঁটতে ফুল্লরা খুশিমুখে বলে, এ কিন্তু ভাল—রিক্সা ছেড়ে দিয়ে কেমন বেশ ধীরেসুস্থে যেতে পারছি। এতক্ষণ যাচ্ছিলাম—সে তো যাওয়া নয়, তাড়া করছি যেন কাকে।

অমলেশ টিপ্পনী কাটে: সারকে।

হাসল মুখ টিপে ফুল্লরা। টিপি-টিপি হাসি খাসা দেখায়। অতএব অমলেশ আবার দেখবার জন্য উক্তিটা বিশদ করে: রিক্সা সারকে নিয়ে যেন ছুটে পালাচ্ছে, ধরবার জন্য আমরা দু-জন পিছু পিছু তাড়া করেছি।

তাড়া করেছি ঠিকই—তবে বুড়োমানুষ আমায় কেন ধরতে যাবে?

মুখে হাসি নিয়ে বীরেশ্বরও এবার যোগ দিয়েছেন: না জেনে সত্যি কথাটা বলে ফেলেছ। ধরবার জন্য তাড়াই করেছি—আমি আর আমার নাতনি। হ্যাঁ দিদি, কাকে ধরতে রে?

ফুল্লরা স্বচ্ছন্দে বলে দেয়, দাদুর একটা নাতজামাই ধরতে।

এ কোন নতুন জিনিস নয়। পাকিস্তানে মনোমত হিন্দু পাত্র মেলে না বলে কনে হিন্দুস্থানে পাঠানো হয়। আখছার এমনধারা ঘটে। কিন্তু অবাক লাগছে মেয়েটার সহজ সপ্রতিভ কথাবার্তায়। নিজের বিয়ের সম্বন্ধে সদ্য-পরিচিতের কাছে অবাধে কেমন বলে যাচ্ছে।

ফুল্লরা বলে, নিতান্ত বুনোহাঁস-তাড়ানো ভাববেন না কিন্তু। বরপাত্তোর মোটামুটি ঠিক আছে। হয়েও যেত শুভকর্ম। কিন্তু

কনে চোখে দেখেই তাদের আক্কেল-গুড়ুম—বর্ডার-পারে পালিয়ে আছে।

স্মিতমুখে বীরেশ্বর বলেন, তাই বুঝি! জাঁকজমকে বিয়ে হবে, তাঁদের সেই ইচ্ছে। কিন্তু লড়াইয়ের জন্যে—

লড়াইয়ের জন্যে কোন্‌টা কার আটকে আছে শুনি? মুশকিল হল, দাদু নাতনিকে যে চোখে দেখেন বাইরের মানুষ তেমন এক-জোড়া চোখ পাবে কোথায়? তবে, আমরাও নাছোড়বান্দা। বর্ডারে ছুটেছি—পার হয়ে গিয়ে ক্যাঁক করে ধরব। পাশপোর্ট-ভিসা দিচ্ছে না তো ব্লাকেই পারাপার।

খিলখিল করে উচ্ছ্বসিত হাসি। বলে, পুরাণের সত্যবানের মতন। আহা, কী দুর্ভাগ্য ভদ্রলোকের—যমের হাতে গিয়েও রেহাই নেই, সাবিত্রী সেই অবধি রে-রে করে পড়ল।

বীরেশ্বর তাড়া দিয়ে উঠলেন: অলক্ষুণে উপমা কেন টানিস?

ফুল্লরা বলে, যমের নামে আঁতকে ওঠার কী আছে দাদু? যমা-লয়ের পথ অতি সরল—এই কষ্টের বর্ডার পেরোনো নেই। যে-না-সেই নির্ঝঞ্ঝাটে চলে যাচ্ছে, কথায় কথায় লোকে যমপুরী পাঠায়।

অমলেশ বলে, বর্ডারে পেরোনোও কষ্টের নয়। যে-না-সেই চলে যাচ্ছে নিত্যিদিন। কষ্টের হলে এগোত না। এতক্ষণ ধরে বলছি কী তবে! কানে নিলেন না বোধহয়। কিম্বা কানে শুনেও বিশ্বাস করেন নি। বেরিয়েছেন যখন, হাতে-কলমে দেখবেন। পথ কে রুখতে পারে? আইনে পথ বন্ধ হয় না—দুনিয়ার কোনো দেশে পারে নি। ঘর থেকে বেরুলেই দেখবেন, পথ আপনাআপনি পায়ের নিচে চলে আসছে।

দুপুর গড়িয়ে আসে। মজা-খালে মাছ ধরছে খানিকটা জায়গার জল সেঁচে ফেলে। হৈ-হল্লা বিস্তর—মাছ উঠছে দৈবে-সৈবে পুঁটিটা কি খলসেটা। অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে দেখছে, তার মধ্যে থেকে হঠাৎ একজন মাঠ ভেঙে চলল।

হল কি জব্বর মিঞার? যায় কোথা?

মাছ গাঁথছে না, জব্বর ওদিকে দেখ মক্কেল গেঁথে ফেলেছে। একটা নয়, তিন-তিনটে। ছুই দেখ।

ঠাহর করে দেখে অন্তেরা চুকচুক করে: তাই বটে, নজর কী চোখা! আমাদের নজর মাছের দিকে, জব্বরের নজর সারা মাঠে পাকচক্কোর দিচ্ছিল তখন।

অনেক দূরে জঙ্গুলে সুঁড়িপথে তিন প্রাণীকে দেখা যাচ্ছে বটে—ফুল্লরারা তিনজন। জব্বর মিঞা তীরবেগে ছুটেছে।

অমলেশ সর্বাগ্রে দেখল। দেখতে পেয়ে ফুল্লরার দিকে চোখ টিপল: বলেছিলাম না? আমরা খুঁজব না, তারাই তেড়ে এসে ধরবে। দালাল। রকমফের আছে দালালের—এ সব টৌর্নি-দালাল।

কোর্টে এক জাতীয় লোক আছে, টৌর্নি বলে তাদের। কারো মাইনের লোক নয়, স্বাধীন জীবিকা। হাবাগবা ভালোমানুষ আপনি—মামলায় পড়ে আদালতে দাঁড়িয়েছেন—মুখ দেখেই টৌর্নিরা কেমন টের পেয়ে যায়। উকিল-মোক্তারের কাছে নিয়ে হাজির করবে। কেস আপনি ঠিক মতো বোঝাতে পারছেন না—সে বুঝিয়ে দেবে উকিলকে। কোর্টফি-ডেমি-ডাব-পান-চা-সিগারেট যখন যেটা প্রয়োজন, ছুটোছুটি করে এনে দেবে। কাজ অন্তে কমিশন যৎকিঞ্চিৎ দেবেন—মক্কেল-উকিল উভয় তরফ থেকেই।

মক্কেলের ঠেলায় যে উকিল নিশ্বাস ফেলতে পারেন না, কমিশন তিনিও দেবেন। রেওয়াজ তাই।

জব্বর মিঞা আলের উপর উঠল।

রাকের নিয়মকানুন অমলেশের নখদর্পণে। আগের কথার জের ধরে সে বলছিল, যমালয়ের তুলনা দিচ্ছিলেন—যে পথ সরল তো বটেই, কিন্তু বর্ডারের পথেও কিছুমাত্র বাঁকচুর নেই। কার কতটুকু করণীয়, পথের বহুদর্শী সুহৃদরা বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে—কাজকর্ম সেইজন্য যন্ত্রবৎ চলে। নিজে বুদ্ধি খরচা করতে গেলেই গণ্ডগোল। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে যান, নির্বিঘ্নে ওরা পারে তুলে দেবে।

কাছে এসে জব্বর মিঞা একগাল হেসে বলে, কুটুমবাড়ি যাচ্ছেন তো? চলে আসুন।

এই জিনিসও অমলেশ ফুল্লরাকে বলেছিল। দালাল খুঁজতে হয় না—আপনি এসে পড়ে। অগুন্তি লোক করেকম্মে খাচ্ছে—ঘাট অবধি পৌঁছে দেওয়া তাদের কাজ।

ঘাটে পৌঁছতে দালাল কেন নিতে হবে, ফুল্লরার মাথায় আসে নি। বিশেষ করে অমলেশের মতন মানুষ যখন সঙ্গে।

প্রশ্ন করেছিল: ঘাটে আপনার এত চেনা-জানা, খবরের-কাগজ পড়তে হামেশাই তো গিয়ে থাকেন—

বটেই তো। আর চেনা-জানা না থাকলেই বা কি? তেরো-শ মাইল বর্ডার দুই বাংলার মাঝে, ঘাট কমসে-কম তিন-চার শ। বর্ডার নিরিখ করে হাঁটলেই কোন-না-কোন ঘাটে পৌঁছে যাব। সব ঘাটেই পারাপারের ব্যবস্থা। ঘাটোয়াল রয়েছে সেইজন্যে।

ফুল্লরা বলেছিল, তবে? দালাল না-ই বা নিলাম। বিনি দালালে গড় গড় করে চলে যাবো।

অমলেশ বলেছিল, চন্দ্রনাথ কি কালীঘাটের মন্দিরে যাত্রীরা

গড় গড় করে চলে যেতে পারে। তবু পাণ্ডা ধরে কেন? কিছু খরচার ব্যাপার বটে, কিন্তু সুবিধাও বিস্তর। মাঝের কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না, পাণ্ডারা সরাসরি ঠাকুরের চরণতলে হাজির করে দেয়।

বিনি দালালে কী রকম দুর্গতি ঘটে, অমলেশ সবিস্তারে বলতে বলতে চলল—

দালাল না নিয়ে আপনি নিজের ভরসায় চলেছেন, অঞ্চলের মানুষ কেমন করে যেন টের পেয়ে যায়—টগবগ করে উথলে ওঠে দেশপ্রেম।

ভেবেছেন কি শুনি? পাকিস্তান ছেড়ে পালাচ্ছেন—সরকারি অনুমতি আছে? পাশপোর্ট-ভিসা কই?

আপনি তো আকাশ থেকে পড়বেন এবার: সে কী কথা! ভিটেমাটি ছেড়ে কোন চুলোয় যেতে যাবো ভাই? কুটুম্ববাড়ি এই দিকে, ছেলের অন্নপ্রাশনে তারা দাওয়াত করেছে।

কে কুটুম্ব, নাম কি সে-মানুষের? বাড়ি কোন্ গাঁয়ে?

এই অবস্থায় চটেমটে ওঠা ছাড়া উপায় কী আপনার!

জেবার ধার ধারিনে। কে বট হে তুমি, জাহাজ থেকে কোন ব্যারিস্টার সাহেব নেমে এলে? ঠোঁটে এই কুলুপ আঁটলাম—এক-আধলাও আর জবাব দিচ্ছিনে।

দিও না তবে—না দিয়ে যদি পারো, কেন দিতে যাবে? আমরাই তবে সাথেসঙ্গে যাই, গিয়ে সেই কুটুম্বর তত্ত্বতালাস নিয়ে আসি।

আশাহত দালালের কণ্ঠ রীতিমত খর। গোলমালে চারিদিক থেকে রে-রে করে লোক এসে পড়ে। নানা মুখে রকমারি টিপ্পনী: যত কুটুম্ব বুঝি বর্ডারে গিয়ে বসত গেড়েছে। গোটা মুলুক ফাঁকা করে ফেলল গো! টাকাকড়ি গয়নাগাটি জিনিসপত্তোর মায় মাছিটা পিঁপড়েটা অবধি পাচার হয়ে গেছে, মানুষ ক'টা কেবল

বাকি—হেলতে-দুলতে তাঁরাও এবারে বর্ডারে চললেন। সেটি হচ্ছে না বাছাধন। জবাব মানুষের কাছে না দিক, সরকার যাদের পাহারায় রেখেছে—আখমাড়াই কলে ফেলে তারাই জবাব আদায় করে নেবে।

গণ্ডগোল জমে উঠল। বর্ডার-পুলিশ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, চৌকি যত্রতত্র। তার উপর ক্যাম্প খাটিয়ে মিলিটারি ফৌজও কিছু মোতায়েন আছে। এমনি হয়তো দেখতে পেতো না—'হয়তো' কেন, কদাপি দেখত না। বন্দোবস্ত অনুযায়ী দেখে না এসব কিছু। কিন্তু কলহ ও টানাটানি করে সটান একেবারে চোখের উপর নিয়ে তুললে না দেখে বেচারাদের উপায় কী? এবং সেই দেখাশুনোর পর বিপদ কতদূর গড়াতে পারে, ঠিকঠিকানা নেই। হাজতে নিয়ে আটকাবে, কোর্টে নিয়ে তুলবে। এমন কি বোঁ করে গুলি এসে গোড়াতেই মাথার খুলি ছিদ্র করে দিতে পারে। কাজ কি এত সব হাঙ্গামায়, বিশেষত খরচা যখন পাহাড়-পর্বত কিছু নয়। যেই দেখলেন দু-পাটি দন্ত মেলে একজন-কেউ এগিয়ে আসছে, আপনিও চকিতে আড়নয়ন হেনে দেবেন। ব্যস, দালালের হাতে গিয়ে পড়লেন, দায়-দায়িত্ব ষোলআনা এখন সেই দালালের।

ঘাট এখনো বিস্তর দূর—পথের মধ্যে কতজনারই তো দৃষ্টি-গোচর হবেন। দালাল আগলে নিয়ে আসছে— সে-ক্ষেত্রে তাকাবেই না কেউ ভাল করে, চোখ ফিরিয়ে নিজকর্মে চলে যাবে। বড়জোর একটা নিশ্বাস চেপে নেবে বুকের মধ্যে: আহা রে, দিব্যি মক্কেল বাগিয়ে নিয়ে চলল—আমরা কেবল ভেরেণ্ডা-ভেজে মরি! তীর্থক্ষেত্রেও এই জিনিস—এক পাণ্ডার কবলিত যাত্রীর সম্পর্কে অন্য পাণ্ডার হুবহু এই মনোভাব।

কত মজার মজার নাম শুনি এখন—ব্লাকে চলাচল তার একটি। অমলেশ বোঝাতে বোঝাতে আসছিল—কেমন সে বস্তু, কী তার

পদ্ধতি। হেনকালে দালাল এসে ধরল : মল্লিকঘাটে তো? চলে আসুন।

অমলেশ ধমক দিয়ে ওঠে : কোথায় থাকো তোমরা? মানুষ এসে পথে পথে ঘোরেন। দিনকাল ভাল না, ফৌজ বসিয়েছে। হঠাৎ যদি বেদরদির হাতে গিয়ে পড়েন, লোকে তো তোমাদেরই দুষবে।

জব্বর বলে, মক্কেল বলে বুঝি কি করে বড়রাস্তার উপরে? কোন জন সাদা-পথে যাচ্ছেন কোন জন ব্লাকের পথে, গায়ে কিছু লেখা থাকে না। মাঠে নামলে তবেই বুঝতে পারি।

অমলেশ বলল, নতুন মানুষ এঁরা—পয়লা এই পার হতে এসেছেন। আনোয়ার কাজির অফিসে নিয়ে যাও। দেখেশুনে খুব সামাল হয়ে যাবে।

ফুল্লরাকে বলে, ব্যাগটা জব্বরকে দিয়ে দিন। ছুটকো-ছাটকা মাল ওরাই বয়ে দেয়। পাকা মানুষ জব্বর, নির্ভাবনায় চলে যান। আমি ফিরি। সাইকেল রেখে এলাম—বাস না পেলে হাঁটতে হাঁটতে শহর অবধি যেতে হবে।

ঘাড় হেঁট করে হাত বাড়িয়ে বীরেশ্বরের পদস্পর্শ করল।

দ্বিধা কাটিয়ে বীরেশ্বর বললেন, বলা অনুচিত হবে জানি। কিন্তু গরজ বড় বালাই। নাতনি সঙ্গে বলেই ভাবছি। ঘাট কি অনেক দূর?

তাচ্ছিল্য ভরে অমলেশ বলে, দূর কোথা? বড়-রাস্তা ধরে গেলে ঠিক আট মাইল। আড়াআড়ি মাঠ ভেঙে বিল পাড়ি দিয়ে যাবেন—ওর অর্ধেক পথই ধরে নিন। না হয় কিছু বেশি।

সেই বা কম কি!

বলে বীরেশ্বর চুপ হয়ে গেলেন।

জব্বর অমলেশকে বলে, আপনিও চলেন তবে। মুরুব্বি মশায়ের মনোগত [illegible]টা তাই, মুখ ফুটে বলছেন না। হাঁটা বই তো নয়—পায়ে হাঁটায় ভয় করেন?

চলো। জরুরি কাজ ছিল একটা—

কাজ আপনার কখন নয়? কাজ নেই, কোনদিন তো শুনলাম না।

অমলেশও অতএব চলল।

জব্বর মিঞা আগে আগে—ফুল্লরার স্যুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে, নিজের পুঁটলি বগলে। মৃদু কণ্ঠে আবার গল্প ফুল্লরা ও অমলেশে।

ফুল্লরা বলে, অবাক লাগছে। ফিরে এসে আমরাও আপনার যশ গাইব—শতকণ্ঠে। ঘরের খেয়ে বনের-মোষ তাড়ানোর এমনটি আর দ্বিতীয় নেই। কাজকর্ম ছেড়ে হেঁটে হেঁটে আমাদের সঙ্গে সেই কোন মুলুকে চললেন।

অমলেশ বলে, নিতান্ত মোষ তাড়ানো নয় কিন্তু। স্বার্থ আছে, ঘাটের ওয়েটিংরুমে গিয়ে খবরের-কাগজ পড়ে আসি। আজকে না গেলেও দু-চার দিনের মধ্যে যেতাম ঠিক। না গিয়ে কেমন করে বাঁচি? ওপারের ওদের ভুলে থাকি কেমন করে?

টিলার উপরে তেঁতুলগাছ জামগাছ কাঁঠালগাছ—নিরিবিলি আড়াল জায়গা। জব্বর মিঞা থেমে দাঁড়াল। পুঁটলি খুলে চেক-কাটা লুঙি বের করে বীরেশ্বরকে দিল। বলে, সাজ-পোশাক করে আসুন মুরুব্বিমশায়। আমরা এখানটা দাঁড়াই।

সবিস্ময়ে অমলেশ বলে, এসব কেন?

দালাল বলল, মুরুব্বিমশায় যে ধুতি পরে রয়েছেন। ধুতি-পরা মানুষ বর্ডার মুখো চলেছেন, নজরে ভাল লাগবে না।

অমলেশের আপাদমস্তকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, আপনার এই পাজামা-হাওয়াইকামিজ খাসা জিনিস—মোসলমান না হিঁদু পাকিস্তানি না হিন্দুস্থানি আলাদা করে ধরবার জো নেই। মেয়ে-মানুষ বলে দিদিমণিরও শতেক খুন মাপ, কাপড়-চোপড় যেমনি হোক কেউ তাকিয়ে দেখবে না।

অমলেশ বলে, ধুতি-পরা মানুষ সোজা এসে ঘাটের ওয়েটিংরুমে ঢুকল, হরদম আমি দেখে থাকি। পোশাক বদলানো আগে তো লাগত না।

জব্বর বলে, এখনই যে লাগবে তা-ও কিছু দিব্যি দেওয়া নেই। তাঁবু খাটিয়ে ঘাটের কাছাকাছি বেলুচ ফৌজ বসিয়েছে। তারা জাত নয় জ্ঞাত নয়, কথাবার্তা বোঝে না কিছু। কোন্ ফ্যাসাদে নিয়ে ফেলে, চলাফেরায় আমরা তাই বেশি বেশি সামাল হয়ে গেছি। একটা-কিছু ঘটে গেলে বদনাম তো আমাদেরই উপর অর্শাবে।

লুঙ্গি পরে বৃদ্ধ রায়মশায় তেঁতুলতলা থেকে বেরিয়ে এলেন। জব্বর মিঞা টুক করে নিজের মাথার কিস্তিটুপিটা বীরেশ্বরের মাথায় চাপিয়ে একগাল হেসে বলে, বেড়ে দেখাচ্ছে। হজ করে মুরুব্বিমশায় টাটকা যেন দেশে ফিরছেন। আর কি, এগোনো যাক এইবারে নির্ভাবনায়।

চলেছে, চলেছে। পথের যেন শেষ নেই। হাটবাজার দোকানপাট তুলে দিয়েছে বর্ডারের এইসব অঞ্চলে। তার উপর কার্ফু—বর্ডার থেকে পাঁচ মাইল অবধি। বেলা ডুবলে চলাচল বে-আইনি। বসত-ভিটা কাউকে ছেড়ে যেতে বলে নি, কিন্তু এ যেন হল—খেদাইনে, তোর উঠোন চষি। কী খেয়ে থাকে মানুষ ভিটের উপর? সন্ধ্যে হতে না হতেই কাজকর্ম ছেড়ে ঘরের হুয়োর আঁটতে হবে—বারো মাস তিরিশ দিন চলে কেমন করে? অতএব মানা না থাকলেও বর্ডারের বসত ছেড়ে প্রায় সব ভিতর-অঞ্চলে চলে গেছে। আত্মীয়ের ঢেঁকিশালে বা গোয়ালঘরে সপরিবারে ঠাঁই নিয়েছে। নারকেল-পাতার ছাউনি অস্থায়ী ঘরও বেঁধে নিয়েছে কেউ কেউ—সামান্য খরচার পলকা ঘর। বড়-কর্তাদের মনের গরমটা কাটলে আবার তো সব নিজ নিজ ভিটেয় ফিরে আসবে, চিরস্থায়ী মজবুত ঘর লাগছে তবে কোন্ কর্মে?

এর মধ্যে নিতান্তই নিরুপায় যারা, তেমনি দু-দশ ঘর গৃহস্থ চোখ-কান বুজে আছে কোন রকমে বাস্তুভিটায় পড়ে। দিন চালানো বড় কষ্ট তাদের।

চার প্রাণী চলেছে। গাছগাছালির মাথায় সূর্য। জব্বর ক্ষণে ক্ষণে সেদিকে তাকায়, আর ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অমলেশকে বলে, তাড়িয়ে চলেন সাহেব। মুরুব্বির এতখানি বয়স হয়েছে, তিনি তো খাসা যাচ্ছেন। বড্ড ভিটির-ভিটির করেন আপনারা। ফৌজ ঘোরাঘুরি করে, খেয়াল রাখবেন সেটা। তার উপরে পরীর পারা কন্যে—নজর এমনিতেই তো টেনে ধরে। ঘোর হবার আগে আগে ঘাটে গিয়ে উঠি। তামাম রাত্তির পড়ে রইল—ঘাটের ঘরের মধ্যে নির্ভাবনায় বসে কথাবার্তা কেন, ঝগড়া-কোন্দল ঘুসোঘুসি-লাঠালাঠি যেমন ইচ্ছে করবেন।

এত ভয়ে বলছে জব্বর, ফুল্লরার কানে ঢোকে না। ভয়ও মানে না। অমলেশেরও কথা বন্ধ নেই। বয়সটা খারাপ বড্ড—দু-জনেরই। তবে অভিজ্ঞ অমল জব্বরের প্রতিটি কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছে: হাঁ-হাঁ, সত্যি কথা। বেলা ডুবে যাবার পরে মানুষ দেখতে পেলেই গুলি। উপর থেকে ঢালাও হুকুম—কোনরকম বাছবিচার নেই। রাত্রে হরদম গুলি চলে, এদিক-সেদিক আওয়াজ হচ্ছে, শুনতে পাবেন।

হাসতে হাসতে বলে, তবে মানুষ মরেছে—কখনো শুনি নি। যদি অবিশ্যি বলেন, মড়া সঙ্গে সঙ্গে সাফাই করে ফেলে—

জব্বর আপত্তি করে বলে, তা কেমন করে? এপার-ওপারের খবর সমস্ত কানে আসে—মানুষ নিখোঁজ হয়েছে, এমন কথা কেউ বলে না।

ফুল্লরা মুখ টিপে হেসে বলে, বন্দুকের তাক ফসকে যায়—তা ছাড়া কী বলবেন?

অমলেশও জুড়ে দিল: তাক ফসকানোয় ওদের আশ্চর্য দক্ষতা। এত কালের মধ্যে একটা গুলিও কখনো লক্ষ্যভেদ করে নি। এপাশ-ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ফুল্লরা বলে, অথচ লড়াইয়ের ফৌজও তো রয়েছে। টার্গেট প্র্যাকটিশ করে করে হাত পাকানো। বর্ডারের বেলা কেঁপে যায় সে হাত—কাঁপানোর বন্দোবস্ত আছে কি না।

বন্দোবস্ত আছে ঠিকই—

অমলেশ আর হাসছে না এখন, কণ্ঠস্বর গভীর হয়েছে। বলে, বন্দোবস্ত ছাড়াও কিছু আছে। পুলিশ-সিপাহি হয়েও, পিণ্ডি-দিল্লির মসনদের বাদশা নয় এরা—সামান্য সাধারণ মানুষ। দিল্লি-পিণ্ডির কি—হুকুম একটা ঝেড়ে দিলেই হল। বর্ডার পেরুনো নিজেদের যদি গরজ পড়ে, ঠোঁট ছেড়ে কথা না বেরুতেই উড়ে যাবার দরাজ ব্যবস্থা হয়ে যাবে—গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। এরা তা নয়—মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ায়, মানুষের দুঃখ-ধান্দা চোখে দেখে। দেখেশুনে আইনের ধার ভোঁতা-ভোঁতা ঠেকে এদের মনে, অক্ষরে অক্ষরে হুকুম তামিলের জন্য মনের মধ্যে তাগিদ পায় না।

কয়েক পা চুপচাপ গিয়ে অমলেশ আবার বলে, পৃথিবীর দেশে দেশে যেখানে যত বর্ডার টেনেছে—দেখুন গিয়ে, এই একই রকমের ছলাকলা। আইন যত কড়া, স্মাগলিং তত জোরদার। হবেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে ভাবা গিয়েছিল, দুনিয়া এক হয়ে যাবে, মানুষ হবে বিশ্ব-নাগরিক। ঠিক উল্টো—রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা পৃথিবী আর মানুষ ক্রমাগত খণ্ডবিখণ্ড করে চলেছে। মানুষের মঙ্গল দেখা আইনের কাজ—বেআইনি আইনগুলো একটু-আধটু যা রুখছে, সে কেবল স্মাগলাররাই। জনতার কাছে তারা অতি-প্রিয় বীর। চার্লস ল্যাম্ব বলতেন অনেস্ট থিফ তারা—সাধু-চোর।

দুম করে গুলির আওয়াজ। চমক খেয়ে কথাবার্তা কেঁপে গেল। এক বারে শেষ নয়—দুম দুম করে বার পাঁচ-সাত চলল।

ফুল্লরা বলে, কী কাণ্ড! আজকে একেবারে দিনমানেই।

জব্বর মিঞা বলে, এপারের কিছু নয়, ওপারে—হিন্দুস্থানে। ঘাট ওই সামনে, পার হলেই হিন্দুস্থান। বন্দুক কেন, ওপার থেকে জোরে জোরে হাক পাড়লেও কানে আসবে।

অমলেশ ফুল্লরাকে বলে, যত কাছে ভাবছেন, তা অবিশ্যি নয়। দু-মাইল তিন মাইল দূরের হলেও ঘাটের উপরে মনে হবে, কানের কাছে দাঁড়িয়ে আওয়াজ করছে।

বীরেশ্বর এতক্ষণে কথা বলে উঠলেন: ভারতের আইন তবে দেখছি পাকিস্তানের চেয়েও কড়া। এরা রাত্রে গুলি ছোঁড়ে, ওপারের বুঝি ততটুকুও সবুর সইছে না?

কিসের দেওড় হতে পারে, কার্ফু তো লাগে নি এখনো—সেই সমস্ত আলোচনা।

ফুল্লরা বলে, শিকারে নেমেছে কারা—পাখি-টাখি মারছে।

তাই বা কী করে হয়? বর্ডারের এলাকা ছাড়িয়ে একনাগাড় গাঁ গ্রাম, এবং তার পরে মহকুমা-শহর। পাখি-শিকার তার মধ্যে চলে না।

কিসের দেওড় তবে অতবার?

কী হল ওপারে?

কথাবার্তায় মত্ত এরা সকলে। জব্বর মিঞা কিছু এগিয়ে পড়েছিল। দাঁড়িয়ে পড়ল সে এক সময়: ঘাটে এসে গেছি।

মস্তবড় বাগিচা। এক প্রান্তে আটচালা ঘর, মাটির পাঁচিলে ঘেরা কম্পাউণ্ড। শ্রীধর মল্লিকের কাছারিবাড়ি হয়েছিল, ঘাটের ওয়েটিংরুম এখন।

ফুল্লরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে: মল্লিকঘাট এই?

ঘাড় কাত করে দালাল সায় দিল। বীরেশ্বরকে বলে, আমার কাজ হয়ে গেল। লুঙ্গি-টুপি ফেরত দেন কর্তা, টাকা পয়সা চুকিয়ে দেন।

ফুল্লরা এদিক-সেদিক উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে : ঘাট কোন্ দিকে ?

ফুল্লরার বাধছে কোথায়, অমলেশ বুঝেছে। রহস্য না ভেঙে সংক্ষেপে সে জবাব দিল : এই তো—

জিনিসটা একেবারে দুর্বোধ্য ফুল্লরার কাছে। নদী পড়ে মরুক, একটা খালের রেখা দেখা যায় না কোনদিকে। অথচ ঘাট নাকি এখানেই—ঘনপত্র ঐ গাছগুলার শিকড়বাকড়ের মধ্যে অথবা বাতাসে আন্দোলিত চারিদিককার মটরক্ষেতের ভিতরে। যে ঘাটের উদ্দেশে এতক্ষণ ধরে এত কষ্টের পথ ভেঙে অবশেষে এসে পৌঁছল।

হতভম্ব ভাব দেখে অমলেশ হাসছে। জোর দিয়ে বলে, পার-ঘাটা। যেখানটা এই দাঁড়িয়ে আছি। পারের জন্য এই জায়গাতেই নেমে পড়ব আমরা। আর ওপারের ঘাট দেখুন ঐ তাকিয়ে। দোমহলা অট্টালিকা—গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে।

বীরেশ্বরকে বলে, ঢুকে পড়ুন সার। বুকিং-অফিস ওয়েটিং-রুম, সমস্ত বাড়ির ভিতরে। ওপারের অফিসও উই যে দেখা যায়—মল্লিকঘাটের হেড-অফিস। খোদ শ্রীধর মল্লিকের আস্তানা। কত মতলব নিয়ে কতজনা আসে যায়—একদল পার হয়ে এই ঘাটে এসে উঠল, আর একদল নেমে চলল ওপার পানে। দায়ে-বেদায়ে পড়েও থাকে কেউ কেউ, সে বন্দোবস্ত রয়েছে। এলাহি কাজ-কারবার।

জব্বর মিঞা দালালি মিটিয়ে নিয়ে সেলাম করে চলে গেল। সারা পথ বড্ড তাড়িয়ে এনেছে, বেলাবেলি পৌঁছে গেছেন সব। চিকচিকানি রোদ আছে। আপাতত নিশ্চিন্ত।

ভিতর দিকে অমলেশ হাত বাড়িয়ে দিল : আসুন চলে আপনারা—

॥ সতেরো ॥

মল্লিকঘাট। খেয়ার মাঝি পারানি নিয়ে এপার-ওপার করে —এ ঘাটেও তাই। তবে জলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, মাঠের উপর দিয়ে পারাপার। ঘাটের ইজারাদার—হাঁ, খেয়াঘাটের রেওয়াজ মাফিক ইজারাদারই বলতে হবে—শ্রীধর মল্লিক। প্রতিবছর ঘাটের ডাক হয়, মল্লিকের কাছে কেউ ডাক পায় না। সকলের সঙ্গে দহরম-মহরম—আসেও না কেউ ডাকাডাকি করতে। এবং সবাই জানে, মল্লিক যতদিন এ-লাইনে আছেন, ঘাট তাঁর হাত থেকে ফসকাবে না। থানা-পুলিশের বিশেষ নেকনজর—এপার-ওপার উভয় পারেরই। ঘাটের নাম তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে-গেঁথে গেছে—মল্লিকঘাট নামে ঘাটের পরিচয়। ঘাটোয়াল হপ্তায় হপ্তায় সুগোপনে যথাস্থানে খাজনা পৌঁছে দেবেন, এই নিয়ম। হেরফের হলে রক্ষে নেই, পরের হপ্তা থেকেই পুলিশের ধরপাকড়।

কিন্তু মল্লিকঘাট নিয়ে এসব কথা ওঠে না। বর্ডারের আগা-পাস্তলা তো ঘাট—কিন্তু এত ইজ্জত কারো নয়। নিখুঁত বন্দোবস্ত। কোন্ ঘাটে পার হব, অভিজ্ঞের কাছে পরামর্শ নিতে যান—এককথায় সকলে মল্লিকঘাটের নাম বলবে।

পাঁচিল পার হয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেছেন। আনোয়ার হুঁকো টানছিল, হুঁকো রেখে তাড়াতাড়ি এসে আহ্বান করে: আসুন, বসুন। জেনানাদের আলাদা জায়গা, পাশের ঐ ঘর। এখন কেউ নেই, একলা চুপচাপ ভাল লাগবে না। এখানেই বসতে পারেন। বসুন তাই, ভিড় হলে চলে যাবেন।

বীরেশ্বরকে বিশেষ আপ্যায়ন করে: তামাক ইচ্ছে করেন না কি? হবে তাই—আলাদা হুঁকোর বন্দোবস্ত।

অমলেশের দিকে চেয়ে বলে, আপনাদের চলবে না জানি। হুঁকো তো উঠেই গেল। কী সুখ যে পান বিড়ি-সিগারেট টেনে। আমার তো গলার মধ্যে কুটকুট করে।

কলকে নামিয়ে রেখে এসেছিল আনোয়ার, সম্মতি পেয়ে আলাদা এক হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে নিয়ে এলো। বলে, দুই হুঁকোর বন্দোবস্ত—মোসলমানের হুঁকো, হিঁদুর হুঁকো। আপনাদের হুঁকো শুকনো। পানি নিয়েই যত বায়নাক্কা—এর হুঁকো ওর মুখে উঠবে না। আপনাদের হুঁকোটা তাই শুকনো করে রাখি। ইচ্ছে হয় তো নিজের হাতে পানি ভরে নেবেন। পানি ঢেলে ফেলে আবার আমরা শুকনো করে রাখব।

মস্তবড় ঘর, মাছুর ও হোগলার পাটি মেজের আধাআধি বিছানো। জন পাঁচেকের একটা দল বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। পারে যাবে এরাও—কিম্বা হতে পারে, এসেছে হিন্দুস্থানের পার থেকে, ছুটোছুটির ধকলে চোখ বুঁজে বিশ্রাম নিচ্ছে খানিক।

অমলেশ বলে, মুসলমান না হয়ে যদি শুধু হিন্দুই হত, সেক্ষেত্রেও এমনি ধারা দুই হুঁকো। বসিরহাট অনন্ত ঠাকুরের হোটেলে হুঁকোর রেওয়াজ আছে আপনাদেরই মতন। খদ্দের গেলে হুঁকো এগিয়ে দেয়। কড়ি-বাঁধা হুঁকো ব্রাহ্মণের, কড়ি যার নেই সে হল কায়স্থের। তাই দেখুন, গাঁ-ঘরের উনকুটি জাত পথে পা দিয়েই দুয়ে গিয়ে ঠেকেছে—ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ। গলার যার পৈতে সে হল ব্রাহ্মণ, পৈতে না থাকলে কায়স্থ। কিন্তু এই বা আর কদ্দিন ?

হেসে উঠে আবার বলে, দু-রকম হুঁকোই বাতিল হয়ে যাচ্ছে—আনোয়ার মিঞা বললেন। দ্বি-জাতিরও পরিণাম তাই। বাতিল অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল, কলে-কৌশলে পিছিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কদ্দিন ?

মাছুরে পা ছড়িয়ে বসে বীরেশ্বর মউজ করে হুঁকো টানছেন। ফুল্লরা কোণ ঘেঁষে বসে পড়েছে। অমলেশের পুরানো জানাশোনা

—কুশল-সম্ভাষণ হচ্ছে আনোয়ারের সঙ্গে : কাজ-কারবার ভাল তো মিঞা ?

আনোয়ার বিমর্ষমুখে বলল, ঘাট খাঁ-খাঁ করছে—ভাল কেমন, চোখেই তো দেখতে পাচ্ছেন। শতেক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে মানুষ একটুখানি সুখসুবিধা করে নিচ্ছে, তাতেও কর্তাদের চোখ টাটায়। এপারে-ওপারে নিজেরাই একরকম ফয়শালা করে নিয়েছি, দিল বেমক্কা লড়াই লাগিয়ে। লড়াই জমল না, কিন্তু জের কিছুতে মিটতে দেবে না। ক্যাম্পে ক্যাম্পে ফৌজ—এ তল্লাটে ছিল না, নতুন এনে মোতায়েন করেছে। পথে-ঘাটে গঞ্জে-বন্দরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে বন্দুক উঁচিয়ে। লোকে ভয় পেয়ে যায়, দায়ে না পড়লে পার হতে বেরোয় না। নইলে মল্লিকঘাটের এমন দশা দেখেছেন এর আগে ?

অমলেশের প্রবোধ ছিল : সুমুখ-জ্যোৎস্না রাত—পারাপারের বিস্তর দেরি। সময়ে এসে সব জুটবে।

আসবে ক-জনা আর ? ভাব দেখে আমরা বুঝতে পারি। আগে পাঁচ-সাত খেপেও সারা হত না, এখন একটা খেপও ভাল করে পোরে না। গোদের উপর বিষফোঁড়া—ওপারেও ধুন্ধুমার লেগেছে ক'দিন থেকে। মল্লিকঘাটেরই এলাকার মধ্যে।

বীরেশ্বরের হুঁকো-টানা থেমে গেল। স্তম্ভিত হয়ে বলেন, কী হল আবার ?

আনোয়ার বলে, এই তো খানিক আগে দুমদাম একচোট গুলি চলল। গুলিই চালাক কিম্বা কাঁদুনে-গ্যাস ফাটাক। কাজ-কারবার শিকেয় উঠবার গতিক। বেশিদিন এমন চললে হাত-পা ধুয়ে বাড়ি গিয়ে উঠব। আর মল্লিক-দা তো বাড়ি-ঘরেই রয়েছেন—দুয়োরে হুড়কো এঁটে দিলেই হয়ে গেল।

বীরেশ্বর ব্যাকুল হয়ে বলেন, কী সর্বনাশ! নাতনি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি—ওপারে হল কী হঠাৎ ?

অমলেশ বলল, আসতে পারি নি, অনেকদিন তাই কাগজ পড়া হয় নি। বের করুন তো মিঞা-ভাই, কী গণ্ডগোল দেখি।

আনোয়ার কোথা থেকে একগাদা খবরের-কাগজ বের করে আনল। একটা কাগজ ফুল্লরাও হাতে তুলে নিয়েছে।

সবিস্ময়ে ফুল্লরা বলে, পেলেন কোথা? এসব কাগজ পাকিস্তানে তো আনবার আইন নেই।

আনোয়ার বলে, পাকিস্তান কে বলল? পাকিস্তান হিন্দুস্থান কোনটাই নয়—এ হল বর্ডার-জায়গা।

হেসে অমলেশ টিপ্পনী কাটে: স্বর্গ নয় মর্ত্য নয়—ত্রিশঙ্কু যে জায়গায় চক্কোর খাচ্ছিলেন।

আনোয়ার ফলাও করে বোঝাচ্ছে: এখানকার আলাদা আইন। হরেক জিনিস আসে এখানে, হরেক জিনিস পাচার হয়ে যায়। খবরের-কাগজ দেখে অবাক হচ্ছেন। গোটা পাকিস্তানে যা নেই, হিন্দুস্থানের এমুড়ো-ওমুড়ো ঘুরে যা মিলল না—খোঁজ নিয়ে দেখুন, বর্ডারে মিললেও মিলে যেতে পারে। অগুন্তি মানুষ এই কাজ নিয়ে আছে, অগুন্তি মানুষ উপকার পাচ্ছে।

অমলেশ উলটে-পালটে কাছাকাছি তারিখের ক'খানা কাগজ আলাদা করছে। বলল, স্মাগলারে আর কাস্টমসে সর্বদেশে লড়াই—চিরকালের লড়াই। এক রকমের ফিকির ধরে ফেলল তো নতুন নতুন আরও বিশটা ফিকির মাথা দিয়ে বের করছে। ক'টা ধরবে?

ফুল্লরা বলে, এত স্মাগলিং-এর কথা বলছেন, কাগজে কই তো তেমন দেখিনে।

তার মানেই ব্যবসা খুব ভাল চলছে। মজাই এই। সব চেয়ে ঘাগি স্মাগলার—চিরকাল ধরে সেই লোকই হয়তো স্মাগলিং-এর গালিগালাজ করে গেল। হতে পারে সেই লোকই আবার

কাস্টমসের বড়কর্তা। এক সংসারে থেকে স্ত্রী পর্যন্ত স্বামীর পেশার খবর জানতে পারল না।

একটা কাগজ নিয়ে বীরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে অমলেশ বলল, পড়ছি শুনুন :

॥ বিক্ষুব্ধ ছাত্র-মিছিলের উপর গুলি ॥

খোলা বাজারে চাউল দুষ্প্রাপ্য, কালোবাজারে অফুরন্ত। আড়াই টাকা কে-জি। গমের আংশিক রেশন, তাহার সরবরাহ অতিশয় অনিয়মিত। কেরোসিনের অভাবে সমস্ত অঞ্চল নিষ্প্রদীপ। সন্ধ্যার পর ছাত্রদের পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছে।

এই অভিযোগ জানাইয়া ইহার প্রতিকারের দাবিতে বুধবার ১৬ই ফেব্রুয়ারি প্রায় তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মিছিল বসিরহাট কোর্ট-প্রাঙ্গণে এস. ডি. ও-র অফিসে গিয়া হাজির হয়। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সেকেণ্ড-অফিসার একেবারেই নীরব। অতঃপর এস. ডি. ও. আসিয়া ছাত্রদের স্মারকলিপি গ্রহণ করিলেন। শান্তিপূর্ণ মিছিল ফিরিয়া চলিল।

মিছিলের শেষ অংশটুকু কোর্ট এলাকার ভিতর আছে, এমনি সময় অকস্মাৎ লাঠিবাজি শুরু হইল। এস. ডি. পি. ও-র উপস্থিতিতেই না কি লাঠি চালাইবার আদেশ আসে। কিছু লোকও গ্রেপ্তার হইল।

বিদ্যুদ্বেগে খবর ছড়াইয়া গেল, সমস্ত শহর বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িল। কোর্টপ্রাঙ্গণ জনহীন—সেখানে একশ-চুয়াল্লিশ ধারা জারি হইয়াছে। পথে পথে ইতস্তত ছাত্র ও জনতা। কলেজের মধ্যে বিপুল ছাত্র-সমাবেশ হইয়াছে। বেলা তিনটায় ছাত্র-মিছিল বাহির হইল, কলেজপ্রাঙ্গণ হইতে তাহারা ঘটনা-স্থলের দিকে যাইতে থাকে। হঠাৎ আদালত-অঞ্চলের কোনখান হইতে সাইরেন বাজিয়া উঠিল, মিছিলের উপর সঙ্গে সঙ্গে নির্বিচারে লাঠিচার্জ চলিল। ছাত্র ও জনতার মধ্য হইতে কিছু কিছু ইট পড়িতে লাগিল। একজন পাহারাদার আহত হইল। ইহার পরেই গুলি-বর্ষণ।

সন্ধ্যার দিকে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার প্রচুর অস্ত্রধারী পুলিশ পাঠাইলেন। সমগ্র শহরে একশ-চুয়াল্লিশ ধারা জারি হইল। গুলি-চালনার

প্রতিবাদে আগামী পরশু শুক্রবার সারা শহর হরতালের ডাক দিয়াছে। শহর থমথম করিতেছে, রাস্তাঘাট জনশূন্য। তিরিশ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে। গ্রেপ্তারের সংখ্যা এক-শ, তাহার মধ্যে তিনজন ছাত্রী আছে।……

ঘাটের ওয়েটিংরুমে বসিরহাটের খবর পড়ে শোনাচ্ছে। আর ঠিক ঐদিনে খাদ্যমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম বগল বাজিয়ে উল্লাস প্রকাশ করছেন—সে খবরও কাগজের ভিন্ন পাতায়। অমলেশের এখনো নজরে পড়ে নি।

ফাল্গুন পড়ে গেছে, নবীন বসন্ত। নতুন ধান ঘরে উঠে গেছে—আবার কি! রেশনিং ষোলআনা সফল। সীমান্তের গোলমেলে রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নিতান্তই সুশীল সুবোধ—কী আমার বন্দোবস্ত দেখ। মিছিলের-শহর কলকাতায় ছিটে-ফোঁটাও 'ইনক্লাব' শোনা যায় না। হায় রে হায়, এ কী হল—পেশাদার আন্দোলনকারীরা একেবারে যে বেকার!

এই দম্ভ দিল্লির পার্লামেণ্টে। দিল্লি অনেক দূর বাংলাদেশ থেকে। দেয়ালে তখন এক লিখন ফুটে উঠেছে, মন্ত্রীমশায় দেখতে পেলেন না। ফুটছে আর নিভে যাচ্ছে। মানুষের চোখ বড্ড ভোঁতা—ক'জনই দেখতে পায়?

॥ আঠারো ॥

ওখানেও আর এক অফিস ও ওয়েটিংরুম। শ্রীধর মল্লিকের পৈতৃক দালানে। মল্লিকঘাটের হেড-অফিস, লোকে বলে। নিচের তলায় বৈঠকখানার হলঘরে অর্ধেকটা জুড়ে নিচু তক্তাপোষ। তার উপরে সতরঞ্চি ও চাদরের ফরাস। তাকিয়া বালিশ কতক-গুলো। এ ছাড়াও গোটানো পাটি-মাদুর মোড়া জলচৌকি এদিক-সেদিক রয়েছে—ইচ্ছে মতন বিছিয়ে নিয়ে সরিয়ে-ঘুরিয়ে মেঝেতেও বসতে পারেন।

নীলকণ্ঠ বর্মা জ্ঞানের বারিধি। তাবৎ ভুবন নাকি টহল দিয়েছেন, ভুবনের তাবৎ অতীত জিহ্বাগ্রে। চোখের উপর যা ঘটছে, সরাসরি তার উপর মতামত দিতে নারাজ। অতীত টেনে এনে তবেই যেন ভরসা পান, সেই নিরিখে বিচার করেন। পাহাড়-পুর যাবেন—দিনাজপুর এবং বিক্রমপুরের কয়েকটা জায়গায় যাবারও ইচ্ছা। প্রাচীন-বাংলা এদের বাদ দিয়ে কোথায় আর খুঁজে পাবো? সেই মতলবে মল্লিকঘাটে এসেছেন। অতএব লক্ষ্যের জায়গাগুলোতেও প্রায় পৌঁছে গেছেন, বলতে হবে। তাঁর এক সতীর্থ বন্ধু রাজসাহীর মোজাম্মেল হক বাঙালি-পাঠান নিয়ে কাজ করছেন। গৌড় পাণ্ডুয়া সপ্তগ্রাম ইত্যাদি জায়গা দেখা এবং এশিয়াটিক সোসাইটি ও ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে কিছু পড়াশুনো করা অত্যাবশ্যক। উপায় নেই বলে নিষ্ফল আক্রোশে টেবিলে কলম ঠুকে ঠুকে নিব ভেঙে ফেলেছেন। নীলকণ্ঠ তাঁকে পারাপারের উপদেশ দিয়েছিলেন। পণ্ডিত-মানুষের সাহসে কুলোয় নি।

র‍্যাডক্লিফ সাহেবের নামে নীলকণ্ঠ অগ্নিশর্মা। দেশটার ভূগোল ইতিহাস অর্থনীতি কোন-কিছুই মাথায় ঢোকে না, মূর্খস্য মূর্খ—সেই

মানুষের উপর সালিশির ভার : নিজেরা আপোস-রফায় আসতে পারলাম না সাহেব, দু'শ বছর ধরে বিস্তর কল্যাণ করে এসেছ, যাবার মুখে সীমানাটা চিহ্নিত করে দিয়ে যাও। ভারতবর্ষের ম্যাপ সামনে বিছিয়ে দিল (ভুল ম্যাপ, শুনতে পাই), পেন্সিল দিল মুঠোর মধ্যে গুঁজে। সাহেব তখন কী মেজাজে ছিল, কোন মতলব মাথায় ঘুরছিল, খোদায় মালুম। ম্যাপের উপর পেন্সিল বুলিয়ে দিয়েই—প্লেন তৈরি ছিল, তিলার্ধ দেরি নয়—বোঁ-ও-ও করে সাগর-পার। সেই পেন্সিলের টানে লক্ষ লক্ষ মানুষ, মানুষের ভিটেমাটি ধনসম্পত্তি মান-ইজ্জত কাটা পড়ে গেল। হিসাবটা আজও চাপা রয়েছে, কিন্তু ইতিহাস নাছোড়বান্দা—নির্ঘাত একদিন পাতায় তুলে নেবে। যার পাশাপাশি আইখম্যানের কনসেনট্রেশন-ক্যাম্প ছেলেমানুষের খেলা বই কিছু নয়। সেই পেন্সিলের গুঁতো খেয়ে দেশশুদ্ধ মানুষকে পেটে মেরে কোটি কোটি টাকা সীমান্তের প্রতিরক্ষায় ঢালছি। এবং ঢেলে ঢেলে মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত করে যাব, ঝঞ্চাটের যদ্দিন না অবসান হয়ে যাচ্ছে।

এই সমস্ত নীলকণ্ঠ বর্মার কথা। কথা বলছেন—আর চুপচাপ হলেন তো বই পড়ছেন তখন। সময়ের অপব্যয় ধাতে সয় না। বই সঙ্গে থাকে সব সময়, রাত্রে শয্যার শিয়রেও বই। পড়েন, এবং সতর্কভাবে নোট নেন। তবু মনোবেদনা : বিস্তর সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ধরুন, নিদ্রা বাবদে চার-পাঁচ ঘণ্টা, খাওয়া এবং ঐ ধরনের আজে-বাজে ব্যাপারেও ঘণ্টা দেড়েক। এর থেকে কমিয়ে আনা সম্ভব হয় না কোনক্রমে, অথচ দিবারাত্রি কুল্যে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা—

বীরেন দে'র উপাখ্যান বলি। রূপসী বউ প্রতিমা—আরও এক আদরের নাম মণিমালা। মেয়ে শিপ্রা, ছেলে মাণিক—মণিমালার গর্বের ধন মাণিক ছাড়া অন্য নাম কেন হবে? আর

কোলের ছেলের নাম সোনা। সোনা-মাণিকের ছড়াছড়ি বাড়িতে, কেবল অন্ন নেই। অন্ন জোটানোর দ্বন্দ্বযুদ্ধ চেষ্টা বীরেনের, কিন্তু মামা-কাকার জোর-বিহীন বাঙালি ছেলের নিছক হাতের ধাক্কায় দরজা খোলে না। শিশুর কষ্ট বাপ-মা কেমন করে দেখে—বিষ খাওয়াল মুড়ির সঙ্গে মিশাল করে। কষ্টের অবসান—নিঃসাড় হয়ে ছেলেপুলে ঘুমুচ্ছে। বীরেন এক চিঠির মুশাবিদা করছে স্বাধীন-ভারতে ভোগ-সুখের জন্য যারা রইল তাদের উদ্দেশে। জানি না, আদরিণী স্ত্রী তখন হয়তো তাগিদ দিয়েছিল: বাছারা শান্ত হয়েছে—আমাদের কতক্ষণ আর?

চিঠি লিখে গেছে বীরেন: ঘটিবাটি বেচে যাবতীয় দেনা শোধ হবে। তার পরেও বাড়তি কিছু যদি থাকে, ভারতের জওয়ানদের কল্যাণে দিয়ে দিও। যত সামান্যই হোক, দিও আমার নামে।

সকালবেলা দেখা গেল এক-শয্যায় বাপ-মা ও তিন সন্তান। গোটা সংসার ঘুমিয়ে গেছে।

কাগজে বেরিয়েছিল। কলকাতারই শহরতলির ঘটনা। নীলকণ্ঠ বর্মা জর্মনির এক পুরনো কাহিনী বললেন। হুবহু এই জিনিস। বার্লিনে গিয়েছিলেন—যে অতিথিশালায় নিয়ে তুলল, হিটলারের আমলে গোয়েবলস থাকতেন সেখানে। দুর্ধর্ষ ডক্টর গোয়েবলস—হিটলারের ডান হাত। যাঁর পরম আবিষ্কার: মিথ্যা বলে যাও, এক-শ বার বলো হাজার বার বলো, তখন সে সত্যি হয়ে উঠবে। সেই মানুষের উপর যবনিকাপাত হল—অকুস্থল অবশ্য ঝকমকে তকতকে পুষ্পপ্রফুল্ল অতিথিশালার এইসব ঘরদালান নয়, হিটলারের বুঙ্কার। যার ধ্বংসস্তূপ কাঁটাতারের বেড়ায় ঘিরে রেখে দিয়েছে। বড় সন্তানবৎসল ছিল গোয়েবলস-দম্পতি। বার্লিন বাঁচানোর কোন উপায় নেই আর—চকোলেটে বিষ মিশিয়ে খেতে দিল। এক বাচ্চা কেমন করে টের পেয়ে

গেছে—কিছুতেই মুখে নেবে না চকোলেট। ডাক্তার পাঠানো হল—পাছড়ে ফেলে ইনজেকশনে বিষ ঢুকিয়ে দেবে।

বাইরে সজল চোখে অপেক্ষমাণ মা আর বাবা। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। খতম? ডাক্তারের ঘাড় নাড়া দেখে নিয়ে নিশ্চিন্তে নিজেরা এবার চকোলেট মুখে পুরলেন।

জানি না, অবোধ শিশুরা বলির পশুর মতন তাকিয়ে পড়েছিল হয়তো। যীশুখৃস্ট যাদের বলতেন 'স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর', রবীন্দ্রনাথ যাদের নিয়ে লিখেছেন, 'ক্ষুদ্র শুভ্র প্রাণগুলি নন্দনের এনেছে সংবাদ'।

তা মশায়, সেইজন্তেই তো চটপট আবার স্বর্গরাজ্যে চালান করে দেওয়া। যেখানকার মাল সেইখানে রাজত্ব করুক গিয়ে।

বড় গোলমাল। সামান্ত থেকে সাংঘাতিক। শিশুপাঠ্য বইয়ে পড়েছিলাম, গণ্ডকীনদীর বাঁধে ইঁদুরে গর্ত করেছিল—স্রোত গর্তে ঢুকে গর্ত প্রকাণ্ড হয়ে বাঁধ ধ্বসে মহাপ্লাবন। লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি গরুবাছুর মানুষজন ভেসে নিশ্চিহ্ন। তেমনি।

ছোট্ট ব্যাপার। এটা নেই ওটা নেই—ঘরে ঘরে লেগেই আছে। দেড়-যুগ স্বাধীনতা ভোগ করে গা-সওয়া হয়ে গেছে ও-জিনিস।

গরীব চাষীঘরের ছেলে মাকে বলল, চললাম মা—

আসিস বাবা, যত তাড়াতাড়ি পারিস।

কোথায় যাচ্ছে, বলতে হয় না। এই বয়সের ছেলেদের যা কাজ। বড়রা পয়সাকড়ির ধান্দায় ঘোরে। ছেলেপুলে লাইন দেয়। কিউয়ে ওস্তাদ। চালের কিউ সারা হল তো কেরোসিনের কিউ। ঘণ্টাখানেক দাঁড়ানোর পরেই লাইন ভেঙে গেল—মাল খতম, আজকে আর দেবে না। ছোট্ট ছোট্ট—মসুরির ডাল দিচ্ছে নাকি কোন্ এক দোকানে। পথের মধ্যে দেখা গেল, চুনোমাছ

দিয়ে এক জেলে বসেছে, সেখানে প্রকাণ্ড লাইন। বাচ্চা ছেলেপুলের জন্য গুঁড়ো-দুধ—তার লাইন পড়ে গেছে কমসে-কম এক মাইল। সকাল-সন্ধ্যে ছোঁড়াদের কাজ হয়েছে, কোন্ বস্তু কোথায় আজ দিতে পারে তার ঘাঁতঘোঁত জানা এবং এ-লাইন সেরে ছুটোছুটি করে ও-লাইনে গিয়ে দাঁড়ানো। সন্ধ্যেই বা কেন—রাত্রি। লাইনে দাঁড়িয়ে যতটা রাত বাইরে থাকা যায়। বাড়ি তো অন্ধকার—সূর্যের ও চন্দ্রের মারফতে মুফতের আলো যা পাওয়া যায়, মানুষের ব্যবস্থার আলো ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে জোটে না। কিউ দিয়ে যদি মাত্র একবোতল কেরোসিন জোটানো গেল, তবে। লেখাপড়া শিকেয় উঠেছে—ইস্কুলে যাব, না লাইন দেব? আর বসেই বা ইস্কুল ক'টা দিন—আজ বিক্ষোভ, কাল পিকেটিং। একটু-কিছু গন্ধ পেলেই য়্যুনিভার্সিটি থেকে প্রাইমারি-ইস্কুল লম্বা ছুটি দিয়ে বসে আছে।

মা বলে দিলেন, দেরি করিসনে বাবা। ক্ষুদের জাউ চাপিয়েছি—ও-জিনিস ঠাণ্ডা হলে মুখে দিতে পারবিনে।

আজকে মা তবু ক্ষুদ রাঁধছে—কাল? আমগাছে আমের কুসি, তালগাছে তালের মুচি—একটা-দুটো ফল খেয়ে ক্ষিধে মারবে, বিস্তর দেরি তার এখনো। কচু-ঘেঁচুতে পেট ভরাবে, তা-ও মানুষে শেষ করে ফেলছে। ঘাস—আহা, ঘাস-চচ্চড়ি ঘাসের-ঘণ্ট চালু হয়ে গেলে দুনিয়া কত শান্তির হত রে!

দলবদ্ধ হয়ে অনেকে চলেছে, চেনা মানুষও আছে তার মধ্যে। দল আরও ভারী করতে চায়। ডাকছে: চলে আয় রে—

উহুঁ, চালের ধান্দায় বেরিয়েছি।

আমরাও তো তাই। মস্তবড় খবর। লেগে যায় তো তো তিন-চার কিলো এক-একজনের ভাগে।

বলে কি! হেন অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে আজও?

সত্যি খবর। চাল গায়েব হয়ে যাচ্ছিল, ধরে আটক করেছে। নিজেদের মধ্যেই পুলিশ নাকি বখরা করে নেবে। সেটি হচ্ছে না, আমরাও চাই।

ডাকছে : চলে আয়—

অতএব ভিড়ে গেল সেই দলের মধ্যে। চাল পাওয়া যাবে, হেন সংবাদে মানুষ তো সটান এভারেস্টের চূড়ায় উঠে যাবে, অথবা নেমে যাবে বঙ্গোপসাগরের তলে।

পাবলিক আসছে খবর পেয়ে বি-ডি-ও অফিসের দুয়োর-জানলা বন্ধ। মাছি ঢোকবার ফাঁক নেই। আবদারে বাঁচিনে মানুষগুলোর—পুলিশে বুঝি ভাত খায় না, পুলিশের চাল লাগে না? ঢুকে তো গিয়েছিল কালোবাজারে—একটু হিসাবের ভুল, সময়ের একটুখানি আগপাছ। রক্ষে, কালোবাজার আছে এবং হিসাবের ভুল মাঝে মাঝে ঘটে এমনি। চাল-আটার গরজ তোমাদের চেয়ে পুলিশের কম নয়। খুলিশের মেসে হানা দিয়ে জমাখরচে পাওয়া গেছে, হপ্তার রেশনে চাল-আটায় টেনেটুনে চারদিন চলে, বাকি তিনদিনের জন্য ব্লাকওয়ালাদের হাতে-পায়ে ধরা।

দরজা খোল, কথা শোন আমাদের—

বাইরে ঘিরে ফেলেছে। কনেস্টবল পাহারায় ছিল—চোঁচা-দৌড়। চেঁচাক গে গলা ফাটিয়ে, গলার জোরে দুয়োর খুলবে না।

চাল চাই, চাল দাও। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

চেঁচাও বাছাধনেরা, মজা টের পাবে। ক্ষিধে পাবে আরও বেশি করে। ছোট ছোট ইস্কুলের ছেলে সামনেটায়—দমাদম ঢিল পড়ছে। পড়ুক গে, ও ঢিলে দুয়োর ভাঙবে না।

ঠিক দুপুর, সূর্য মধ্যাকাশে। মিছামিছি গলা ফাটিয়ে হতাশ জনতা ফিরে যাচ্ছে। গুলি অকস্মাৎ। বড্ড বাড়াবাড়ি চতুর্দিকে—পিপীলিকার পাখা গজিয়েছে। বন্দুক বিনে ঠাণ্ডা হবে না।

ক'টা পড়ল?

চার-পাঁচটা হবে। একটা বোধহয় পুরোপুরি খতম।

মোটে ?

হিজলি জেলের ভিতরে গুলি চলেছিল বৃটিশ আমলে। নীলকণ্ঠ বর্মা সেই পুরানো কথা তুললেন। সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনকে হত্যা করল। সাহেব চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে রিপোর্ট দিচ্ছে—

চায়ের বাটি থেকে মুখ তুলে কর্তা বললেন, মোটে দুটো ? Only two ?

অমলেশ পরের দিনের কাগজটা টেনে নিল। ফুল্লরা ও বীরেশ্বর উৎকর্ণ হয়ে আছেন। অমলেশ বলে, শুনুন—

॥ আন্দোলনের বিস্তৃতি, পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত ॥

গতকল্য বসিরহাটে মিছিলের উপর গুলিবর্ষণের ফলে আন্দোলন সর্বত্র ছড়াইয়া গিয়াছে। পুলিশ শোভাযাত্রা দেখিলেই যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। এইদিন লাঠি চলিয়াছে বনগাঁয়ে, নৈহাটিতে এবং বসিরহাটেও। হাসনাবাদ, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, ডায়মণ্ডহারবার সর্বত্র বিক্ষোভ। বি-ডি-ও অফিস ও খাদ্যসংক্রান্ত অন্যান্য অফিস ছাত্র-শোভাযাত্রীরা ঘেরাও করিয়াছে। বনগাঁ লাইনে চারঘণ্টা ট্রেন বন্ধ ছিল। সরকারি সম্পত্তি বিস্তর নষ্ট হইয়াছে। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব স্থানে স্থানে অচল।

দীর্ঘকাল ধরিয়া চূড়ান্ত অন্নসঙ্কট চলিতেছে। বহু স্থানে আংশিক রেশন ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু চাউল মিলে না। খোলাবাজারে পুলিশের জুলুম। কেরোসিন একেবারে অমিল। ছাত্রসমাজ অবশেষে আন্দোলনে নামিয়াছে। সমগ্র এলাকায় পথে পথে দেখিলাম মিছিলের পর মিছিল চলিয়াছে। শত শত কণ্ঠের গর্জন শুনিলাম—'খাদ্য চাই' 'পুলিশি জুলুম চলবে না'। মিছিলে সাধারণ নর-নারীও যোগ দিয়াছে, কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই অগ্রণী।

বনগাঁ-বঙ্গপনগর থানার তেঁতুলিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এইদিন মিছিল করিয়া বি-ডি-ও অফিস ঘেরাও করে। অফিসের কর্মচারীরা দরজা বন্ধ করিয়া দিলে ছাত্রেরা স্থানত্যাগ করে। ইতিমধ্যে এক কনস্টেবল অন্যপথে দ্রুত থানায় আসিয়া খবর দেয়। মিছিল যখন থানার পাশ দিয়া যাইতেছে, সম্ভবত সেই কনস্টেবলই গুলি করে। তখন বেলা সাড়ে-বারোটা। বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছাত্র—অধিকাংশেরই বয়স পনের বৎসরের নিচে—আট রাউণ্ড গুলি তাহাদের উপর বর্ষিত হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হইয়াছে তেঁতুলিয়া বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র রুহুল ইসলাম, আহত হইয়াছে পঞ্চম শ্রেণীর মণীন্দ্র বিশ্বাস ও দশম শ্রেণীর কার্তিক। বেলা আড়াইটায় সময় শোভাযাত্রীরা হতাহত ছাত্রদের সরাইয়া লইয়া যায়······

ভাতের বদলে গুলি? কী সর্বনাশ!

ওপারে হিন্দুস্থানের ঘাটে নীলকণ্ঠ বর্মা মগ্ন হয়ে আছেন বইয়ের মধ্যে। প্রমথ বিশ্বাস পুঁটলি নামিয়ে ফরাসে জাঁকিয়ে বসল। তাকে পেলে রক্ষে নেই—এদিক-সেদিক যত আছে, সবাই এসে ঘিরে ধরবে। যাত্রাওয়ালা—সারা মরশুম এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে পালা গেয়ে বেড়ায়। হিন্দুস্থান পাকিস্তান বাছবিচার নেই।

কে-একজন বলেছিল, বেড়ে আছ। তোমার তো দেখি, ঘাট লাগে না—সিকি-পয়সাও খরচা নেই। যে জায়গায় খুশি পাড়ি ধরে পার হয়ে চলে যাও।

সগর্বে প্রমথ বলল, রামা-শ্যামা চলে যাচ্ছে, আর আমরা তো গুণীলোক। আমাদের পথ রুখবে, সে-মানুষ ভূ-ভারতে নেই। বলি মশায়, পাখিও ইচ্ছা-সুখে এপার-ওপার করে—তাদের পাশপোর্ট লাগে না। কুকুর-বিড়ালেরও নেই।

একজন টিপ্পনী কেটে উঠল: কুকুরের পিছনে তাড়াও করে সময় সময়। বুঝি-বা পাশপোর্ট পরখ করার জন্য। হয়ে-কুকুর—ঘেউ-ঘেউ করে তেড়ে এলো। তখন আবার উল্টে পালাতে হয়।

ক্ষিতিনাথ বাগচিকে আজ এদিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে, তাঁকেই ঠেশ দিয়ে রসিকতা। কাস্টমসের প্রিভেন্টিভ অফিসার। ঘাটের উপরে কাস্টমসওয়ালাদের পা পড়ার কথা নয়, পাকা-বন্দোবস্ত আছে। তবে ক্ষিতিনাথের কথা আলাদা—শ্রীধরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ খাতির-ভালবাসা, তিনি আসেন মাঝে মাঝে।

ওপারের কুকুর-শিয়াল সীমানার লাইন পার হয়ে চলে আসে—কবে নাকি ক্ষিতিনাথ একটা কুকুরের পিছু পিছু দৌড়েছিলেন। যেহেতু গলার বকলেসের সঙ্গে ফিতে দিয়ে পোস্টকার্ডের মতন কী-একটা জিনিস বাঁধা। তখন লড়াই চলছে, বিষম কড়াকড়ি চতুর্দিকে। ক্ষিতিনাথের সন্দেহ হল, চরবৃত্তির ব্যাপার, কুকুর দূত করে ওপারের কোন বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছে এপারের ব্যক্তিবিশেষের কাছে। কিম্বা টাকা লেনদেনের হুণ্ডিও হতে পারে। নানান ধরনের কোড, মানুষের মগজের নানা বিচিত্র আবিষ্কার—ক্ষিতিনাথ সামান্যই জানেন। এক-এক পার্টি এক-একরকম কোড বানিয়ে নিয়েছে, বাইরের লোকের পক্ষে জানা বড় কঠিন। এ কর্ম যারা সব করে, ঠাকুর-দেবতা সম্পর্কে তারা অতিশয় ভক্তিমান। চিরকুট-কাগজে লিখে দিয়েছে, ধরুন, 'দুর্গা শরণম্'—মানে দু-শ টাকা। যেমন, 'জয় হনুমানজি'—'জয়' এখানে 'নয়' পড়বেন এবং হনুমানের অর্থ হাজার। হুণ্ডিবাহককে ন'হাজার টাকা দেবেন, এই আদেশ।

কুকুরের গলার সঙ্গেও সম্ভবত ঐ রকম কিছু ঝুলানো। ক্ষিতিনাথ দৌড় দিলেন পিছু পিছু, কিন্তু রহস্যভেদ সম্ভব হয় নি তখন। সেই কাগজ পরে সংগ্রহ হয়েছিল। লেখা রয়েছেঃ ক্ষ্যাপা কুকুর—সাবধান। কুকুরের মালিক জগজ্জনহিতায় গলায় লিখন ঝুলিয়ে দিয়েছেন—কাছে গিয়ে লেখা পড়ে আপনি সতর্ক হয়ে যাবেন, মালিকের কোন দায়িত্ব রইল না।

গল্পটা বহুত চালু, সত্যি-মিথ্যে খোদায় মালুম। যাকগে।

যাত্রাওয়ালা প্রমথ বিশ্বাসের কথা হচ্ছিল। গুণীজন সত্যিই—গর্ব অকারণ নয়। কোন একটা বিশেষ দলে গাঁথা নেই সে, ছুটো-কাজ করে। এ বছর ফকিরচাঁদ-নাট্যসমাজে আছে, আগামী বছর হয়তো দেখবেন নাট্যসমাজের পরম শত্রু ভট্ট-কোম্পানির বিজ্ঞাপনে প্রমথ বিশ্বাসের নাম। ফুটবল-খেলোয়াড়রা যেমন করে থাকে। সংসারে একমাত্র বিধবা মা—মায়ের উপর প্রমথর বড় ভক্তি। প্রমথকে পেতে হলে সেই মায়ের কাছে আসতে হবে। দরদাম সমস্ত মায়ের সঙ্গে। এক মরশুমের টাকাকড়ি বুঝে নিয়ে মা হুকুম দিয়ে দিলেন, প্রমথ অমনি সেই লোকের পিছু পিছু চলল। দলের সঙ্গে চুক্তি, দু-সের দুধ আর এক কাঁচ্চা গাঁজা প্রতিদিন। এবং সাধারণ ডাল-ভাত—সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, মাছটাও খায় না। দুধ-গাঁজার আবশ্যক গলা রাখার জন্য। কী একখানা গলা রে—গলার বালাই নিয়ে মরি! গানে একটোয় সমান দড়। গানে যেন মধুর ধারা বয়ে যায়, একটোর গর্জনে কাপড়ের সামিয়ানা ফেটে চৌচির হবার দাখিল। একাধারে উভয় গুণ বলেই খাতির এত বেশি। দেখুন না কেন, দুর্গাপুজো থেকে একনাগাড় পশ্চিমবঙ্গে গেয়ে বেড়িয়েছে—এবারে পাকিস্তানের ওপারে বায়না নিয়ে চলল। ওপারে যাত্রা নয়, মাণিকপীরের পালা—পূব-বাংলার অনুরাগীরা মুকিয়ে রয়েছে।

হেন জায়গা নেই, পালা গাইতে যেখানে না গিয়েছে। তল্লাটের যাবতীয় খবরাখবর প্রমথর ঠোঁটের আগায়। সত্যি খবর, এবং বাড়ানো ও বানানো খবর। প্রমথকে দেখলে লোকজন তাই ঘিরে এসে বসে।

কালীপুজোর দু-দিন এবার আম্লার-বটতলায় গাওনা হয়েছিল। আম্লা অথবা ফলাও করে আম্লাকালীর-বটতলা, কে না জানে? প্রতিদিন দূর-দূরান্তর থেকে মানুষ এসে পুজো দেয়, মানত

করে। সেখানে—বোধকরি শ'খানেক বছর আগে—আন্নাকালী নামে এক চাষীঘরের মেয়েকে দেবী স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, পঙ্কজলে ডুবে রয়েছি—ডাঙায় তুলে আমায় পাড়ের বটতলায় স্থাপনা কর্। কোনখানটা আছেন, জায়গারও সঠিক নির্দেশ ছিল—দীঘির নৈর্ঋত কোণে। ডুব দিয়ে সত্যি সত্যি বিগ্রহ পাওয়া গেল। গরিব-মানুষ আন্নাকালী বটতলায় এক চালা বেঁধে দেবী-স্থাপনা করল। ভারি জাগ্রত দেবী—ভক্তেরা হাতে-হাতে ফল পেয়ে যায়। দেবীমাহাত্ম্য প্রচার হয়ে গেল, চালা ভেঙে পাকা-মন্দির উঠল সেখানে। মন্দির ছোট, কিন্তু দেবীর নামডাক দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

কালীপুজোর সময় ভারি জাঁকজমক। দেড় হাজার, দু-হাজার পাঁঠা পড়ত সে আমলে, রক্তের ধারা গড়িয়ে দীঘিতে পড়ে দীঘির জল রাঙা হয়ে যেত। ঐ জলে অনেকদিন আর নাওয়া-খাওয়া চলত না। ঠাকুরের সেবায়েত আন্নাকালীর উত্তরপুরুষরাই বটে, কিন্তু কালীপুজোর সময়টা আলাদা কিছু থাকত না। চতুর্দিকের গ্রামগুলো মেতে উঠত—পুজো যেন সকলের। অগুন্তি মানুষ আসত তখন, তার মধ্যে অনাহারে একটি প্রাণী থাকবে না। কোন এক উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালেই হল, গৃহকর্তা সমাদরে ঘরে নিয়ে তুলবেন: বসুন, তামাক খান, স্নান করুন।

ভাত চাট্টি জুটবেই—যার যেমন অবস্থা।

এক-শ বছরের পুরনো মচ্ছব—স্বাধীনতার পরেও পাঁচ-সাত বছর চলেছিল। তার পর থেকে ভাঁটার টান, টানের বেগ বাড়তে বাড়তে এই অনটনের অবস্থা। ধান-চাল কোথায় সব টেনে নিয়ে বের করল। গাঁয়ের সামান্য-সাধারণ পড়ে মরুক—সেবাইতরাও এখন অতিথি-অভ্যাগতকে একমুঠো ভাত দিতে নারাজ। পাবে কোথা? ক-বছর সামান্য চিঁড়ে-মুড়ি চলেছিল—এবারে দেখলাম, স্রেফ দীঘির জল। পাঁঠা দু-হাজারের জায়গায় কুল্যে দুটোয় এসে

ঠেকেছে, দীঘির জল তাই দিব্যি পানযোগ্য আছে। মানুষকে মুড়ি-চিঁড়ে দেবে কি—পেটের খিধেয় নিজেরাই তো হাহাকার করে বেড়ায়। আর কর্তারা দিব্যি সহজ পথ ধরেছে—ভাত চেয়েছ তো বন্দুকের গুলি।

আরে সর্বনাশ। নীলকণ্ঠ বর্মা সশব্দে বই বন্ধ করলেন।

॥ উনিশ ॥

বই বন্ধ করে নীলকণ্ঠ খাড়া হয়ে বসলেন। কথার পৃষ্ঠে কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু আসর পেয়েছে তো প্রমথ সহজে ছাড়বে না। কিবা যাত্রার আসর, কিবা গালগল্পের আসর। উহুঁ উহুঁ করে হুঙ্কার ছেড়ে নীলকণ্ঠ তাকে থামিয়ে দিলেন: ক্ষিধের আগুন বড় সাংঘাতিক হে। দেশলাইয়ের আগুনের শক্তি কতটুকু—পেটের আগুন জ্বলতে জ্বলতে দেশজোড়া অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায়। দেশজোড়া কেন, দুনিয়াজোড়া।

দুই মহাবিপ্লব—ফরাসি-বিপ্লব আর রুশ-বিপ্লব—এ কালের মানুষের চিন্তা-ভাবনা কাজকর্ম নীতি-নিয়ম বিলকুল বদল করে দিল। দুয়েরই মূলে পেটের ক্ষিধে, দুয়েরই স্লোগান ছিল: রুটি চাই—

সেণ্ট পিটার্সবার্গের (এখনকার লেনিনগ্রাড) উইন্টার প্যালেস। ১৯০৫ অব্দ। রবিবারের দিন জনতা জারের নামে দরখাস্ত নিয়ে প্যালেসের ভিতর-উঠানে এসে দাঁড়াল। জারেরই কোন কেষ্টবিষ্টু পারিষদ বুদ্ধি দিয়েছিল: আমলাদের পিছনে ঘোরাঘুরি করে তো দেখলে—সরাসরি প্যালেসে চলে যাও, ব্যবস্থা হবেই, খালি হাতে ফিরতে হবে না।

গিয়েছিল তাই—হাতে আইকন আর জারের ছবি। অন্নহীন, অসহায়, ক্ষুধার অন্নের প্রার্থী। তা মিথ্যে বলে নি সেই উজির-মশায়—খালি-হাতে ফিরতে হল না। চেয়েছিল রুটি, জবাব দিল বুলেটে। ঝড়ের কলাগাছের মতন খাড়া মানুষগুলো পটাপট উঠোনে পড়তে লাগল। কিম্বা বলুন না, আম্মার-বটতলায় হাজার

পাঁঠা-বলি। পাশের নেভা নদী অবধি রক্ত গড়িয়ে জল রাঙা হয়েছিল কিনা, লেখা নেই। কিন্তু রবিবারটা রক্তরঞ্জিত হয়ে রইল চিরকালের ইতিহাসে—'রক্তাক্ত রবিবার'। একটা মেয়ে ক্যারোলিনা উন্মত্ত হয়ে চেঁচাচ্ছে: স্ত্রীরা, মায়েরা, নিষেধ কোরো না তোমাদের স্বামী-ছেলেদের—হাত ধরে টেনো না। জীবন দিক তারা। কেঁদো না জীবন গেছে বলে।

সবাই তখন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: এই যে, আছি সকলে আমরা।

মরেছিল এক হাজারের বেশি—কত বাচ্চা কত নারী তার মধ্যে! হাজার মানুষ একে-দুয়ে কবরের নিচে গেল, সেই সঙ্গে রাজতন্ত্রেরও কবর খোঁড়া হল রক্তাক্ত-রবিবারে। কবরে গিয়ে জার নিজেও শয্যাগ্রহণ করলেন—সে অবশ্য আরও একটা যুগ পরে। প্রাণ কি সহজে যেতে চায়, ধুঁকছিল কোন রকমে এই এক যুগ।

আঠারো শতকের ফরাসি-ইতিহাসের সঙ্গেও মিলিয়ে দেখুন। ১৭৩৩ অব্দ থেকে জিনিসপত্রের দর হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। রাজ্যশাসনের খরচাও ঘোর বেগে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে আকাশচুম্বী। ঋণেরও লেখাজোখা নেই। রাজা লুইকে সতর্ক করা হল, কামানের একটি গোলা ছুটিয়েছ তো তোমার রাজত্ব দেউলিয়া।

রুটি পাচ্ছে না লোকে। হা-রুটি জো-রুটি—এই অবস্থা। প্রজার দুঃখে অভিজাত সম্রাজ্ঞী মারী আঁতোয়ানাতে বিগলিত হলেন: আহা রে! রুটি পাচ্ছে না, তা কেক খেলেই তো পারে ওরা। (মিলিয়ে নিন—আমাদেরও এক পরম-কর্তা নাকি বলেছিলেন, ভাত পাচ্ছে না—তা ফল খেলেই তো পারে! আঙুর-আপেল কলা-পেঁপে, আম-আনারস।)

কার্লাইল ঠাট্টা করেছিলেন ফরাসি-বিপ্লবের পূর্ব-অবস্থা নিয়ে: ওদের সঙ্গে কিউয়ে দাঁড়িয়ে অন্য কোন জাত পারবে না।

পরবর্তীকালে দেখা গেল, পারে অনেকেই। কার্লাইল অতিশয়োক্তি করেছিলেন। রুশরা এ বাবদে ফরাসিদের বিস্তর পিছনে ফেলে গেল। (আমরাও কি খুব হেরে আছি, মনে করেন?) শুরু ১৯১৫ থেকে। রাত্রে ঘোর অন্ধকার, কোনো বাড়িতে আলো জ্বলে না। জ্বালাবে আলো কী দিয়ে? কেরোসিন অমিল, একটা বাতির দাম কমপক্ষে চল্লিশ সেন্ট। তদুপরি জেপেলিন থেকে বোমা পড়ার ভয়। চুরি-ডাকাতি বিষম বেড়েছে —পুলিশের উপর আস্থা নেই, বাড়ি বাড়ি পাহারা দিচ্ছে নিজেরাই পালা করে। খাদ্যমাত্রই দুর্লভ থেকে দুর্লভতর হচ্ছে দিনকে-দিন। রুটির বরাদ্দ এক-পাউণ্ড থেকে কমে কমে সিকি-পাউণ্ডে দাঁড়াল। শেষটা এ সপ্তাহে দিচ্ছে তো ও-সপ্তাহে আর নয়। চিনি কপালক্রমে পাওয়া গেল তো প্রায় হোমিওপ্যাথি ডোজে। ১৯১৭ অব্দে এমন অবস্থা, কিউ না দিয়ে কোন জিনিসই মেলে না। পেত্রোগ্রাদের পথঘাট বরফে ঢাকা। শেষরাত্রির কনকনে ঠাণ্ডায়, কখনো বা ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে, ছিন্ন সামান্য বস্ত্রে মানুষ লাইন দিয়ে হা-পিত্যেশ দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হবেন না—ছবিটা এদেশে আপনারাও কি দেখেন নি?

ধনবান আর সংস্কৃতিবানদের সমাজে উদ্বেগের ছিটেফোঁটাও নেই। কবিরা প্রিয়ার উদ্দেশে প্রেম-কবিতা লিখে যাচ্ছে। যৌন রচনা ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের ছড়াছড়ি—যার মধ্যে সমসাময়িক দুঃখ-বেদনার ছায়ামাত্র নেই। থিয়েটারে নতুন নতুন নাটক—ফুর্তিফার্তির জন্য থিয়েটার, তার মধ্যে অভাব-অনটন ঢুকিয়ে রসভঙ্গ কেন করতে যাবে?

আমার বানানো জিনিস নয়—প্রত্যক্ষদর্শীরা পুঁথিপত্রে লিখে গেছেন, হুবহু তার তর্জমা। আপনারা চতুর্দিকে যা দেখেন, মিলে যাচ্ছে কিনা এইবারে বলুন। চাখানায় সোনার সিগারেট কেস থেকে দামি সিগারেট দাঁতে চেপে মিছিলকারীদের উদ্দেশে ধমক

দিচ্ছে: ধরে ধরে বেটাদের আপাপাস্তলা চাবকানো দরকার। তরুণী মেয়েরা গাঁ-গ্রাম থেকে পালে পালে শহরে আসছে ফরাসি শেখবার জন্ম—ভাল বিয়েথাওয়া হবে। একটা মেয়ে একদিন বিষম উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফিরল—কণ্ডাক্টর তাকে নাকি 'কমরেড' বলে ডেকেছে।

একটা অতি-তুচ্ছ ঘটনা হঠাৎ। পেত্রোগ্রাদের ঝকমকে রুটির দোকানে রাস্তার এক ভিখারি-মেয়ে ঢিল কুড়িয়ে মারল। কাচ ভেঙে রুটির ভাণ্ডার আলগা। ছুটে আসে এদিক-সেদিক যত ছিল। খাগ্ত লুঠ। পলকা বাঁধে ছিদ্র করে দিয়েছে—বানের জল আছড়ে এসে পড়ল।

জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে, হরে মুরারে!

হুড়ুম-দাড়াম আওয়াজ আচমকা। দূরে—গ্রামাঞ্চলে। নীলকণ্ঠ বর্মার গল্প থেমে গেল। সচকিত সকলে। বন্দুকের দেওড়ই তো মনে হয়। আজকেও বুঝি আবার একটা-কিছু চলছে।

ঘাটোয়াল শ্রীধর মল্লিক তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। প্রমথ অমনি হাত ধরে ফেলে: বসেন না, যাচ্ছেন কোথা? কত সব জ্ঞানের কথা শুনছি। এঁদের মতন মানুষ হামেশাই মেলে না, কপালগুণে মিলেছে তো ভাল করে শুনে নিই।

ঘাটোয়াল বলে, তা শোন তোমরা। আমার জন্তে কি, আরো সব তো রইলেন। এক জায়গায় ঘট হয়ে থাকলে আমার কি চলে ভাই?

প্রমথ বলে, যাত্রা করে বেড়াই, কমসে-কম তিন-চার শ' আসরে গেয়েছি। লোক উঠলেই বুঝলাম, গেরো আঁটে নি—ঢলঢলে হয়ে আছে। মন ঐ বিগড়ে গেল, তারপর যতই করুন সে-আসর আর জমানো যাবে না।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শ্রীধর বাইরে যাচ্ছে। বলে, ঘাটের

ঘাটোয়াল—আমরা হলাম এপার-ওপারের সাঁকো। ভাতভিত্তি এই আমাদের। মন-মেজাজ ভাল থাকলে তবেই মানুষ পারাপারে আসে। চারিদিকে ডামাডোল—চুপচাপ বসে বসে গল্প শুনি কেমন করে? সুরুলের মড়া নিয়ে মিছিল করে আজকে শহরে যাবে শুনেছি—তাই নিয়ে বাধল কি না, কে জানে।

ক্ষিতিনাথ বাগচি একটু আগে এসে সকলের পিছনে বসেছিলেন। তিনিও উঠে পড়লেন। কাজের লোক, এক জায়গায় স্থির থাকতে পারেন না। কিন্তু অতবড় পণ্ডিত-মানুষ বলছেন—তার মধ্যে একলা একজন উঠে পড়লে লোকে ভাববে, বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো—এ জিনিসের কদর ঘাটের মানুষ কি বুঝবে? উসখুস করছিলেন, এতক্ষণে সুযোগ পেয়ে তিনিও শ্রীধরের পিছু পিছু চললেন।

প্রমথ বিশ্বাস চোখ টিপে বলে, হবেই। একজন উঠলে ছুতোনাতায় আরও সব ওঠেন। কত দেখলাম। তার মানে বারোটা বেজে গেল আসরের। গেছে কিনা দেখুন চেয়ে।

দেখা গেল, এতক্ষণের বক্তা নীলকণ্ঠ বর্মা পূর্ববৎ ফরাসের উপর কাত হয়ে বই খুলে নিয়েছেন।

প্রমথ প্রবোধ দেয়: দুটো লোক উঠল তো কী হয়েছে। আমি তো মশায় রসিক মানুষ একজন পেলেই নিদেন পথে দশটা গান শুনিয়ে দিই। তার পরে কী হল বলুন।

নীলকণ্ঠ পড়ায় মত্ত। জবাব দিলেন না। কানেই যায় নি হয়তো তাঁর।

শ্রীধর ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরুল। বিকেলবেলা আচমকা গুলির আওয়াজ কেন? উঠানের প্রান্তে কলাবনের ভিতর থেকে ওপারের পানে তাকিয়ে রহস্য সমাধানের চেষ্টায় আছে।

তারাপদ ঘাটেরই এক ছোকরা-কর্মচারী। দেখেছে শ্রীধরকে। ছুটতে ছুটতে এসে বাইনোকুলার হাতে দিল।

দেওড় শুনছে পেলি ?

হুঁ-উ-উ—বলে তারাপদ দীর্ঘছন্দে ঘাড় কাত করল।

কোন্‌দিকে রে ?

ঐ তো, হোথায়—

হাত তুলে ডান-দিকে অর্থাৎ পাকিস্তানে নির্দেশ করল। আবার নিজস্ব মন্তব্য জুড়ে দেয় : কুশখালির বাওড়ে পাখি পড়েছে খুব। কারা পাখি মারতে নেমেছে!

শ্রীধর ভ্রূভঙ্গি করে বলে, বুদ্ধির সাগর! বন্দুক নিয়ে বাজে লোক আসতে দিচ্ছে বর্ডারে!

তারাপদ বলে, বাজে কেন হবে ? ফৌজি লোকেই মারছে।

শ্রীধর বলে, পাখি মেরে তারা বুলেটের বাজে খরচা করবে কেন ? বুলেট কি সস্তা ? শিকার মানুষই তো যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে—মতলব হলে গণ্ডায় গণ্ডায় মারা যায়।

কণ্ঠস্বর তিক্ত হয়ে উঠল। নিরীহ হাবাগবা মানুষ নগরবাসী পাড়ুই, তল্লাটের সবাই তাকে জানে, ভালবাসে, দয়াধর্ম করে। উঠোনের নারকেলি-কুলের গাছটা ফলের ভারে ভেঙে পড়বার দাখিল, কিছু ফল নিয়ে সীমানা পার হয়ে সে পুলিশ-ক্যাম্পে যাচ্ছিল। এটা-ওটা হাতে করে যায় এমনি, সিপাইরা ভালবাসে। তারাও এক-পাতড়া ভাত খাইয়ে ছেড়ে দেয়। আচমকা একদিন মিলিটারি ফৌজ 'দুম' করে গুলি করল। পায়ে মেরেছিল, মরে যায় নি তাই—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়ায়। নগরবাসী নাকি স্পাই। দেওড় শুনে পুলিশরা এসে পড়েছে। নগরবাসী হাউ-হাউ করে কাঁদছে তো, তারা হেসেই খুন : নগরবাসী, তুই নাকি স্পাই ? কুলের ঝুড়িতে কোন খবরটা পাচার করছিলি রে বেটা ? জীপে তুলে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে নামিয়ে দিল : ওপারে চলে যা এবার। হাসপাতাল ঐ দেখা যায়। সেরে যাবি, কপাল ভাল যে প্রাণে মরিস নি।

তিক্তকণ্ঠে শ্রীধর বলল, বেলুচ-ফৌজ কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে এসেছে। লড়াইয়ে আধখানা গুলিও ছুড়তে হয় নি—ওদের হাত নিশপিশ করছে সেই থেকে। সামান্য পাখি মেরে নিশপিশানি যাবে না। কষ্ট করে খুঁজতেই বা যাবে কেন পাখি, হাতের কাছে যখন দেদার মানুষ। মানুষের মতন সস্তা-টার্গেট কী আছে?

বৈঠকখানা ঘুরে প্রণব এদিকে আসছে, রঞ্জন দত্তর সঙ্গে এসেছে। দৈবাৎ রঞ্জনের দেখা পেয়ে প্রণব তাকে ছাড়ল না: বর্ডার-জায়গা তো নো-ম্যানসল্যাণ্ড—কোথায় হড্ড-হড্ড করে বেড়াব, আপনিই নিয়ে চলুন মল্লিকমশায়ের কাছে। চালের জোগাড় না হলে হবে না।

চলে এসেছে তাই। ঘাটের অফিস থেকে দেখিয়ে দিল: কলাবনে ঘুরছেন তিনি ঐ যে—

বাইনোকুলার ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে শ্রীধর মল্লিক বলছিলেন, মানুষই যখন এত সস্তা, পাখি কী জন্যে লোকে খুঁজতে যাবে?

পিছন থেকে রঞ্জন দত্ত ফোড়ন কেটে উঠল: যা বলেছেন বাবু। এক্ষুনি তো আওয়াজ শুনলেন। ইটিণ্ডের দিক থেকে এলো। আজ আবার কতগুলো পড়ল, কে জানে!

তারাদাসের দিকে মল্লিক রুষ্টচোখে তাকান: পাকিস্তানের দেওড় বললি যে ছোঁড়া? ডান-হাত দেখালি?

তারাদাস বলল, দেওড় চলছেই তো সর্বক্ষণ। অষ্টপহরি মচ্ছব হয়ে দাঁড়াল। ডান-হাত বাঁ-হাত ঠিক রাখা যায় না।

সায় দিয়ে রঞ্জন বলে, আগে দেখেছি ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় একটা লোক খুন হলে অঞ্চল জুড়ে তোলপাড়। জমাদার কনস্টেবল ছোট-দারোগা বড়-দারোগা মায় সদরের পুলিশ-সাহেব—সকলের ছুটোছুটি পড়ে যেত। এখন তো ডাল-ভাত একেবারে। চৌকিদারে থানায় এসে রিপোর্ট দিচ্ছে, তিনটে খুন পাঁচটা জখম।

ঘুমের মধ্যে দারোগাবাবু বললেন, ঠিক ঠিক গণে এনেছিস তো? ছোটবাবুর কাছে ডায়েরি করে চলে যা। বলে পাশ ফিরে শুলেন। উপরের টিপ আছে সন্দ করি: মার্ মানুষ, মেরে মেরে কমিয়ে ফেল্—

একটু থেমে আবার বলে, পেটের ভাতের যোগান দিতে পারছে না, কী করবে? খাওয়ার মানুষই মেরে সাবাড় করো তবে। এই সমাধান। ভবিষ্যতে যারা আসতে চাচ্ছে, মেরে ফেল তাদের পরিবার-পরিকল্পনায়। আর নগদ যারা মজুত আছে, ছুতোছাতায় বন্দুক মারো তাদের উপর। একই মতলব উভয় কর্মের পিছনে। চাল-গম ভিক্ষে করে করে তিতবিরক্ত হয়ে এই মতলব ফেঁদেছে।

বাড়িমুখো এবারে চারজনে। প্রণবের দিকে চেয়ে মল্লিক বলে, ইনি তো নতুন। এ-ঘাটে কখনো পার হয়েছেন, মনে পড়ছে না।

প্রণব বলে, আজও হবো না। আমার একটু অন্য কথা।

চোখ তাকাল রঞ্জনের দিকে। তার আগেই রঞ্জন উচ্ছ্বাস ভরে আরম্ভ করে দিয়েছে: মস্তবড় মানী-ঘর বাবু। একরাত্রি ছিলাম এঁদের বাড়ি। বিনিময় করে হিন্দুস্থানে এসে উঠেছেন। কিন্তু মানের কে মর্যাদা দেয় এখানে? মান না-ই দিল, চাট্টি ধান-চালের ব্যবস্থাও করে দিত যদি। সরকারে চাইতে গেলেই তো গুলি। তাই আমি বুদ্ধি দিলাম, মল্লিকমশায়ের কাছে চলে যান। তিনি যা-হোক কিছু করবেন-ই।

দিনকাল এমন দাঁড়িয়েছে, ধান-চালের কথা পড়তেই দেয় না কেউ—তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে: কোথায় পাবো? শ্রীধর মল্লিক, দেখা গেল, আশ্চর্য ব্যতিক্রম। ঘাড় নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে নিল: বটেই তো। মজুত করে মুনাফা পিটতে যাচ্ছেন না, পেটে খাবেন। না-খেয়ে মানুষ কী করে বাঁচে? আর বাঁচতে দেবে না বুঝলে তখনই মানুষ একেবারে মরিয়া হয়ে

ওঠে। ব্যবস্থা কিছু করতে হবে বৈ কি! কী করা যায়, সেইটে ভাবছি।

চিন্তিত ভাবে চলেছে। নিঃশব্দে এরাও চলেছে পিছু পিছু। মল্লিক বলল, ক্ষিতিনাথ বাগচি ঘোরাঘুরি করছেন। কোন্ বাবদে এসেছেন, বললেন না কিছু—গোপন সরকারি কাজকর্ম, বলবেনই-বা কেন? চা পাঠাতে বলে গেছেন, নিজে আমি চা নিয়ে যাবো। সেই সময় বলব আপনার কথা।

আবার বলে, আপাতত ঠেকানোর জন্য আনোয়ার আছে। সে অবিশ্যি একদিন-দু'দিনের রসদ—একটা মানুষ যে ক'টা চাল ওপার থেকে ঘাড়ে বয়ে আনতে পারে। এত সামান্যর জন্য কি আর আমা অবধি কষ্ট করে এসেছেন?

দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ শ্রীধর। বাইনোকুলার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুকুরঘাটের দিকে দেখে। রঞ্জনকে বলল, ভদ্রলোককে কত আর হাঁটিয়ে মারবে। বৈঠকখানায় নিয়ে বসাও গে। ওঁর বাড়ি গিয়ে আদরযত্ন পেয়েছ, যতটা পারো তোমাদেরও করা উচিত। ফিরে গিয়ে ঘাটের নিন্দে না করতে পারেন। আমিও যাচ্ছি—ঘাটটা একবার ঘুরে যাবো।

তারাপদকে নিয়ে মল্লিক দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায়।

আসুন—বলে হাসিমুখে রঞ্জন প্রণবকে ডাকল: দেখলেন তো মানুষটা কেমন? বলি নি? জমিদারগোষ্ঠী—এককালে অতিথিশালা ছিল বাড়িতে, মানুষ এলে না খেয়ে যাবে না। সমস্ত গিয়েও সেই মেজাজটা আছে তবু। এই বাজারে কতগুলো পাত পড়ে, খাওয়ার সময় দেখতে পাবেন।

॥ ঝুড়ি ॥

প্রাচীন পুকুর, হিঞ্চে-কলমির দামে আঁটা পাড় থেকে অনেক দূর অবধি। দূরের জলে পাতিহাঁস ভাসছে। পাড়ে যাতে উঠে আসে, একটা মেয়ে চই-চই করে ডাকছে। হাঁস গ্রাহ্যও করে না, মনের সুখে ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়।

শ্রীধর মল্লিক বলেন, বিকেল না হতে হাঁস ডাকছিস কেন রে?

মেয়েটা বলে, শিয়ালের উৎপাত বাবু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারায় আছি। ভারি শয়তান। যেই দেখবে মানুষ নেই, কচুবনের মধ্যে ঢুকে ওত পেতে থাকবে। পাখনা ঝাড়তে হাঁস ডাঙায় উঠে আসবে, ক্যাঁক করে টুঁটি কামড়ে ধরবে অমনি। ধরেই দৌড়। সেদিন গেছে একটা আমাদের।

ইটে-বাঁধানো পাকাঘাট ছিল ওধারে, ভেঙেচুরে আছে। মল্লিক বললেন, ঘাটে এইমাত্র যেন মানুষ দেখতে পেলাম? গেল কোথা?

আছে এখনো। আপনাদের দেখে রানার আড়ালে বসে পড়ল।

ডিঙি মেরে উঁচু হয়ে শ্রীধর দেখলেন। পুরো মানুষ নয়, কালো মাথার খানিকটা দেখা গেল। শ্রীধর মল্লিকের কাছেও আত্মগোপন—হাঁদারাম আর কাকে বলে! মানুষ খুন করে এসেও আসামি উকিলের কাছে আনুপূর্বিক সমস্ত বলে যায়। বৃত্তান্ত জানা না থাকলে সাক্ষ্য-প্রমাণ সাজিয়ে হয়কে নয় করবে কেমন করে? তাবৎ দুনিয়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়াও, ঘাটের ঘাটোয়াল কেবল বাদ।

হাসিমুখে হাঁক ছাড়লেন: কে ওখানে? মুণ্ডু নামিয়ে আর কী হবে, দেখতে পেয়েছি।

মানুষটা অগত্যা খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

মল্লিক বললেন, ঘাটে কী করছেন?

জল তেষ্টা পেয়েছিল বড্ড—

তা বাড়িতে বুঝি জল নেই?

মল্লিকের কণ্ঠে কিছু বিষাদের সুর। বললেন, এককালে জমিদার ছিলাম। সর্বস্ব গেছে, তবু জল একগ্লাস এখনো দিতে পারি। ও-পারে যাবেন তো বটে?

ঘাড় কাত করল সে।

অনেক দেরি। আজকে অনেক রাত্রে পারাপার। বিশ দণ্ডের পরে। আমরাও পাঁজিতে মহেন্দ্রযোগ অমৃতযোগ দেখি, যোগিনী সামনে না পিছনে হিসেব করে নিই। তবে রওনা। বিশ দণ্ড—তার মানে রাত ছটোর আগে নয়। ততক্ষণ এই পুকুরঘাটে পড়ে থাকবেন কেন?

মানুষটা তবু মৃদু আপত্তি করে বলে, হাওয়া দিব্যি শীতল এখানে। আমি আবার নিরিবিলি-থাকা মানুষ, হৈ-হল্লার মধ্যে মাথা ধরে যায়। নইলে তো সোজা আপনার বৈঠকখানায় গিয়ে উঠতাম।

সেটা কি আর বুঝি নি মশায়, ঘাটের জঙ্গলে সাপখোপের মধ্যে হাওয়া খাওয়ার কেন আস্তানা বেছেছেন? বৈঠকখানায় যেতে হবে না, ভিন্ন জায়গা দেবো—সেখানে নিরিবিলি থাকুন গে। মল্লিকঘাটে সর্বরকম ব্যবস্থা—হৈ-হল্লার আসর আছে, আবার ধ্যান-ধারণার আসনও আছে।

তারাপদকে আদেশ দিলেন: নিয়ে যা পাতালে। জায়গা যেমন নিরিবিলি, হাওয়াও তেমনি শীতল।

মানুষটা তখন মুখ ফিরিয়ে ডাকে: এসো গো। মল্লিক-মশায় পাতালে পাঠাচ্ছেন।

এক মেয়ে উঠল ভাঙা-চাতালের আড়াল থেকে। পুরুষের তুলনায় বয়স বিস্তর কম—রীতিমত যুবতী।

মল্লিক জিভ কাটালেন: ছি-ছি! জোড়ে আছেন, আগে বলতে হয়! ওরে তারাপদ, পাতালে নয়, আকাশের উপর তুলে দিয়ে আয়। আমি যাই, ক্ষিতিনাথের চায়ের কদ্দুর হল তাগাদা করে আসি।

মেয়েটার দিকে নজর পড়ে মল্লিক শিউরে উঠলেন: মুখ শুকনো যে আমসির মতন। পুকুরের জলে তেষ্টা মেটে নি বুঝি? চিলেকুঠুরিতে জলের কুঁজোটা রেখে আসিস রে তারাপদ।

পুরুষ বলে, মুখ শুকনো ঠিক যে তেষ্টার কারণে তা নয়। মনের উদ্বেগে। দেহের উপর দিয়েও ধকল যাচ্ছে আজ ক'দিন।

শ্রীধর হুট করে প্রশ্ন করলেন: কেমনধারা উদ্বেগ—শুভকর্ম সারতে পারেন নি, না সেরে ফেলে এখন শেষরক্ষে হচ্ছে না?

পুরুষ থতমত খেয়ে যায়: বিয়ের কথা কিসে উঠছে?

তবে কোন্ কথা উঠবে, বলে দিন। চুরি-ডাকাতির কথা, খুনখারাবির কথা? বিয়েই করুন আর খুনই করুন, ঘাটোয়ালের কোন-কিছুতে আপত্তি নেই। নির্ঝঞ্ঝাটে আমাদের পারে পৌঁছে দেওয়া নিয়ে কথা। ঘাটের উপরে টানাহেঁচড়া হলে ঘাটের বদনাম পড়ে যায়, গোলমেলে খদ্দের তারপরে এখানে আর পার হতে আসবে না। ফাঁকা জায়গা ছেড়ে তাই বাড়ি ঢুকতে বলছি। বৈঠকখানা গরপছন্দ তো চোরকুঠুরি চিলেকুঠরি দরদালান মাঝের-কামরা যেখানে খুশি ঢুকে পড়ে আরাম করুন গে।

মেয়েটা বেশি চটপটে। একগাল হেসে বলে, আপনার বাড়ি—আপনিই বলে দিন না কোথায় ঢুকব।

বাস রে! কোন্ বাবদে পালাচ্ছেন, না জেনে কেমন করে বলি? হুলিয়ার ভয়ে পালাচ্ছেন তো মাটির তলের চোরকুঠুরি প্রশস্ত—পুলিশের বাপ-ঠাকুর্দা এসেও পাত্তা পাবে না। আর প্রেম করে পালাচ্ছেন তো বাড়ির চুড়োয় চিলেকুঠুরি—হাওয়ার

চোটে উড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিত, পারে না জানলায় মোটা মোটা লোহার গরাদে দিয়ে আটকানো বলেই।

নন্দ রাউত—মল্লিকঘাটের রান্নাঘরের এক ভৃত্য—বড় কেটলিতে চা ও একগাদা কাপ-ডিস নিয়ে হন-হন করে চলেছে।

মল্লিক ডাকলেন, দাঁড়া রে নন্দ, আমিও তোর সঙ্গে যাবো।

তারাপদকে শেষ হুকুমটা দিয়ে দিলেন : চিলেকুঠুরিতে এঁদের ঢুকিয়ে দিগে যা। বৈঠকখানার দিকে নিয়ে যাসনে, অন্দরের সিঁড়ি দিয়ে তুলবি। কুঠুরি খুলেই অমনি ঢুকিয়ে দিস নে, আচ্ছা করে খ্যাংরা পেটাবি আগে—

পুরুষ ত্রস্ত হয়ে প্রশ্ন করে : সে কি ?

তারাপদ মুচকি হাসল : ও আপনাদের কিছু নয়। চিলেকুঠুরির ছাতে চামচিকে ঝোলে, মানুষ যাবার আগে খ্যাংরা পিটে চামচিকে তাড়াতে বললাম।

খবরের-কাগজের শেষ পাতাটায় আস্ত ছবি। সেই পাতাটা লটকে দিয়েছে অধ্যাপক-পাড়ার ভিতরে সদর-রাস্তার এক দেয়ালের গায়ে। বাড়িতে কাগজ সবাই তো দেখে এসেছে একবার, রাস্তায় আবার ভিড় জমিয়ে ছবি দেখছে।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে না স্বপ্না? দেখ, ঠাউরে ঠাউরে দেখে নাও। দেশ-বিদেশের কত রকম বিক্ষোভ পড়েছ, সেই সব পড়া বৃত্তান্ত ছবিতে দেখছ এই।

শিকারী পুলিশ হাঁটু গেড়ে তাক করছে ইট। বুলেট টিয়ারগ্যাসে বড্ড খরচা, সে তো চলছেই, তার উপরে পুলিশে এখন ইট মারছে পাড়ার বজ্জাত ছেলেপুলের মতো। ঠেলাগাড়ি ও বড় বড় ড্রামে রাস্তা ব্যারিকেড-করা। জনহীন বড়রাস্তার ছবি—টিয়ার-গ্যাসের খালি খোল আর ইট-পাটকেল ইতস্তত ছড়ানো। রেলের গুমটিতে আগুন, ট্রেনের কামরা আগুনে দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

আর এক ছবি—পুলিশের গুলির ভয়ে দু-হাত তুলে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে চলেছে পথের মানুষ। ধরাধরি করে গুলিবিদ্ধ আহত মানুষটা নিয়ে যাচ্ছে ক্যামেরা-রেঞ্জের বাইরে এ্যাম্বুলেন্সে বোধহয়। আর দেখ স্বপ্না, ভূমিতে লুটিয়ে আছে জোয়ানপুরুষ-কিশোর-শিশুর মৃতদেহ কতগুলি। নিরীহ নিষ্পাপ মুখ, একজামিনের উদ্বেগ নেই, পেটের ক্ষিধেয় জ্বালাতন করবে না আর। স্বাধীন গণতন্ত্রের দেশ, সর্বসুখ সকল দিকে—শান্ত ঘুম ঘুমাচ্ছে কেমন চেয়ে দেখ।

তেমনি স্বপ্না, আর একটা ছবি। জালালাবাদ যুদ্ধের কিশোর-যুবারা পাশাপাশি পড়ে আছে। চট্টগ্রাম-বিপ্লবের শেষ অধ্যায়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে গেরিলা-যুদ্ধের সৈনিক তারা। লড়াইয়ে মরেছিল —মরা দেহগুলির উপর দিয়ে স্বাধীনতার সিঁড়ি আরও খানিক দূর উঠে গেল। সেই সিঁড়ি ধরে চূড়ায় চড়ে আজকের এঁরা গদি চেপে আছেন। এবং ইংরেজের অনুসরণে মারছেন দেদার—লড়াইয়ে নয়, অতর্কিত বন্দুক ছুঁড়ে।

হঠাৎ এই শিক্ষিত পাড়ার কোন্ বাড়ি থেকে কবিতায় কে অনেক দূরের তেঁতুলিয়া গাঁয়ের নুরুল ইসলামের মা-কে ডেকে উঠল :

> 'আমি হপ্তায় হপ্তায়
> তোমার কাছে যাবো নুরুলের মা।
> তুমি আমার জন্যে
> চাল না জুটলে
> কিছু সবজির ঝোল রেঁধে রেখো—
> ভোর ভাঙতে দেখবে
> কে যেন তোমার উঠোন নিকিয়ে রেখেছে,
> জল ছিটিয়ে দিয়েছে কুমড়োর চারায়।'

কৃষ্ণনগরের অভিজাত-ঘরের অপরিচিত ছেলেটা কতদূরে

বসিরহাটের গাঁয়ের গরিব চাষী-ঘরের বউ নুরুলের মা-র ছেলে হয়ে মাকে ডাকছে :

'আমি তোমায় কেমন অবাক করি দেখো তখন।
তারপর
নুরুল যেখানে বসে বসে চিৎকার করে পড়া করত
আমি সেই বকফুল-গাছটার নিচে
বই নিয়ে পাড়া মাতাব।'

ইস্কুলের মাঠের একপাশে নুরুলকে মাটি দিয়েছে। সেখানটা মাটি কিছু উঁচু হয়ে আছে, এইমাত্র নিশানা। কাঠের ফলকে আলকাতরা দিয়ে লেখা : 'ভাত চেয়েছিল, দিল ওরা বুলেট।'

ছেলেরা নিয়ম মতো বেলা দশটায় ইস্কুলে আসে, বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে যায় নুরুলের কবরের পাশ দিয়ে। নুরুল কি টের পায় মাটির নিচে থেকে, চাপা নিশ্বাসে কাঁপে মাটি? ফুটবল-খেলা হয় সে-মাঠে—কি জানি, নুরুলেরও ইচ্ছা করে কিনা ছেলেদের-সঙ্গে মাঠে নেমে পড়তে। রাত্রে ইস্কুলবাড়ি নির্জন। বর্ষা এলে ফিকে জ্যোৎস্নায় কামিনীফুলের গন্ধে বাগান ভরে যাবে। শীতের সময় অন্ধকার-রাত্রে শিয়ালের ডাক আসবে অদূরের বাঁশবাগান থেকে। ছোট ছেলের তখন যদি মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করে, মা-মা বলে কেঁদে কেঁদে আছাড়ি-পিছাড়ি খায়? মাটির নিচের ডাক কানে কি পড়বে আমাদের কারো?

আরও পরে এই কবরে ইটের গাঁথনি হবে। গাঁথনির উপর পাথর বসিয়ে বাংলা অক্ষরে খোদাই হবে : 'ভাতের বদলে বুলেট দিয়েছিলে আমায়।' কাঁটা-তারের বেড়ায় চতুর্দিক ঘেরা। গ্রীষ্মের ছুটির সময় মাঠে বিস্তর গরু-ছাগল চরে—লম্বা লম্বা ঘাসে ভরে আছে কবরের ঘেরটুকু, প্রলুব্ধ হয়ে ঘাড় ঢোকাতে যায় গরু ছাগল, কাঁটা-তারের জন্য পেরে ওঠে না। বাড়ছে ঘাস, বাড়ছে ভুঁইচাঁপার

ঝাড়, বাড়ছে ভ্যাড়াসেঞ্জির ডালপালা। পাথরের লেখা তার মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে—কারো নজরে পৌঁছয় না। জ্যোৎস্নারাত্রে দিনমান ভেবে আমডালের উপর কোকিল কুহুকুহু ডেকে উঠবে। শিয়ালে তাড়া করবে শজারুকে—ঝুনঝুন আওয়াজ তুলে শজারু পালাবে। সারারাত ধরে কত রকম খেলা, মায়ের শিশু কবরে শুয়ে চোখ মিটিমিটি করে দেখবে।

কেবল—

কেবল কোনো এক পরব-দিনে দুটো গ্রাম ছাড়িয়ে সেই গরিব চাষার খোড়োবাড়িতে মনে পড়ে যাবে পুরনো দিনের একটি নিরীহ নিষ্পাপ হারানো ছেলের কথা। বুড়ো বলে, কাল সকালে গিয়ে একবার দেখে আসব বউ—অ্যাঁ? মনটা বড় উতলা হল।

ভোরবেলা গাই দুয়ে ঘটি ভরে দুধ নেবে। বুড়ো লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আগে আগে যায়, বুড়ি দুধের ঘটি নিয়ে পিছনে। দুটো গ্রাম পার হয়ে গিয়ে ইস্কুল-বাড়ি। পাকা ইস্কুল-বাড়ি নতুন চুনকামে ঝিকমিক করছে। কবরে বড্ড ঘাস-জঙ্গল—কাঁটা-তারের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কতক্ষণ ধরে বুড়ি ঘাস ছিঁড়ল। একটা কাটারি সংগ্রহ করে আগাছাগুলো গোড়া মুড়িয়ে কেটে দিল। ঘটির দুধ ঢেলে দিল গাঁথনির উপর। দুধে ময়লা ধুয়ে পাথরের লেখা জ্বলজ্বলে হল : 'ভাতের বদলে বুলেট দিয়েছিলে আমায়।'

স্বপ্না, পাঁচ বছর সাত বছর পরের গল্পটা আমি এখনই বলে রাখলাম। কিন্তু এরই মধ্যে মুকুল আর একলা নেই—দিব্যি দল ভারি তার। ভাস্কর, মিশিরলাল, শিবচন্দ্র, সুজিতকুমার, কানাই, অনিল—দল বেড়েই চলেছে দিনকে দিন। দারবক্স মণ্ডল, আনন্দ তপন, ভানু—যেতে দাও আরও কিছুকাল, আকাশের তারা অথবা ধরণীর বালির মতন এদের আর গণে পারবে না।

ভানু আমাদের ঘরের ছেলে বললেই হয়। আহিরীটোলার

বাড়ি। বিনয়ী, পাবলিক-কাজ করতে ভারি ভালবাসে। কত ফাইফরমাস খেটেছে এতাবৎ—মুখ দিয়ে কথা একটুখানি বের করলেই হল।

ভাম্বু গিয়েছিল যাদবপুরে মামার-বাড়ি। রাত্রি ন'টায় বাড়ি ফিরছে এখন। আহিরীটোলায় আজ কার্ফু, রেডিও-য় নাকি বলে দিয়েছে। রেডিও শোনবার জন্যে কার বা মাথাব্যথা—চাবি ঘোরালেই তো সরকার হেনো করেছেন তেনো করেছেন, অমুক মিনিস্টার নৃত্যকালী সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার পারিতোষিক বিতরণ করলেন, তমুক মিনিস্টারনি মশক-নিবারণী সভার উদ্বোধন করলেন। কার্ফুর খবর ভাম্বু কিছুই জানে না।

পাড়ার কাছাকাছি এসে মালুম হল। মানুষজন নেই, থমথমে ভাব চারিদিকে। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। ভুজঙ্গর সঙ্গে দেখা। তারও ঠিক এই বিপদ।

কী করি বলো তো ভুজঙ্গ? হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে যাদবপুর ফেরা—তাতেও তো কার্ফু এলাকা এড়ানো যাচ্ছে না। এ-গলি ও-গলি করে টিপিটিপি এগোনো যাক—যা থাকে কপালে!

সঙ্গী পেয়ে সাহস বেড়েছে। (সঙ্গী পেয়েছিল বলেই আমরা ভাম্বুর শেষ বৃত্তান্ত পেলাম।) এসেছেও নির্বিঘ্নে, পুলিশের নজরে পড়ে নি। চোঁচা-দৌড় এবারে—রাস্তাটুকু পার হলেই তো হয়ে গেল। দুম করে গুলি। একটুকু আর্তনাদ—রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে ধপ্ করে মানুষ পড়ে যাওয়ার শব্দ।

কত শত কিশোর-বালক পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়েছিল, তার বুঝি লেখাজোখা নেই। কুঁড়েঘর থেকে আর্তনাদ উঠছে: ওরে আনন্দ, ফিরে আয়—

মায়ের বুকের ধন বেরিয়েছিল পথে। হাপুস-নয়নে মা

কাঁদছেন, আজ ছেলেটা বড় বেশি জ্বালাতন করছিল মাকে। দু-আনা পয়সা চাই-ই তার, তেলে-ভাজা খাবার ঝোঁক ধরেছে। চাই-ই চাই। বারবার তিনবার মিছে কথা বললেন মা: বাক্সর চাবি খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজছিই তো দেখতে পাচ্ছিস। মায়ের উপর প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে বেরিয়ে গেল। মায়ের বুকের মধ্যে হাঁক পেড়ে কে যেন মন্দ-কথাটা বলে দিল। ঘরের কাজে মন দিতে পারেন না, বারম্বার দরজায় গিয়ে পথপানে তাকিয়ে পড়েন।

সেই মন্দ-কথা সত্যি হয়ে মানুষের মুখে মুখে এসে পৌঁছল: মা, আনন্দ তোমার আর ফিরবে না।

আগুন হয়ে উঠে মা গালিগালাজ করেন: কে তুমি মিথ্যেবাদী! ফিরবে ঠিক আমার আনন্দ। ফিরবেই।

ঘাড় নিচু হয়েছিল তারপর আমাদের। সত্যিই আমরা মিথ্যেবাদী। ফিরেছিল আনন্দ—বড় সমারোহের ফেরা। রাজকীয় মিছিল লাস-কাটা ঘরের ছিন্নভিন্ন দেহটুকু নিয়ে। মিছিলের চূড়ায় সকলের কাঁধে কাঁধে আনন্দ ফিরে এলো কুড়েঘরে মায়ের কাছে। হাজার হাজার লোকে বয়ে এনেছে, সর্বদেহ ফুলে ফুলে ঢাকা। ফুলের গাদার ভিতরে হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা বেরিয়ে আছে—সব চেয়ে বড় ফুল আনন্দের মুখখানাই যেন।

কার্ফু-কবলিত শহর। জীবনের সাড়া নেই। দুরন্ত সংগ্রামের পরে যেন এক নিশ্চেতন পরিত্যক্ত জনপদ। দিন-দুপুরে মধ্যরাত্রির নিঃশব্দতা। নৈঃশব্দ ভেঙে চুরমার করছে ক্ষণে-ক্ষণে পুলিশ ও মিলিটারি বুটের আওয়াজ। আর, এক-একটা বাড়ির ভিতর থেকে নারী-শিশুর আর্তনাদ। বাড়ি ঢুকে পুলিশ জিনিসপত্র তছনছ করছে, যাকে খুশি গ্রেপ্তার করে জীপে নিয়ে তুলছে। পুলিশ ঢুকলেই চিৎকার ওঠে। তবু ভাল, আছে তবে মানুষ বেঁচে! এতক্ষণ তো ভাবছিলাম মড়ার শহর। রূপকথার মতন রাক্ষসে-খাওয়া পাতালকন্যার বাড়ি—ঘর আছে, ঘরে খাট-পালঙ্ক জিনিসপত্র আছে, কিন্তু মরা মানুষ। না, আছে তো জীবনের স্পন্দন—ভয় পেয়ে চেঁচানোর শক্তি বজায় আছে এখনো।

কিন্তু বাড়ির বেটাছেলেগুলোর এ কোন্ গতিক? ফ্যালফ্যাল করে দেখে যায় শুধু তারা। গ্রেপ্তার করল তো মন্থর পায়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। যেন সম্বিত নেই। ঘুমের ঘোরে যেন চলাচল।

থানার সামনে বিস্তীর্ণ মাঠে মিলিটারি ছাউনি। শহর জুড়ে রণাঙ্গণ—সাজ-সাজ গোছের ঘোরতর ব্যস্ততার ভাব অহর্নিশি। রাস্তার মোড়ে পুলিশ-মিলিটারি। সৈন্য আর পুলিশের টহল মেদিনী কাঁপিয়ে চলেছে।

কে যায়? হাত তোল—হাত তুলে তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাও।

কলের পুতুলের মতন মানুষটা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দ্রুতপায়ে পালায়। পুলিশ-কর্তা উচ্চহাসি হেসে সিগারেট ধরান।

এরই মধ্যে কী গতিকে খানিকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে। প্রাণহীন মুখের উপর জীবনের আভা। কোথায় ছিল ছেলেগুলো,

কোন্‌দিক দিয়ে এসে পড়ল। টিন বাঁশ কাঠ-কুটো ভাঙা-পিপে রোগা লিকলিকে ছেলেগুলো কোথা থেকে এনে এনে ফেলছে। রাস্তা জুড়ে ব্যারিকেড হল লহমার মধ্যে। কাজ সারা হতেই কোনদিকে কেউ নেই—হাওয়া হয়ে গেছে সবাই।

বিরতিহীন কার্ফু। যেমন তাঁদড়ামি, হোক মানুষ জব্দ। দোকান-বাজার তো বন্ধই, শিশুর দুধ অবধি মিলছে না—ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে বাচ্চারা। খাদ্যসঙ্কট পুলিশেরও—দূর-দূরান্তর যেতে হয় খাদ্যের তল্লাসে। যে অঞ্চলে কার্ফু নেই, জীপ নিয়ে চলে যায় সেখানে। জীপ দূরে রেখে কনস্টেবল সাদা-পোশাকে দোকানে ঢোকে। সরকারি লোক বলে খাতির-সম্মান আছে কি এখন মানুষের—পোশাক দেখে উল্টে হয়তো বেকবুল যাবে: নেই চাল-ডাল, কিচ্ছু নেই।

এক্ষুনি আসছি মা, চা তৈরি করতে লাগো।

বলেই তপন বেরিয়ে পড়ল। বীর জওয়ান তপন চৌধুরি, প্রাণ দিয়ে চিরজীবী হলেন—তিনি নন। এ তপনও তাই হতে পারত না, কে বলবে? কিন্তু বাঁচতেই তো দিল না।

আসছি মা—বলে তপন বেরুল। বিকেল চারটে তখন। অনেক করে বলি, বেরোসনে আজ বাবা, চারদিকে বড় গোলমাল। কানে নিল না—মায়ের হাতের চা না খেয়ে সরকারের বুলেট খাবার ডাক পেয়েছে, তখন বুঝতে পারি নি বাবা। কী সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে—আমার নয়নের মণি তপন।

তপনের মা ফুল্লরাণী দত্ত কান্নায় ভেঙে পড়লেন: আর তাকে কোনদিন আমি দেখতে পাব না।

নিষ্ঠুর একজন আমার কাঁধের উপর দিয়ে উঁচু হয়ে বলে দিল, পাবেন না কেন? এক্ষুনি মর্গে চলে যান, গাদার মধ্যে পড়ে আছে, দেখে আসুন গে।

সন্ধ্যা হল, রাত্রি হল। আঁধারের পাতলা গুণ্ঠনে শহরের মুখ ঢাকা পড়েছে। গা ছমছম করে। আনন্দ-তপনের মায়েদের মতন সারাদিনের রক্তস্নানে অবসন্ন শহরও যেন ক্লান্তিতে ঢলে পড়ল এবার। স্তব্ধ, নিস্পন্দ। আধ-পোড়া মোটর ও ট্রামগাড়ি হাড়গোড় বের-করা কঙ্কালের মতো পড়ে আছে এখানে-ওখানে।

কার্ফু বটে, তবু যত রাত বাড়ছে জন-মানুষ দেখা দিচ্ছে দুটো-পাঁচটা করে। গলিঘুঁজির মোড়ে তরুণ ছেলেরা। রাত হলে যেমন ভাবে গর্তের সাপ বেরোয়। বেরিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে—জীপের আওয়াজ পেলেই গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে আবার। বিপদ বুঝে সাপও গর্তে মুখ ঢোকায় এমনি করে।

আরও রাত হল। লড়াই বেধে গেছে, চোখে না দেখতে পাই—অনুভব করছি। অপার নিঃশব্দতা—গুলি আর বোমার আওয়াজে অকস্মাৎ নিঃশব্দতা ফাটিয়ে চৌচির করে দিল। সেই সঙ্গে কিছু বা আর্তধ্বনি। চুপচাপ আবার।

অদ্ভুত লড়াই। এক-পক্ষ পুলিশ-সৈন্য, অন্য পক্ষ—দেখতে পাইনে তো তাদের। মেঘের আড়াল থেকে ইন্দ্রজিৎ বাণ মারতেন, বোমা মারছে এরাও অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়িয়ে। লাঠির ঘা মেরে কিম্বা মই বেয়ে উঠে টপ-টপ করে একদল রাস্তার আলো জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছে। ওরা ওদিকে তৈরি হচ্ছে নেভানোর জন্য, জানালার কপাট অর্ধেক খুলে লক্ষ্য রাখছে। এক মজার খেলা দুই তরফে।

দিনমানে গুলি করে করে হত্যা করেছে—সেই থেকে চাপা উত্তেজনা। রাত্রির অপেক্ষায় ছিল—বদলা নেবে। এইবার, এইবার! আলো নিভিয়ে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে অঞ্চলটা। গেরিলা-লড়াই দস্তুরমতো। ক্র্যাকার ফাটছে অবিরত। দিশেহারা পুলিশ—প্রাণের ভয়ে ছুটোছুটি করছে। নির্নিরীক্ষ আততায়ী—তবু টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ে যাচ্ছে এদিক-সেদিক। পুলিশ আউটপোস্টে

আগুন। পোস্টাপিসে আগুন। সরকারি নাম-জোড়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠান দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে। দুধের ডিপো পর্যন্ত বাদ নেই। সরকারি দলের যারা মাতব্বর, দুমদাম করে বোমা ফাটছে তাদের বাড়ি। পুলিশের তরফেও পাল্টা টিয়ারগ্যাস, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। তার উপর ইটপাটকেলের লড়াই—এপক্ষে-ওপক্ষে। এত আছে পুলিশের, তা সত্ত্বেও আক্রোশে বাড়িগুলোর বন্ধ দরজা-জানলায় ইট মারছে। চোখে ঠিক দেখা যায় না—এত সব ভয়াবহ কাণ্ড নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে। টিপ-টাপ গুম-গুম আওয়াজ, বহু জুতোর ছুটোছুটি। আহত চেঁচাচ্ছে: বাবা রে, গেলাম রে, কে আছ বাঁচাও—

চলেছি আমরা। এতদিনের ঘনিষ্ঠ কলকাতা, এ-রাতে মনে হচ্ছে নিতান্তই অচেনা নতুন এক জায়গা। অন্ধকারের মধ্যে চলেছি, তারপর আলোয় এসে পড়লাম। চোখে ফুটছে উজ্জ্বল প্রখর আলো, হঠাৎ কিছু দেখতে পাইনে।

পুলিশ হাঁক ছাড়ে: এই, ঠারো—

দু-হাত তুলে অমনি দাঁড়িয়ে পড়েছি।

হাত তুলে খানিকদূর গিয়ে পুলিশের দৃষ্টি ছাড়িয়ে হাত নামালাম। ক্ষণপরে পুনশ্চ আদেশ: হাত তুলে চলুন—

সামনের বাড়িটার প্রতিটি দরজা-জানলা বন্ধ, গলিতেও মানুষের নামগন্ধ নেই। তবু এসেছে আদেশ—কে দিল, জানবার উপায় নেই। অর্থাৎ পুলিশ এলাকা ছাড়িয়ে এবার জনতার এলাকায় এসে পড়েছি। এ আদেশ আরও অলঙ্ঘ্য।

অন্ধকার চিরে ক্ষণে-ক্ষণে পুলিশের গাড়ির আলো। জোরালো ফ্লাশআলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। ফাঁকা চারিদিক, রাস্তায় আমরা এই ক-জন শুধু। হাত তুলে আছি। যে-ই পুলিশের জীপ এক ফার্লং মতন এগিয়েছে, প্রচণ্ড শব্দে বোমা পড়ে বিস্ফোরণ হল।

ক্রুদ্ধ পুলিশ ফিরে এসে গাড়ি থেকে মাটিতে লাফ দিয়ে পড়ে পাতি-পাতি করে খোঁজে। কা কস্য পরিবেদনা।

গেরিলা-যুদ্ধ খানিকটা বোধহয় এই রকম। ভিয়েতনামে যা চলেছে। পুলিশ ও মিলিটারির যেন শূন্যের সঙ্গে লড়াই। তেড়েফুঁড়ে এলো—কোন্‌খানে প্রতিপক্ষ ?

খানিক খোঁজাখুঁজি করে গালিগালাজ করতে করতে চলে গেল। পরক্ষণেই দেখি কোন্ মন্ত্রে দলে দলে ছেলেদের আবির্ভাব। মুহূর্তমাত্র দেরি নয়—সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে যায়। ইট-পাটকেলে রাস্তার আলো ভাঙছে, পেট্রোল ঢালছে বিরুদ্ধপক্ষের বাড়িতে।

চর আছে ছড়ানো। হুইসিল বেজে ওঠে কোন্‌দিকে হঠাৎ। লহমার মধ্যে ভোজবাজির মতো আবার সব ফাঁকা হয়ে যায়। পর-মুহূর্তে দেখি তীব্র আলো জ্বালিয়ে পুলিশের গাড়ি ছুটে আসছে।

গৃহস্থঘরের নিরীহ ছেলেপুলে এ-হেন লুকোচুরি খেলা শিখল কবে—কার কাছে ? হুয়েতেও শুনেছি এমনি। শান্ত মৃদুভাষী হাবাগবা চাষী ঘাড় নিচু করে এক বঙ্গ-সন্তানের কত প্রশ্নের জবাব দিল। তারপর যত রাত্রি বাড়ে, চেহারা পালটাতে থাকে তার। ক্রমশ ভিন্ন মানুষ। মিউ-মিউ করা মেনিবিড়াল বাঘ হয়ে আক্রমণ করে—দুর্ধর্ষ ভিয়েতকং এখন। এরাও ঠিক তাই। বাংলার বিপ্লবী ঐতিহ্য। পেডিকে হত্যা করছে মৃগেন, নিঃসংশয় হবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের বুকের উপর বসে পড়ল। সেই মৃগেন দত্ত আর তার সঙ্গী অনাথ পাঁজার ছবি দেখেছেন ? নিষ্পাপ দেবশিশু, তাকালে দৃষ্টি ফিরবে না। কোমল কচি বুক দুটোর নিচে এত বীর্য কেমন করে এসেছিল ?

ভোরের আলোয় শহরের কী উৎকট চেহারা! এখানে-সেখানে আগুন—ধোঁয়াচ্ছে কতক কতক জায়গায়, নিভে এসেছে, আবার কোথাও-বা দাউদাউ করে জ্বলছে এখনো। বাড়ির দরজা-

জানলা পুড়েছে—গাড়ি পুড়েছে—আধ-পোড়া কঙ্কাল দাঁত মেলে পড়ে আছে, এমনি দেখায়। গাদা-গাদা আধ-পোড়া কাগজ ফুরফুর করে বাতাসে উড়ছে। ন্যাড়া-ন্যাড়া পোস্ট—টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার ছিঁড়ে-খুঁড়ে তালগোল পাকিয়ে ছাইয়ের মধ্যে পড়ে আছে। আস্ত পোস্টও উপড়ে পড়ে আছে কত মাটিতে।

মস-মস মস-মস ভারী বুট বাজিয়ে মিলিটারি মার্চ করে যাচ্ছে। এক বাড়ির তেতলার জানলা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল—টমিগান ব্রেনগান চকিতে উদ্যত জানলার দিকে। কিন্তু মানুষ নেই—পোস্টার ঝুলছে। বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা: খাদ্য দাও, খাদ্য দাও। পোস্টারে গুলি মেরে কি হবে? লুঠ-করা রেশন-অফিস—কয়েকটা কেনেস্তারা রাস্তায় উল্টে পড়ে রয়েছে। মন্ত্রীমশায়ের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, পুলিশে ঠেকাতে পারে নি। মানুষের ভয়-ডর ভেঙেছে। কোন্ দিক থেকে কার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো:

বীরের এ রক্তস্রোত,
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায়
হবে হারা?

বেহালায় এক বাপ প্রচণ্ড শক্তিতে বুক চাপড়াচ্ছিলেন, হাড়-পাঁজরা ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ফেলেন বুঝি। যেন অসুরের বল, তিন-চার জনে ধরে আমরা ঠেকাতে পারিনে। বলছেন, মহাপাপী আমি। চিরজীবন রাজনীতি করে দেশভাগের কারণ হয়ে হাজার হাজার মানুষ-বধের নিমিত্তভাগী হয়েছি। আমার ছেলে সেই মহাপাপের ফলে মারা পড়ল।

পুকুরঘাট থেকে মড়া তুলে বারান্দায় এনে শুইয়ে দিয়েছে। প্রাইমারি ইস্কুলে পড়ত, নিতান্তই বালক। টিয়ার-গ্যাসের

ধকলে চোখ জ্বালা করে জল এসেছে—ঘাটে নেমে জলের ঝাপটা দিচ্ছে চোখে-মুখে। জনতা গলিঘুঁজিতে ঢুকে যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়ে আছে। বেল্ট এঁটে ভুঁড়ি সামাল দিয়ে ভিন্ন-রাজ্যের আমদানি পুলিশ যখন এসে পড়ল, বিরুদ্ধ-দল তখন আর দেখতে পায় না। মানুষই নেই। দুটো-একটা গরু-ছাগল খুঁটে খুঁটে ঘাস খাচ্ছে। তাদের অবশ্য নির্বিঘাটে মারা যায়, কিন্তু অবোলা বধ করে সুখ নেই।

মানুষ বলতে তখন ঐ শিশু। দুম করে গুলি। ক্ষীণ আর্তধ্বনি—আকাশের দিকে হাত দু-খানা মুঠি করল একবার। না, আকাশে কেউ নেই—ভগবান নেই, যদি থাকেন তিনি অন্ধ। জল খানিকটা রক্তাক্ত হয়ে আবার আগের মতন হয়েছে। শিশু পড়ে গেল জলে।

কোথায় ছিল মানুষ—কোন্ গাছের আড়ালে, কোন্ ঝোপ-ঝাপের ভিতর, কোন্ কুড়েঘরের আস্তানায়। বুকের মধ্যে কী আগুন জ্বলল—ছুটে বেরিয়ে এসে ঝপাঝপ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পুলিশই বা পরাজয় মানবে কেন? বন্দুক তাক করেছে। জল থেকে উঠে দৌড়ে মানুষরা বন্দুকের নলের মুখে মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফড়ফড় করে জামার বোতাম ছিঁড়ে বুক আলগা করে দাঁড়িয়েছে: মারো না আমাদের—এই বুকে মারো। বন্দুক আমরা ডরাইনে। ইংরেজ অনেক মেরেছিল। অনেক মরে মরে, তারই ফলে তো তোমরা এসেছ।

বন্দুকের মুখ আপনাআপনি নিচু হয়ে পড়ল। মৃতদেহ ধরাধরি করে জল থেকে তোলে। বন্দুক রেখে পুলিশও সঙ্গে ধরেছে। বাড়ির বারান্দায় এনে শুইয়ে দিয়েছে।

॥ বাইশ ॥

রক্তের খেলা চলছে। তার মধ্যে হোলি এসে পড়ল। রঙের খেলা। মস্তবড় প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষ করে বিরাট মচ্ছব হয় প্রতি বৎসর। সেই আয়োজন এবারও।

নবদ্বীপের ডাকাবুকো ছেলে। বলিষ্ঠ উদারচরিত মহামানব। পুরানো সংস্কার জীর্ণমন্ত্রের মতো দূরে ছুঁড়ে দিলেন। হিন্দু আর মুসলমানে তফাত মানেন না— ঐক্যমন্ত্রে সমাজের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিলেন তিনি। কাজির হুকুম অমান্য করে গানের মিছিল বের করলেন নবাবের নিষিদ্ধ এলাকা দিয়ে। দামাল ভক্ত-মানুষ শাস্তির ভয় মানেন না—ইজ্জত বাঁচাতে কাজিই তখন নিষেধ তুলে নিল। দীপ্তিমান সেই পুরুষের জন্মতিথি-পালন ললিতা-সখিবর্গের 'সখি আমায় ধরো ধরো' ইত্যাকার মোলায়েম কণ্ঠকাকলী সহযোগে। আনুষঙ্গিক বক্তৃতাদি আছে, ঝোঁকটা সেদিকেই— দোললীলার প্যাঁচে ফেলে মানুষকে কিছু বক্তৃতা শোনানো।

একশ-চুয়াল্লিশ ধারা চলছে, হাজার হাজার লোকের সভা কেমন করে হবে?

ধর্মের ব্যাপার। তার উপর ভি. আই. পি.মশায়দের উদ্যোগ। যারা গুলির হুকুম দেয়, এদিকে আবার মহাভক্ত তারাই। কীর্তনানন্দে মানুষের মনের গুমট কেটে যাবে। তা ছাড়া আরও আছে। পুঁটিরামের বক্তৃতা হবে আজ এখানে, গৌরাঙ্গপ্রভুর মতোই আচণ্ডালে তিনি প্রেম বিলোবেন। দু-এক জায়গায় মুখ খুলতে গিয়ে পিঠ বাঁচানোর তাগিদে শেষটা পালিয়ে বাঁচেন। ধর্মের অজুহাত নিয়ে আজকে হাজার কয়েক লোকের সামনে মনোমত বক্তৃতা ঝাড়তে পারবেন একখানা।

প্ল্যাটফরমে উঠে পুঁটিরাম দাঁড়িয়েছেন। পুরো একটি মাস পরে। ধর্মসভায় সশস্ত্র-পুলিশ বড় দৃষ্টিকটু—দূরে তারা, প্যাণ্ডেলের বাইরে। ধুতিপাঞ্জাবি-পরা ভক্তজনেরা প্ল্যাটফরমের চতুর্দিক ঘিরে বসেছে। পাঞ্জাবির নিচে কোমরে হাত বুলিয়ে দেখুন দিকি —জপের থলি নয়, বেল্টে-বাঁধা রিভলভার। এই ভক্তেরা গৌরাঙ্গভক্তির ধার ধারে না, ষোলআনা আইনসম্মত পুলিশ—সাদা-পোশাকের পুলিশ এরা। পুলিশ ছাড়া জনদরদি নেতার বেরুনোর জো নেই। ইংরেজ সেকালে এই মানুষকেই জেলে পুরে কড়া পুলিশ পাহারায় রাখত। অবস্থার ইতরবিশেষ হয় নি—আমাদের মাথার চূড়ামণি হয়ে এখনো পুলিশ পাহারায় থাকেন সদাসর্বদা। আপনি আমি ইচ্ছা মতন হুট করে বেরিয়ে পড়ি, বেরুন দিকি উনি কেমন!

বিস্তর কাল পুঁটিরাম জনতার মুখ দেখেন নি। সভা না করলে খবরের-কাগজে ছবি ওঠে না—লোকে শেষটা ভুলে যাবে, নাদুসনুদুস চেহারাখানার নাম বলে পরিচয় দিতে হবে। পুঁটিরামের ছবি নেই, অথচ নিয়মিত খবরের-কাগজ বেরুচ্ছে—ফাঁক ভরাট করছে রবিঠাকুর বিবেকানন্দ সত্যেনবোস এবং হতচ্ছাড়া গায়ক-বাদক লেখক-সাংবাদিকদের দিয়ে। পুঁটিরাম ও তৎগোষ্ঠীর রিজার্ভ-করা জায়গা অন্যে দখল করে নিচ্ছে—কাগজ হাতে ছুঁতেই ইদানীং পুঁটিরামের মন হু-হু করে, আতঙ্কিত হন তিনি।

ও-মাসে জেদ করে গেলেন এক ইস্কুলে প্রাইজ-বিতরণের সভাপতি হয়ে। সামান্য ইস্কুলের সভায় পুঁটিরাম হেন নেতা। দীর্ঘদিন নর-খাদ্য না জুটলে উপোসি ম্যান-ইটার খালে নেমে চুনোমাছ ধরে খায়—ঠিক সেই ব্যাপার। মোসাহেবরা মানা করেছিল: ডামাডোলের মধ্যে যাওয়া কি ঠিক হবে? কিন্তু উদ্যোক্তারা অভয় দিয়েছে: ভলান্টিয়ারের দরাজ বন্দোবস্ত।

সামনের সারিগুলো শ্রোতা হয়ে তারাই সব জুড়ে বসেছে—টুঁ শব্দ হতে দেবে না কোনদিকে।

হরি, হরি! যারা রক্ষক, তারাই ভক্ষক—বেইমান ভলান্টিয়ার ছোঁড়াগুলো। গোলমাল সামলাচ্ছে: চুপ, চুপ—ইস্কুলে সার এই প্রথম ঢুকেছেন। হাঁটা না-শেখা ইস্তক রাজনীতি করছেন, ইস্কুলে আসার আজই কেবল সুযোগ হল! শুনতে দাও, কী বলছেন। সাঙ্গোপাঙ্গরা চোখ টেপে: দু-কথায় সেরে উঠে পড়ুন সার, তাড়াতাড়ি বেরোন। পুঁটিরামও বুঝেছেন সেটা, প্রাইজ-বিতরণের ভার অন্যের উপর চাপিয়ে, কাজ আছে—বলে উঠলেন। বণ্ডা বণ্ডা বেছে ভলান্টিয়ার করেছে—সৌজন্যের আবরুটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিল তারা: মাইরি আর কি! গেলে ছাড়ছে কে? প্রাইজ না ই দিলেন, ইস্কুল কথাটা ইংরেজিতে অন্তত বানান করে যেতে হবে। এস কে ইউ—তার পরে? দ্রুতপায়ে পুঁটিরাম গাড়ির দিকে চলেছেন—মোটা থপথপে দেহ নিয়ে প্রাণের দায়ে দৌড়ানো। গাড়ি সাঁ করে পুঁটিরাম সহ বেরিয়ে গেল। পিছনে ভলান্টিয়াররা বলছে, পুঁটিরামকে ঠেকাবে কে? ফোর-ফর্টি রেসে গেলে নির্ঘাৎ ওঁর ফার্স্ট-প্রাইজ।

মাসখানেক আগে এই কাণ্ড ঘটেছিল। তারপরে ধার্মিকদের সভা। মঞ্চে উঠে পুঁটিরাম চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘোরালেন। ভারি প্রসন্ন। ভক্তিমান-ভক্তিমতীদের ভিড়—বুড়োবুড়ি অধিকাংশ। আগে থেকেই সজল চোখ নিয়ে এসেছে—ভক্তির কথা কান্নদা মতন দুটো-চারটে ছাড়লেই কেঁদে ভাসাবে। সুবর্ণসুযোগ মিলেছে, মনোরম একখানি বক্তৃতা পুরো ঘণ্টা ধরে। এতদিনের উপবাসের শোধ তুলে নেবেন।

গলা খাঁকারি দিয়ে 'বন্ধুগণ' সম্বোধন ছেড়েছেন। গৌরাঙ্গ মহিমা-কীর্তনে সমুদ্যত—আরে সর্বনাশ, ভক্তদেরও এই ব্যবহার! শয়তানগুলোর সঙ্গে তফাৎ রইল কী তবে?

খুনীর মুখে গৌরাঙ্গ-কথা শুনব না (অর্থাৎ, এদের কর্তৃত্বের সময়ে নুরুল ইসলাম ইত্যাদি মারা গেছে, তাই এঁরা খুনী হয়ে গেলেন)। শেম, শেম! পুঁটিরাম মুর্দাবাদ!

চতুর্দিকে ধিক্কারধ্বনি।

পলিতকেশ কয়েকটি বৃদ্ধ সামনে বসেছেন—চ্যাংড়ার বেহদ্দ—পকেটের ক্ষুদে ক্ষুদে কালোনিশান বের করে তুলে ধরেছেন মাথার উপর।

আর সবচেয়ে বিদঘুটে ব্যাপার—মেয়েদের জায়গা দক্ষিণ দিকটায়, পাক দিয়ে সব মেয়েলোক পিছন ঘুরে বসল। বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে পুঁটিরাম মুখ দেখছেন না—পিছন দিক। ইট-পাটকেল লাঠিসোটা সোডার বোতল ছুঁড়ল না ঠিকই। ছুঁড়লে তো পুলিশ সভাস্থলে আসার ছুতো পেয়ে যেত। হাতে না মেরেও বড্ড জবর মার মারল। পুঁটিরাম বসে পড়লেন। এবং পরমুহূর্তে সভার বাইরে।

মৌন-মিছিলের তারিখ পড়েছে। কাঁদব না, গালি দেবো না, স্লোগান নেই—নিঃশব্দ শোকের মিছিল। রাজ্যব্যাপী হরতালেরও তারিখ পড়েছে। আপাতত চব্বিশ ঘণ্টা—বিরতিবিহীন।

ছাইরঙের মিলিটারি গাড়ি রাস্তা কাঁপিয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই—শেষ হয় না আর। হেলমেট-পরা জওয়ানেরা গাড়ির মধ্যে দু-ধারে সারবন্দি দাঁড়িয়ে। দুটো গাড়ি মোড়ে গিয়ে থামল—টুকটুক করে জওয়ানেরা ভুঁয়ে লাফিয়ে পড়ে। মার্চ করে যাচ্ছে—নিঁখুত একখানি চলন্ত ছবি, দাঁড়িয়ে দেখবার মতো।

কে-একজন উদ্দেশে রসিকতা করল: এ লড়াইয়ে নির্ঘাৎ জিত। কোনো সন্দেহ নেই। কচ্ছে তো মুক্তকচ্ছ হয়ে পড়েছিলে বাপধনেরা, নেফায় ল্যাজে-গোবরে। এবারকার শত্রুর হাতে

হাজিরার নেই—বিজয় তোমাদের ঠেকায় কে? আগেকার সমস্ত অপমানের শোধ তুলে নাও।

প্রবীণ এক ব্যক্তি ভর্ৎসনা করে উঠলেন: ছিঃ, ঠাট্টাতামাসা এদের নিয়ে কদাপি কোরো না। অভিজিত চাটুয্যে তপন চৌধুরি এরাই, ঠিক এদেরই মতন ছিল তারা। সোনার ছেলে সব, দেশের মানুষের চোখের মণি। দিন নেই রাত নেই, শীত নেই বর্ষা নেই, আহার নেই বিশ্রাম নেই—দুর্গম বর্ডারে পাহারা দিয়ে ফিরছে।

সেই সুরে সুর মিলিয়ে আর একজন বলে, আমাদের এত ভালবাসার জওয়ানদের লাগাচ্ছে ক্ষুধার্ত মানুষ পেটানোর কাজে। পাপের অন্ত আছে ওদের! মুখে অন্ন দেবার ক্ষমতা নেই তো বুলেটে বুক ফুটো করে দিচ্ছে—করাচ্ছে আবার জওয়ানদেরই হাত দিয়ে। সাধারণ মানুষ অতশত তলিয়ে বিচার করতে পারে না—বলছে, দেখ, মেয়েরা জ্যাম-জেলি বানিয়ে সোয়েটার বুনে ভাইফোঁটার মিঠাই-ফোঁটাচন্দন ফ্রন্টে পাঠিয়েছিল, তারই শোধ দিচ্ছে এখন স্বামী সন্তানের উপর বন্দুক তাক করে।

চা পৌঁছে দেবার কথা বড়বাগে। মল্লিকঘাট থেকে কমসে-কম এক ক্রোশ। কাস্টমসের ক্ষিতিনাথ বাগচি বলেছেন—দিতেই হবে অতএব। ঘাটোয়ালের এঁরা গুরুঠাকুর বিশেষ—এঁদেরই করুণায় করে খাচ্ছে। এঁরা এবং বর্ডার-পুলিশ উভয়ের যুক্ত করুণায়। এই যে ক্রোশ খানেক দূরে গিয়ে ঘাঁটি নিয়েছেন, সে-ও ঘাটের কথা বিবেচনা করে—ঘাটের উপরে দোষ না অর্শায়। মল্লিকঘাটে শনির দৃষ্টি পড়েছে রে—এখন থেকে অন্য ঘাটে পারাপার, ও-ঘাটে ভুলেও কেউ পা বাড়াসনে। এমন কথা যাতে না উঠতে পারে।

চা এবং নন্দ রাউতের সঙ্গে সঙ্গে খোদ শ্রীধর মল্লিক বড়বাগে এসে হাজির। আম-কাঁঠাল নারকেল-শুপারি ও তালগাছে ঠাসা

বড়বাগ। বড়লোকের শখের বাগান ছিল—বর্ডারের উপর পড়ে যাওয়ায় বাগানের মমতা ছেড়ে মালিক সরে পড়েছেন। সবাই শ্রীধর মল্লিক নয়, আনোয়ারের মতন বিশ্বস্ত সহকারী সকলের থাকে না। বড়বাগের গাছপালা বিস্তর কেটে ফেলেছে, তবু আছে এখনো অগুন্তি। গাছতলায় আগাছা ও কাঁটাবন। তারই মধ্যে ক্ষিতিনাথ ব্যস্তভাবে বিচরণ করছেন।

নজরে আসে কিছু?

উঁহু—

জবাব এলো অত্যুচ্চ নারকেলগাছের বাগড়োর অন্তরাল থেকে। জবাবদাতা বাগড়োর ভিতরে অদৃশ্য।

ক্ষিতিনাথ ববললেন, নেমে একঢোক চা খেয়ে যাও তবে।

চায়ের নামে মানুষটা সড়াত করে নেমে এলো। ক্ষিতিনাথ বললেন, বিস্তর জায়গা বেড় দেওয়া হয়েছে। কাছাকাছি না-ও থাকতে পারি আমরা। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই সিটি মেরো। কেউ-না-কেউ ছুটে আসব।

চা খেয়ে লোকটা আবার নিজস্থানে উঠে গেল। কাঁদি কাঁদি নারকেল ফলেছে—লোকটার মাথা হঠাৎ মনে হবে কাঁদিরই একটা নারিকেল।

কাপে চা ঢেলে ক্ষিতিনাথ ঢকঢক করে একলাই তিন কাপের মতো খেয়ে নিলেন। বলেন, সবাইকে খাওয়াচ্ছিনে। নেহাৎ লোকটা নিচের আয়োজন চোখে দেখতে পাচ্ছে—ডাকতে হল তাই। সেপাই তো পল্টন বিশেষ, মাইল ধরে সাজিয়েছি। সবশুদ্ধ খাওয়াতে হলে আপনার কেটলিতে কুলোবে না। পাঁচটা সাতটা বালতি চায়ে ভরতি করে আনতে হবে। আপনি নিজে কেন এসেছেন মল্লিকমশায়? লজ্জা লাগছে।

শ্রীধর বিনয় করে বললেন, তাই হয় কখনো। তল্লাটে পায়ের ধূলো পড়েছে—বৈঠকখানায় বসিয়ে খাওয়ানো গেল না, ব্রহ্মা-বিষ্ণু

নারায়ণীসেনা সকলকে একসঙ্গে দেখে মক্কেলে ঘাবড়ে যাবে। নিজে তাই চলে এলাম।

সুযোগ মিলেছে তো কথাটা পাড়লেন এইবার: একটু দরকারও ছিল বাগচি সাহেব। মারফতি কথায় হয় না, সরেজমিনে নিবেদন করব বলে এসেছি।

সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন ক্ষিতিনাথ।

চাট্টি চালের আবশ্যক। দস্তুরমতো বনেদি ঘর—এখন তাদের উপোসি থাকার গতিক।

ক্ষিতিনাথের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। বললেন, বেড়াজাল ফেলেছি—দেখতেই পাচ্ছেন। উঠবে রুই-কাতলা কি পুঁটি-খলসে—কিম্বা শুধুমাত্র ঝাঁঝি-শেওলা, কিছুই বলতে পারছিনে। নেমেছি অবশ্য পাকা-খবর নিয়েই—কিন্তু আমাদের উপরেও খবরদারি থাকে, বেগতিক বুঝে পথ পালটে ফেলল হয়তো। কিম্বা চলাচল বন্ধ করে হাত-পা কোলে নিয়ে বসে পড়ল। রাত্রি জেগে তাহলে পণ্ডশ্রম আমাদের। থেকে যেতে বলুন আপনার সেই বনেদি মক্কেলকে, জালে কি পড়ে দেখা যাক। তাঁর কপাল আর আমাদের হাতযশ।

॥ তেইশ ॥

'আজকে মিছিলে স্বপ্না তোমায়
বাসর পাতার সময় নাই,
তার চেয়ে এসো মৌন-মিছিলে
বুকের আগুন ছড়িয়ে যাই।
নতুন সমাজ—নতুন হৃদয়—নতুন কবিতা
মিছিল চায়।
ক্ষুধার মিছিল, দাবির মিছিল,
মৌন-মিছিল—মিছিল যায়।'

মিছিলের বিরাট তোড়জোড়—কর্তা কে জানা নেই, আপনা-আপনি কলে হয়ে যাচ্ছে যেন। মিছিলের নগরী কলকাতা জুড়ে মৌন-মিছিল।

চার দেয়াল জুড়ে ঠাকুর-দেবতার পট। সকালে মা-জননী ঘুরে ঘুরে সকলকে প্রণাম করেন। আজকে বড় গা কাঁপছে। এক-শ চুয়াল্লিশ ধারার মধ্যে এত বড় কাণ্ড হতে যাচ্ছে—কত প্রাণ যাবে তার লেখা-জোখা নেই। কত ছেলে—হয়তো-বা মেয়েও—মুখ থুবড়ে পড়বে, রক্তের ধারা বয়ে যাবে কালো পিচের রাস্তায়।

অন্নপূর্ণার পটের সামনে এসে মায়ের দু-চোখে জল ভরে এল। পটের ছবি চারখানা হাতে অন্ন বিলোচ্ছেন—মা সামনে দাঁড়িয়ে সজল চোখে বিড়-বিড় করে মন্ত্র পড়ার মতো বলছেন, অন্ন দাও গো জননী, দেশের মানুষ চাট্টি পেট ভরে খাক। দশভুজে বিচিত্র প্রহরণ-ধারিণী দুর্গার কাছে গিয়ে বলছেন, তোমার বাংলাদেশে অসুরের উৎপাত বড্ড বেড়েছে মা, সোনার রাজ্য শ্মশান করে ফেলল। পেটের খিদেয় যারা হাহাকার করছে, তাদের কেন মারবে? খিদের অন্ন থেকে যারা মানুষকে বঞ্চিত করে রাখছে

তারা মরুক। অস্ত্র হানো মা তাদের উপর, আর হানো টাকা খেয়ে যারা এই খুনেদের আড়াল করে রেখেছে।

চড়াৎ করে মা-জননীর একটা কথা মনে উঠল ঘরের ছেলেটাকে আজ তো আটকে রাখা দরকার। হাঙ্গামার মধ্যে ঢুকে না পড়ে।

টিপিটিপি গিয়ে মা ছেলের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে এলেন। উঠে দেখবে বন্দী সে। কী মজা—ছটফট করবে, বেরুতে পারবে না।

কর্তা মনোযোগে খবরের-কাগজ দেখছেন। দেখেই বা কী—কিচ্ছু থাকে না কাগজে, ওদের কিছু লিখতে দেয় না। নরমে-গরমে মুখ বন্ধ করে রাখে। ঠেসে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে: চেপেচুপে লিখো বাপধনেরা—বিবেচনা করো, কত টাকা খাওয়াচ্ছি। বেসামাল লিখে বীরত্ব দেখাতে গিয়েছ কি বিলকুল বিজ্ঞাপন-বন্ধ। এবং কোন্ অজুহাতে জেলে পোরা যায়, সেটাও তখন বিবেচনার বিষয় হবে। কাজেই নিতান্ত যেটুকু না থাকলে গ্রাহক বিগড়াবে, সেই খবর মাত্র ছাপা হচ্ছে।

কাগজ পড়া শেষ করে কর্তা রাস্তায় বেরুলেন। রাস্তার পাশে এ-পাড়ায় সে-পাড়ায় হাতে-লেখা কাগজ সাঁটা থাকে, তাতে কিছু সাচ্চা খবর পাওয়া যায়—কর্তা তাই খুঁজে খুঁজে বেড়ান। লোকমুখেও বিস্তর নতুন কথা শোনা যায়—যা ঘটে নি তা-ও লোকে বানিয়ে বলে। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর কর্তা বাসায় ফিরলেন—খবরের ভাণ্ডার তখন রীতিমতো ভরভরতি। এখারে ইজিচেয়ারে শুয়ে চুরুট ধরিয়ে মনে মনে ঝাড়াই-বাছাই করবেন। এবং খবরের জাবর কাটবেন সমস্ত দিন ধরে। অফিস বন্ধ থাকার দরুন এই তাঁর নিত্যি দিনের কাজ হয়েছে।

মা এসে কর্তার কাছে ছেলে আটকানোর খবর দিলেন।

কর্তা তিক্তকণ্ঠে বললেন, কথায় কথায় মানুষ-মারা এরা

ইংরেজের কাছ থেকে পেয়েছিল। কিন্তু অহিংস গান্ধী-শাগরেদরা এই ক'টা বছরের মধ্যে ইংরেজকে গো-হারান হারিয়ে দিল এই বাবদে।

মা সকলকে সতর্ক করেন: খোকার ঘরের ওদিকে যাবে না কেউ তোমরা। ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক। সাড়াশব্দ হলে জেগে উঠবে, বেরোবার জন্য গোলমাল করবে। দরজার শিকল কেউ খুলে না দেয়। আমরা কেউ দেখাই দেবো না, ঠাকুর শুধু জানলা দিয়ে চা দিয়ে আসবে।

রাস্তা থমথম করছে। ঝড়ের আগে যে ভাবটা হয়। বড়রাস্তার উপরে বাড়ি। অনতিপরেই যে-কুরুক্ষেত্র বাধবে, বারাণ্ডা থেকেই তার খানিক খানিক দেখা যাবে। মা-জননী ভারি খুশি— যে কাণ্ডই ঘটুক, নিজের ছেলে তার মধ্যে নেই। কাল খুব খাটা-খাটনি করেছে নিশ্চয়, রাত করে ফিরেছে। এত বেলা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে তাই। খাসা হয়েছে, আমাদের কোন দোষ রইল না। তুমি তো বলো নি সকাল সকাল ডেকে তুলে দিতে, আমরা কি জন্যে ডাকতে যাব?

রেলিঙে ঝুঁকে মা রাস্তার দিকে তাকিয়েছেন। নিঃশব্দ চারিদিক। বাসনের ঝাঁকা নিয়ে ফেরিওয়ালা যাচ্ছে—অন্যদিন চিৎকারে পাড়া মাথায় করে, সে-ও আজ রা কাড়ছে না। আর স্রোতের জলের মতো মানুষ চলেছে সুবোধমল্লিক-স্কোয়ারের দিকে। একটি কথা নেই কারো মুখে, বোবা হয়ে গেছে সব মানুষ।

আরও বেলা হল। প্রখর রোদ। মিছিল বেরুল এইবার। চা দিতে গিয়ে ঠাকুর উঁকি দিয়ে দেখল, এখনো খোকাবাবু সেই একভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। মা'কে এসে বলল। ভয়ের কথা। কী না-জানি ব্যাপার—সত্যি সত্যি অসুখ করে করে গেল নাকি?

মা ছুটে গিয়ে দরজা খুললেন। নড়াচড়া নেই ছেলের, মা'র ভয়

করছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও লড়াই করে এ ছেলে, খাটের এদিক-ওদিক চক্কোর মারে। ঢাকা চাদর তুলে ফেললেন মা।

হরি, হরি। ছেলে কোথায়, পাশবালিশ। পাশবালিশটা শিয়রের বালিশের উপর পরিপাটি করে শুইয়ে চাদর ঢাকা দিয়েছে—যেন ঘুমুচ্ছে একটা মানুষ। চালাক ছেলে—ঠিক ধরেছে, মা তাকে আটকানোর বন্দোবস্ত করবে। রাত থাকতেই সরে পড়েছে মায়ের ঘুম ভাঙার আগে। মাকে ভালবাসে তো খুব—বালিশ ঢাকায় কারসাজি করেছে মায়ের উদ্বেগ যত বেলা অবধি ঠেকিয়ে রাখা যায়।

মা নিশ্বাস ফেলে ঘরের দেয়ালকেই বোধহয় সম্বোধন করে বললেন, স্রোতের জল ঠেকানো যায় না রে—পথ করে নেবেই।

একটা টুল টেনে রাস্তার উপরের বারাণ্ডায় গিয়ে বসলেন। কাজকর্মে রান্নাবান্নায় মন নেই। হায় হায়, কত ছেলে মরবে রে এক্ষুনি।

মন্ত্রী, আধা-মন্ত্রী, সিকি-মন্ত্রী এবং যাবতীয় হোমরাচোমরা-পার্ষদ-মোসাহেব-যোহুকুমদের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ। টকটকে রাঙা।

কেঁদেছে?

কাঁদতে যাবে কোন্ দুঃখে? গণতন্ত্রের রাজ্য, মেজরিটির মাথায় চড়ে আছেন ওঁরা। সে যদি হয়, সামনের কোনো একদিন—এর পরের ইলেকসনে।

রাতভোর কাল এঁরা সব যাত্রা শুনেছেন। এক আধা-মন্ত্রীর আয়োজন। জবর জমেছিল। বড়রা সবাই নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। আসলেও বড় কেউ বাদ ছিলেন না। সবাই যাত্রারসিক।

বাড়িতে থাকতে বুক ঢিবঢিব করে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশের দঙ্গল পাহারায় মোতায়েন, তাহলেও মানুষ তো বটে সেই

পাহারাদাররা—দেশি মানুষ। বিশ্বাস নেই—পাহারাদারেই হয়তো গা বাঁচিয়ে দূরে দূরে নয়ন ভরে দেখতে লাগল, পেট্রোল ঢেলে অলন্ত দেশলাই-কাঠি ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেরা দে-ছুট্। কেষ্টনগরে যে কাণ্ড ঘটেছিল।

কত সব মজাদার টিপ্পনী লোকের মুখে মুখে। শতকণ্ঠে তারিফও করছে: পাকা বুদ্ধি কী রকম! নইলে এত জ্ঞানীগুণী টপকে ঐ দরের মানুষ হাফ-মন্ত্রী হয়ে চূড়োয় উঠতে পারে! যাত্রা অন্তে আজকেই বা ডামাডোলের মধ্যে কেমন করে বাড়ি ফেরে—নিরাপদ দুর্গের মধ্যে বসত হয়ে যাচ্ছে, কারো কিছু বলবার নেই। আজকের পরেও আর কত দিন থাকতে হয়, তাই দেখ।

মিছিলের নগরী—ক্রুদ্ধ জওহরলালের নামকরণ। এমন নিরামিষ দিন যায় না, যেদিন কোন-না-কোন মিছিল নেই। কিন্তু আজকের এমনধারা মিছিল সেই জব-চার্নকের আমল থেকে কলকাতা কখনো দেখে নি।

জনতরঙ্গের উপর জনতরঙ্গ। নগরী উদ্বেল। সহস্র ধারায় নানাদিক থেকে মানুষ এসে সুবোধমল্লিক-স্কোয়ারে জমায়েত হচ্ছে। স্কোয়ারে জায়গা কোথা—ক'লক্ষ মানুষই বা ধরে! আসছে মানুষ—আসছে তো আসছেই। সমুদ্র হয়ে গেল মানুষের। সমুদ্রের মতোই বিরাট অসীম—কিন্তু সমুদ্রের গর্জন নেই। প্রচণ্ডতম অন্তর্গর্জন নিয়ে মানুষেরা মহামৌন। শোকদীর্ণ মায়েরা সন্তান-শোকে গ্রামে গ্রামে এবং এই শহরের অন্তরাল নিয়ে যত্রতত্র মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন—আজকের কলকাতাও যেন তাই। সবাই তোমরা কতকাল বাঁচবে, কত আনন্দে জীবন-ভোগ করবে—বিগতপ্রাণ সেই তারা আর কোন দিন ফিরে আসবে না তোমাদের মাঝে। অপরাধ: পেটের ক্ষিধেয় ভাত চেয়েছিল। এর চেয়ে বড় অপরাধ বুঝি আর হয় না!

রওনা হল মিছিল। সমুদ্র রাজপথে নেমে পড়েছে। বুকের উপর কালো ব্যাজ, আর বুকের ভিতরে নিঃশব্দ অভিশাপ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে। মৌন-ধিক্কার বর্বরতার বিরুদ্ধে। দরমার উপর আঁটা অগণ্য পোস্টার তুলে ধরেছে মাথার উপরে। দৃপ্ত অথচ শোকমন্দ্র পদধ্বনি ছাড়া কোনদিকে তিলেক মাত্র শব্দ নেই। প্রতিবাদ নীরব, কিন্তু ভাষা তার অতি-স্পষ্ট। আকাশ-ফাটানো চিৎকার করেও বুঝি এতখানি তীব্র তীক্ষ্ণ ভাবে মানুষের অন্তরের গভীরে পৌঁছানো যায় না। হাতে-হাতে কালো পতাকা, অর্ধনমিত রক্তপতাকা, ফেস্টুন, শহিদদের রক্ত-ঝরা ছবি। মোড়ে মোড়ে এপার-ওপার দড়ি টাঙিয়ে পোস্টারের মালা। কোনো কোনো মিছিলের আগে সাদা রঙের শহিদ-বেদি সাদা ফুলে সাজিয়ে মাথায় করে নিয়ে চলেছে। মিছিল অনন্ত, যত এগোয় জনতা শতেক গুণ বাড়ে। রাজপথ ছেয়ে গেছে, শহর ভেসে যাচ্ছে মানুষের স্রোতে।

রাজপথের উভয়দিকে জানলায় জানলায় অলিন্দে অলিন্দে এবং ফুটপাথে ভিড় করে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রবহমাণ মিছিলের দিকে নতমস্তকে নিঃশব্দে অভিবাদন জানায়। ঘণ্টা দুই পরে মিছিলের মাথা শ্যামবাজার দেশবন্ধু-পার্কে পৌঁছে গেছে। ধর্মতলা সুবোধমল্লিক-স্কোয়ারে গোড়া—কিন্তু দশটা হাতও ফাঁকা হয় নি কোনখানে। নতুন নতুন দল এসে পড়ে জনতা আরও ভরাট। নরমুণ্ডের কালোসমুদ্র। চড়া রোদ, মুখে ক্লান্তির স্পষ্টচিহ্ন—তা বলে ফিরবে মিছিল থেকে একটি মানুষ! বিশাল কলকাতা জুড়ে শোকের সেতুবন্ধন—তার এক প্রান্তে ধর্মতলার সুবোধমল্লিক-স্কোয়ার অন্য প্রান্তে শ্যামবাজারের দেশবন্ধু-পার্ক। এতটুকু ছেদ কোনখানে নেই যে মানুষ সহজভাবে ফুটপাথের এপার-ওপার করবে।

পথের এধারে ওধারে বিশ-তিরিশ পা অন্তর শহিদ-বেদি

বানিয়েছে। সাদা বেদির উপরে কালো পতাকা পতপত করে উড়ছে, চতুর্দিকে অগণিত পোস্টার। মুখে বলবে না আজ, বুকের ভিতরের কথাগুলো পোস্টারের লাল অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে। আর ছবি—রক্তাক্ত শহিদ পড়ে আছে শহিদ-জননী আকুল হয়ে কাঁদছেন, সেই সব ছবি খবরের-কাগজ থেকে কেটে কেটে ঝুলিয়ে দিয়েছে। গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, ঠিক ঠিক সেই জায়গাও আছে পথের পাশে তিন-চারটে। সেখানে বৃহৎ বেদি, উঁচু পতাকা, চতুর্দিকে ফুলে ফুলে সাজানো।

দিন ভোর মিছিল চলল। পুলিশ কোথা ডুব দিয়েছে, এত-বড় কাণ্ডের ভিতরে কারো টিকি দেখা যায় না। কথার আওয়াজ তো নেই, গুলির আওয়াজও নয় কোনদিকে একটি। দিনমান শান্তিতে গেল। সন্ধ্যা হতে-না-হতে মোমের বাতি জ্বেলে দিয়েছে বেদিতে বেদিতে—'ভাত চেয়েছিলাম, বুলেট দিল' ফেস্টুনের লেখা জ্বলজ্বল করে উঠল বাতির আলো প্রতিফলিত হয়ে। এ আলোর পরমায়ু ঘণ্টাখানেক বড় জোর। সাতটায় কার্ফু—জনতা অদৃশ্য হবে, পুলিশের দল বেরিয়ে পড়বে। পুলিশ একেশ্বর তখন—বাতি নেভাবে, শহিদ-বেদি ভেঙে তছনছ করবে হয়তো। আর এখানে-সেখানে বড় বড় কুশপুত্তলিকা ঝুলছে—খড়ের মূর্তি, বুকের উপর 'পরমবীর' প্ল্যাকার্ড-সাঁটা, গলায় ছেঁড়াজুতো ও রকমারি আনাজ-তরকারির মালা। যাঁদের নামে পুত্তলিকা ভয়ে তাঁরা কোন বিবরে লুকিয়ে পড়েছেন, অসহায় পুত্তলিকারা খররৌদ্রে সারাদিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে মিছিল দেখল—কার্ফু পেয়েই পুলিশ সর্বাগ্রে ঐগুলো সরিয়ে দেবে। সকালবেলা দেখবেন, একটাও নেই কোনদিকে।

তার আগে নিজ হাতেই ওরা শেষ করে যাচ্ছে। বাতি জ্বালছে শহিদ-বেদিতে, আর সেই দেশলাইয়ে পুত্তলিকাও জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সারা দিনের রোদ খেয়ে তৈরি আছে, দাউদাউ করে

জলে উঠল। রাস্তায় রাস্তায় আগুন। হতচেতন শহিদ-জননী আগুন দেখে ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। শহর জুড়ে কিসের এই অগ্নিকাণ্ড? অগণ্য মানুষের বুকের অন্তরালে যত আগুন জ্বলছিল, বুক ফেড়ে বেরিয়ে পড়ল নাকি? বেরিয়ে পড়ে চতুর্দিকে আগুন ধরিয়ে দিল?

॥ চব্বিশ ॥

অমলেশের কাগজ পড়া শুনছিল ফুল্লরা একমনে। বড় দুর্লভ জিনিস। পশ্চিমবঙ্গের এসব কাগজ পাকিস্তানে ঢোকে না—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কায়ক্লেশে বর্ডার অবধি এসেছে। ব্যস, আর নয়। দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা হয়তো ভাবেন, বঙ্গের নামে এ-পারের মন আনচান করে উঠবে। পূর্ববঙ্গের মানুষও নন আর এঁরা—পূর্বপাকিস্তান-বাসী। আইন মতে দেশভূঁইয়ের নাম পূর্ব-পাকিস্তান। মেঘনা, পদ্মা, আড়িয়াল-খাঁ, বুড়িগঙ্গার জলে বঙ্গের বড় হিস্যার বিসর্জন হয়েছে।

ছোট হিস্যারও সমগতি হতে যাচ্ছিল—পূর্ববাংলা গেছে, পশ্চিম-বাংলাই বা কেন আর? দাও ওটুকু বিহারের সঙ্গে মিশিয়ে—বিহার-বঙ্গ মার্জার হয়ে যাক। দেশ-ভাগ যাঁদের কীর্তি, এ আয়োজনও তাঁদের। ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দিচ্ছিলেন—বঙ্গ নাম থাকত না ভূগোলের পাতায়। উঁহু, ভুল বললাম—থাকত বঙ্গোপসাগর, জাত ধরে বাঙালির ডুবে মরবার জন্য। আগামী দিনের রমেশমজুমদার বদরুদ্দিনওমর প্রতুলগুপ্তরা গবেষণা করতেন, বাংলা বলে ছিল এক দেশ—বেপরোয়া দুর্ধর্ষ দেশপ্রেমী তথাকার মানুষ। পুরানো কালে বিস্তর ছিল, আর উত্তরকালেও ছিল বাঘা-যতীন, সূর্যসেন, সুভাষবসু—কত কত কত সব এমনি। নিষ্ঠুর ভবিতব্য খলখল করে হাসে: দুষমনকে শাস্তি দেবার বনেদি পদ্ধতি—নাক কাটো কান কাটো হাত কাটো পা কাটো, সর্বশেষে মুণ্ডপাত। বঙ্গদেশ নিয়ে হুবহু সেই খেলা সুদীর্ঘকাল থেকে। টুকরো কেটে কেটে ছুঁড়ে দেওয়া হল পূর্বে-পশ্চিমে, পুরোপুরি দুই খণ্ড শেষটা—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা এদিকে, ওদিকে পূর্ববঙ্গ-আসাম। কিন্তু সেদিনের বাঙালি

'যথা আজ্ঞা' বলে মেনে নেয় নি। বেদম মার মারে খণ্ডনকর্তাদের। ভাতে মারে—বিলাতি জিনিস বয়কট, স্বদেশি-ব্রত গ্রহণ। হাতেও মারে—পবিত্র রামধুন-গীতি নয়, বোমা-পিস্তল। আর সংস্কৃতির মানুষ লেখক-গায়করাও নেমে পড়েছেন—কলমে বেরুচ্ছে ভলকে ভলকে অগ্নিশিখা (ইনিয়ে বিনিয়ে রমণীদেহের জরিপ নয়), কণ্ঠে গাইছেন অগ্নি-ক্ষরা গান। আর বেয়াড়া রবিঠাকুরের দল কলম ছাড়াও রাখিবন্ধন নিয়ে পড়লেন—এ-মানুষ ও-মানুষের হাতে হলদে-রাখি পরিয়ে সঙ্কল্প নিচ্ছে: জবরদস্তি করে ওরা মাটি ভাগ করেছে, মানুষ আমরা আলাদা নই আলাদা নই আলাদা নই। রুখেছিল সেবারের দেশ-খণ্ডন—বৃটিশ-ইজ্জত পায়ে দলে সেটেলড ফ্যাক্ট আনসেটেলড করে দিল। বঙ্গ-ভঙ্গ বাতিল।

এবারে বেশি সতর্কতা, অনেক বেশি তোড়জোড়। ভূমিকা রচনা হয়েছে আগেভাগে পরিপাটি ভাবে। পিছনে দুনিয়ার বড় বড় মাথা। ছিল বাঙালি বা ভারতীয় জাতি, ভেঙে দিয়ে সেটাকে হিন্দু মুসলমান করা হল। সেই হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি চুপচাপ থাকলেও চলবে না—দাঙ্গাহাঙ্গামা আবশ্যক। সেই হিন্দু আর সেই মুসলমান নিয়ে হৈ-চৈ বেশি কাদের? বিনি-দরকারে যারা নিজেদের হিন্দু বলে জাহির করে না, হিন্দু-ধর্ম থোড়াই কেয়ার করে। মুসলমান সম্বন্ধেও ঠিক এই জিনিষ।

এক-ভারত নয় আর অতঃপর—দুটো সম্পূর্ণ পৃথক দেশ। সেই দুই দেশে—রেডিও শুনুন, প্রতিদিনের সংবাদপত্র পড়ুন—ধুন্দুমার যেন লেগেই আছে। বিভেদের মিথ্যা-চিত্রের রং উঠে গিয়ে সত্য পাছে প্রকট হয়: একই তো আমরা আসলে—চিরকাল এক ছিলাম, এখনো তাই। লাঠালাঠি কেন তবে, পেটে না খেয়ে অস্ত্র কিনে কিনে কী জন্য তবে বর্ডারে জড়ো করি? ভিক্ষাপাত্র হাতে দুনিয়ার তাবৎ জাতের কাছে 'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' করে বেড়ানো সেই মুহূর্তেই তো শেষ হয়ে যাবে। হতে দেবে তাই!

পৃথক হল পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। ধীরে রজনী, ধীরে। পরবর্তী অধ্যায়ে পূর্ববঙ্গ নেই, বাংলা-টাংলা নয় আর—পূর্ব-পাকিস্তান। ভারতের দিকটায় একটু তবু ক্যাঁকড়া থেকে যায়—পশ্চিমবঙ্গ। তাই বা কদ্দিন আর, বঙ্গ নাম নিঃশেষে মুছে দাও—ভারতীয় কর্তারাই উঠে-পড়ে লাগলেন। এবং রবিঠাকুর ইতিমধ্যে দেহরক্ষা করেছেন—পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক অধিকাংশই পরম বশম্বদ—খেতাব দিয়ে, প্রাইজ দিয়ে এবং প্রাইজের লোভ দেখিয়ে, দরবারে ঠাঁই দিয়ে, এবং আরও দশরকমে হাত করা হয়ে গেছে তাঁদের। কর্তাদের অভিপ্রায় বুঝে তাঁরা বিবৃতি ছাড়লেন: ঢোকাও এই টুকরো বিহারের ভিতর—বঙ্গের গঙ্গাপ্রাপ্তি হোক।

তবু হল না—মুখ্যুসুখ্যু যে জনতাকে আপনারা আমল দেন না, রুখে উঠে তারাই ঠেকিয়ে দিল। বঙ্গ নাম অঙ্গে রেখে টিকে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু বঙ্গভাষা নামে আরও এক বস্তু আছে, শনির দৃষ্টি এবারে তার দিকে। ভাষার মুণ্ডপাত করতে হবে, পূর্ব-বাংলার সঙ্গে এখনো যা যোগাযোগের সেতু।

ধান ভানতে শিবের-গীত বিস্তর হয়ে যাচ্ছে। থাক এখন। কাগজে ওপারের খবর পড়া হচ্ছে, তন্ময় হয়ে শুনছে ফুল্লরা। জ্ঞান হওয়া ইস্তক যে দেশ চোখে দেখে নি, গল্পই শুনেছে দেদার। আপন-দেশ ছিল এই সেদিন অবধি। প্রথম আজ যে হিন্দুস্থানের পথে বেরিয়েছে—জীবনে সর্বপ্রথম। গভীর রাত্রে চাঁদ ডুবে গিয়ে জীবজগৎ যখন ঘুমে অচেতন, চোরের মতন চুপিসারে সেই নতুন দেশে পাড়ি জমাবে।

ঘরের বাইরে একটি মেয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হাসিমুখ, কৌতুকভরা দৃষ্টি। ফুল্লরার কিছু বড়ই হবে বয়সে।

অমলেশের নজরে পড়েছে। বলে, আপনিও পারে যাচ্ছেন? পরশুদিন এত কথা—যাওয়ার কথা তখন তো বললেন না?

মেয়েটি ভ্রূভঙ্গি করে উড়িয়ে দেয়: কী এমন যাওয়া রে! দিল্লি-দিল্লি মক্কা-কাশী নয়, মাঠের এপার আর ওপার—ঘটা করে তাই আবার বলতে হবে!

ঘরে ঢুকে ফুল্লরার পাশটিতে বসে পড়ল। যেন চেনাজানা কত কালের সুহৃৎ—গা ঘেঁষে বসে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ফুল্লরাকে। হেসে হেসে বলে, শখের যাওয়া নয়, দায় আছে এবার। মামারা যাচ্ছেন—তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে দেখিয়ে শুনিয়ে ফেরত এনে দিতে হবে। দেরি করে ফেলেছি, বকুনি খাবার ভয় হচ্ছিল—তা দেরি তো আরও বেশি তাঁদের।

সোয়াস্তি পেয়ে অমলেশ বলে, যাক, ভাল হয়েছে। সার যাচ্ছেন—দু-জনে যাবেন এঁরা। ভরসা পাচ্ছেন না—ওপার অবধি আমাকেই যেতে হয় কিনা ভাবছিলাম। কিন্তু কত জরুরি কাজকর্ম, জানেন আপনি সব। মামাদের নিয়ে যাচ্ছেন, এঁরাও সেই সঙ্গে যাবেন।

বেশ তো!

মেয়ে এককথায় রাজি।

অমলেশ বলে, নাম বললে চমকে উঠবেন। অধ্যাপক বীরেশ্বর ঘোষ, পূর্ববাংলার মানুষ 'সার' বলে যাঁকে জানে।

টপ করে মেয়েটা প্রণাম করল অমনি।

ফুল্লরাকে দেখিয়ে অমলেশ বলছে, ইনি হলেন—

থাক, থাক। মেয়ের কাছে মেয়েকে চিনিয়ে দিতে হয় না। নিজেরাই চিনে নেবো।

ফুল্লরার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় ধমক দেয়: পুরুষের মধ্যে কেন? আলাদা ঘর আছে না আমাদের? চলে এসো।

বলেই—অনুরোধ রাখে কি না রাখে, সে অপেক্ষা নেই—ফুল্লরার হাত ধরে হেঁচকা-টান। হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

বলে, ড্যাবড্যাব করে তাকাও কেন? চিনতে পারছ না—আমি ফুলি গো। আমিও তোমায় দেখি নি। এ ঘাটে বুঝি পারাপার হও না—কোন্ ঘাট তোমাদের?

ফুল্লরা সহজ হয়েছে এতক্ষণে। বলে, কোনো ঘাটই নয়।

পাশপোর্ট-ভিসা করে নিয়মদস্তুর যাও বুঝি? যা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট—তা-ও তো বন্ধ আছে আজকাল। বলি, দেশের মাঝখান দিয়ে বেমক্কা বর্ডার-লাইন—এটাই বা কেমন নিয়ম শুনি? অনিয়ম তবে আর কাকে বলব?

কণ্ঠস্বর কঠিন হল হঠাৎ। বলে, আমি পাশপোর্ট করিনে। হাতে গুঁজে দিলেও নেবো না। গান্ধিজীরও কথা ছিল তাই—বেঁচে থাকলে পাশপোর্ট করে এপার-ওপার চলাচল করতেন না তিনি।

ফুল্লরা বলল, যাইনে তো এইসবের জন্যে। এই আমার প্রথম যাওয়া ওপারে।

মান করে নাকি?

হেসেছে আবার ফুলি, হেসে ফুল্লরার থুতনি নেড়ে দিল। বলে, অনেকেই তাই বলে—যাব না আর ওদেশে। রাগে বলে, শোকে-দুঃখে বলে। চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতন। চিরকাল ধরে যাওয়া-আসা—ঠিক সেই জিনিসই চলবে বরাবর। কলমের টান দিল, আর সকল সম্পর্ক মুছে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা। হয় তাই কখনো?

লম্বা দোচালা ঘরের একটা অংশ কাচনির বেড়ায় ঘেরা—মেয়েদের জায়গা। হেরিকেন জ্বলছে ভিতরে। একটু বিশেষ ব্যবস্থা এখানে। মেজেয় মাদুর পাতা যথারীতি—তা ছাড়া দুটো তক্তাপোশ, উপরে সতরঞ্চি।

ফুলি বলে, ছেলেপুলে নিয়েও সব আসে। বাচ্চা ঘুম পাড়িয়ে

তক্তাপোশে শুইয়ে দেয়। এক-একদিন এমন হত, আড়াআড়ি শুইয়েও দুই তক্তাপোশে কুলাত না। আজ দেখ একেবারে ফাঁকা। আমার মামা-মামানি ওপারে যাবে বলে খবর দিয়েছিল। মনের আকুলি-বিকুলি, কিন্তু ভরসা করতে পারে না। তাদের জন্তে এসেছি—অথচ সেই তাদেরই পাত্তা নেই। ঘাবড়ে গেছে খুব সম্ভব, আসবে না।

দু-জনে তক্তাপোশে বসল। ফুলি বলে, নতুন একদল বেলুচ-ফৌজ এসে ঘাঁটি করেছে, তারপর থেকে এই রকম। পুলিশ-কাস্টমস দেশ-ভাগ থেকেই আছে, তাদের সঙ্গে পাকা বন্দোবস্ত। মিলিটারিগুলো নতুন আমদানি, তাদের নিয়ে ভয় ভাঙে নি এখনো। বেটারা ঘুমোয় না, ঘুমোতেই জানে না বোধহয়—দিন-রাত্তির মাঠে মাঠে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। দিনকতক এমনি হয়েছিল, কোনো ঘাটে মানুষ নেই—ফাঁকা ধূ-ধূ সব। আস্তে আস্তে আবার এখন জমে উঠছে। না জমে যাবে কোথা—গরজ বড় বালাই। কাজের গরজে বেরুতে হয়। তবে মেয়েলোকে বেরুতে ভরসা পায় না, এক-পা এগোয় তো দু-পা পিছিয়ে পড়ে। মেয়েদের বড় কষ্ট।

ফুল্লরা প্রশ্ন করে: মিলিটারি কেন বন্দোবস্তে আসে না?

আসে নি এখনো, তবে আসবে ঠিক। অমলেশ-দা লেগে পড়ে আছেন, না এসে যাবে কোথা? এদ্দিন কবে হয়ে যেতো—

মুখ বিমর্ষ করে ফুলি বলতে লাগল, মুশকিল হয়েছে, দেশি-ফৌজ নয়। কোন্ মরুভূমির অঞ্চল থেকে এসেছে—কথা বলে, ঠিক যেন ঠেঙার বাড়ি মারছে। বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে। কী বলছে, একবর্ণ কেউ বোঝে না। হাসতেও জানে না বোধহয় বেটারা, তল্লাটের কোনো লোক কখনো হাসতে দেখে নি। খোদার কসম খেয়ে সব বলে।

একটু থেমে আশ্বাসের সুরে বলে, তা হলেও মানুষ তো বটে

—তাতে নিশ্চয় ভুল নেই। বন্দোবস্তে না এসে যাবে কোথা? সন্ত সন্ত এসেছে পূবের মুলুকে—জল-কাদা ভেঙে শুক্তো-ঘণ্ট খেয়ে নরম হয়ে আসুক। অমলেশ-দা তো বললেন, হয়ে এসেছে—দেরি বেশি নেই। উনি যখন বলছেন—বন্দোবস্তের চোদ্দআনা সারা, ধরে নিতে পারো।

অমলেশ, অমলেশ—বর্ডারে বেরিয়ে যত্রতত্র এই নাম। বাসের যাত্রীরা দেখতে পেয়ে কী কলরব তুলেছিল—সাত-রাজার ধন মাণিক যেন টুপ করে সামনে এসে পড়েছে।

কৌতূহলী ফুল্লরা শুধায়ঃ কে উনি?

ফুলি জবাব দেয়ঃ অমলেশ-দা গো—তিনি ঐ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলেন। আমায় না পেলে রাত দুপুরে হয়তো-বা মাঠ ভেঙে ওপার অবধি দৌড়তেন।

ফুল্লরা বলে, নাম জানি। ঘরের খেয়ে বনের-মোষ তাড়াতে ওস্তাদ, তা-ও শুনিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মানুষটি কে, কাজকর্ম কী করেন?

আপাতত বড় কাজ, ওপারে এক নৌকো চাল পাঠানো। বিড়িপাতা বোঝাই হয়ে রাতের মধ্যেই সেই নৌকো ফিরবে। বিলি-ব্যবস্থায় ক'দিন আজ আহার-নিদ্রা বন্ধ।

ফুল্লরার উজ্জ্বল উদ্ভাসিত মুখ চকিতে কালো হয়ে উঠল: স্মাগলিং?

তাকিয়ে দেখে নিরীহ কণ্ঠে ফুলি বলে, খুব বুঝি নিন্দের কাজ?

নয়? সিঁধেল-চোরের রকমফের, দেখুন ভেবে। সিঁধ কেটে দেশের মাল পাচার করে দেওয়া।

ফুলি বলে, সিঁধেল-চোর নয়, সাধুচোর। সাধারণ-লোকে কী বলে এঁদের, জানো?

জানি কিছু কিছু। বিপদভঞ্জন, কল্পতরু। দরকারের জিনিস চাইলেই অমনি মিলিয়ে দেন।

কিড়িং-কিড়িং করে সাইকেল থামিয়ে অমলেশের সেই আসার কথাটি ফুল্লরার মনে পড়ছে। বলল, মাঠের মাঝখানে বাস অচল, পুরো দিনরাত্রি বুঝি সেখানেই পড়ে থাকতে হয়। হঠাৎ যেন দেবতার আবির্ভাব। বাসের মানুষ হৈ-হৈ করে উঠল। গুণের ব্যাখ্যান মুখে আর ধরে না: আর কি, উপায় হবেই এবারে। হল তাই—ড্রাইভার হয়ে শহরে পৌঁছে দিলেন। আমাদের বেলা আরও বেশি—হাঁটতে হাঁটতে এই অবধি।

ফুলি বলে, জনতার-বীর—বলে থাকে এঁদের। আদ্যিকাল থেকেই আছেন। দুনিয়ার যেখানে যত বর্ডার, সর্বত্র এঁরা। আছেন বলেই বাঁচোয়া। রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের জুলুম-জবরদস্তি থেকে এঁদের কল্যাণেই জনতা বাঁচে। উপকার পায় বলেই এত সুখ্যাতি।

একটু চুপ থেকে আবার বলে, খারাপ-খারাপ আইন করেছে, আর বেধড়ক ডিউটি বসিয়েছে বলেই তো স্মাগলিং। ক্ষিধে মেটানোর চাল ছাড়ো ও-পারের বাজারে, এ-পারের চাষীর বিড়ির অভাব ঘুচাও—অমলেশ-দার নৌকোও অমনি নোঙর ফেলে অচল হয়ে থাকবে।

ফিক করে হেসে বলে উঠল, গান্ধির মতেই চলেন এঁরা।

ফুল্লরা বলল, কী বলেন—কার সঙ্গে কাদের তুলনা।

একটা জিনিসে অন্তত—দেশখণ্ডন এঁরা মানেন না। এপারে ওপারে অদৃশ্য সেতুবন্ধন, এঁরা হলেন সেই সেতুর এক-একটা থাম। পেশা অবিশ্যি অন্য স্মাগলারের ক্ষেত্রে, কিন্তু অমলেশ-দার তা নয়। সংসারে একলা মানুষ—দাঙ্গায় সব খতম হয়ে গেছে। নিজের পেট ছাড়া খরচা নেই। পেশা নয় অমলেশ-দা'র, প্রিন্সিপল।

ফুল্লরা অবাক হয়ে বলে, সরকারি কর্তারা হতে দিচ্ছে তো বেশ!

খবর পৌঁছলে তো! জনসাধারণে খেয়ে-পরে বেঁচে যাচ্ছে, কিছুতেই তারা হুলুকসন্ধান দেবে না। দিলেও চেপে দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। এঁদেরও পরিপাটি হাতের অতি-নিখুঁত কাজকর্ম।

হাসতে লাগল ফুলি। হেসে বলে, দেখ, বড়-পণ্ডিত বড়-লেখক বড়-শিল্পীর নাম দুনিয়াময় ছড়িয়ে যায়। স্মাগলারের বেলা উল্টো। যে যত দক্ষ, অজানা-অচেনা তত বেশি সে। পুলিশ-কর্তাদের এয়ারবন্ধু হয়ে স্মাগলারদের গালিগালাজ করে সারা জীবন কাটিয়ে দিল—মরণের পর হয়তো-বা বেরিয়ে পড়ল, ওস্তাদের ওস্তাদ সেই মানুষ-ই।

॥ পঁচিশ ॥

বলো হরি, হরিবোল—

মড়া চলেছেন শ্মশানবন্ধুদের কাঁধে চেপে। গঙ্গায় যাবেন। এই হরিধ্বনি আগেও তো শুনেছিলাম। মড়ার দল দ্রুতপায়ে মাঠে নেমে অপথ-কুপথ ভেঙে ছুটতে লাগল। পার হয়ে তাড়াতাড়ি গঙ্গায় পৌঁছানো বোধহয় উদ্দেশ্য। মড়ার পচন ধরে যাচ্ছে সম্ভবত। অমলেশের কিন্তু সন্দেহ—শ্মশানবন্ধুদের মধ্যে চেনালোক বেরুবে, মুখোমুখি পড়তে চায় না বলেই ওরা ভিন্ন পথে গিয়েছে।

ডাঙা-ডহর মাঠ-জঙ্গল ভেঙে মল্লিকঘাটের পাশ কাটিয়ে এবারে তারা প্রশস্ত রাজপথে উঠল। আইনসঙ্গত পথ—পাশ-পোর্ট-ভিসার জোরে বুক ফুলিয়ে যে পথে মানুষ চলাচল করে। চেকপোস্টের সামনে গিয়ে মড়া নামাল। দু-তিন জনে অফিস-ঘরে ঢুকে গেল, অন্যেরা গাছতলায় কাঁধের গামছা নেড়ে বাতাস খাচ্ছে।

বুড়োমানুষ মড়া—বাঁশের চালির উপর ফুলের গাদার মধ্যে শুয়ে রীতিমত জাঁকজমকে যাচ্ছেন। মুখের খানিকটা বেরিয়ে পড়েছে, গায়ে-গতরে দিব্যিটি ছিলেন। ভাগ্যধর মানুষ—ছেলেমেয়ে নাতিপুতি জোতজমি বাগবাগিচা দালান-পুকুর উত্তরপুরুষ যত-কিছু প্রত্যাশা করে, সবই তিনি রেখে যাচ্ছেন। ছেলেরাও তেমনি—পারলৌকিক কর্মের কোন অঙ্গে খুঁত থাকতে দেবে না।

অফিসের ভিতর ঢুকে বড়ছেলে অফিসারকে বলল, হেঁজিপেঁজি নন—নাম-করা লোক আমার বাবা, দীনদয়াল চাটুজ্যে। নাম শুনে থাকতে পারেন। মরেছেনও খুব ভাল—সজ্ঞানে গঙ্গানারায়ণ-ব্রহ্ম বলতে বলতে। আমাদের যা করণীয় সমস্ত করেছি। শেষ

এখন হুজুরের হাতে। আপনি দয়া না করলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গতি হবে না।

অফিসার বয়সে প্রবীণ, মানুষটি বড় ভাল। বিস্তর কাল চাকরি করছেন—তখন হিন্দুস্থান-পাকিস্তান ছিল না, একই দেশ বলে বরাবর জানতেন। আলটপকা দুটো দেশ হয়ে গেলেও মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ সেটা মেনে নিতে পারেন না। বিপন্নকণ্ঠে তিনি বললেন, আমি মুসলমান—আপনারা হিন্দু। যে-সে হিন্দু নন, বর্ণের সেরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের গতি আমায় দিয়ে হবে—কী বলতে চান, ঠিক বুঝতে পারছিনে।

ছেলে কাতর হয়ে করজোড়ে বলে, দুনিয়ার মধ্যে কেউ যদি পারেন সে আপনি। বর্ডারের কর্তা হয়ে তল্লাটের লোকের দায়ঝক্কি সামলাচ্ছেন, আপনি পারবেন না তো কি পিণ্ডির সিংহাসন থেকে আয়ুব-খাঁ পারতে যাবেন ? আমরা শুধু আপনাকে চিনি হুজুর, কাজকর্ম তাতেই দিব্যি চলে যাচ্ছে। বেশি চিনতে গেলেই বখেড়া এসে জোটে।

ইত্যাদি আমড়াগাছি অন্তে আসল প্রস্তাবে আসে এইবার। বৃদ্ধ দীনদয়াল মৃত্যুশয্যায় কাকুতি-মিনতি করে গেছেন দেহ গঙ্গায় যায় যেন। শেষ ইচ্ছা। শখের ইচ্ছা নয় হুজুর—আমাদের শাস্ত্র বলেছে, জো-সো করে গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়ে দিতে পারলে পরলোকের পথে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট থাকে না। যমদূতে ছুঁতে পারবে না—চড়াৎ করে বৈকুণ্ঠে উঠে বসবেন। কিন্তু পাকিস্তানে গঙ্গা কোথা? একবার ওপারে গিয়ে মড়াটা গঙ্গায় দিয়েই হাত ধুয়ে ফেরত চলে আসব, একদিনের বেশি লাগবে না। বলেন তো উপযুক্ত জামিনের বন্দোবস্ত করে যেতেও পারি।

অফিসার হাত ঘুরিয়ে অসহায়ভাবে বললেন, উপায় নেই। সাংঘাতিক কড়াকড়ি। আইন মোতাবেক পাশপোর্ট দেখিয়েই লোকে আজকাল পার পাচ্ছে না—

সে তো জ্যান্ত লোকের বেলা, মড়ার আবার পাশপোর্ট কি হুজুর? মড়ার নামে দরখাস্ত দিলে তো ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

এ কথার সত্যিই জবাব হয় না। অফিসার হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, মড়া পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন না, কিন্তু আপনারা তো যাচ্ছেন। আপনাদের পাশপোর্ট কই?

কেমন করে হবে? বাবা তো আগেভাগে জানান দিয়ে রাখেন নি যে, মরছি অমুক তারিখে—মড়া গঙ্গায় দিতে যাবে, পাশপোর্ট-ভিসা বানিয়ে রেখে দাও। আগেভাগে নোটিশ পেলে ওঁর জন্যেও তো পাশপোর্ট করা যেত। তখন জ্যান্ত ছিলেন, খুব একটা অসুবিধে হত না।

এর বিপক্ষেও বলবার কিছু নেই। অফিসার সাহেব ভ্রূ-কুঞ্চিত করে ভাবতে লাগলেন।

সেই বড়ছেলে আবার বলে, বাইরের লোকে যা-ই বলুক, খাসা আছি আমরা হুজুর। ওপারের হিন্দুস্থানের চেয়ে অনেক ভাল। ওখানে হাঙ্গামা নিত্যিদিন, এটা নেই সেটা নেই—লেগেই আছে। চাল শুনতে পাচ্ছি আড়াই টাকা কিলো—আমাদের নিদেনপক্ষে পাঁচ সের মিলবে ঐ টাকায়। থুতু ফেলতেও ওদিকে যেতাম না—কী করব, পিতৃবাক্য। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, শাস্ত্রে লিখেছে।

সহযাত্রী একজন জুড়ে দিল: ভয়ও আছে হুজুর। গঙ্গা না পেলে মুক্তি হবে না, আমাদের শাসিয়ে গেছেন। ইহলোকের মানুষ কেয়ার করিনে, কিন্তু ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার—পরলোকের ওঁনাদের বড্ড ডরাই। ধরুন, রাত-বিরেতে ঘরের বেড়ায় দমাদম ঢিল ছুঁড়তে লাগলেন। কিম্বা হাট করে ফিরছি—খেজুরগাছের মতন লম্বা হয়ে পথ আটকে নাকি-সুরে বলছেন, গঙ্গায় দিঁলি কঁই —ঘাঁড় মঁটকাবো। সঙ্গে সঙ্গেই তো জ্ঞান হারিয়ে পথের উপর পড়ব, অক্কা পেয়ে যাব। বোঝানোর সময় হবে না যে, পাশ-

পোর্টের অভাবে হুজুরের কাছে ছাড় মেলে নি, বর্ডার অবধি গিয়ে ফেরত আসতে হয়েছিল।

মড়া রেখেছে অফিসের সামনে—দাঁত মেলে নিমীলিত চোখে রয়েছে, ঘাড় তুলতেই অফিসারের নজরে পড়ল। আর সেই মড়ার কানের কাছে লোকটা তারস্বরে বলে যাচ্ছে, গঙ্গাপ্রাপ্তিতে ভণ্ডুল দিচ্ছেন ইনি—এই শামসুদ্দিন সাহেব। ভয়ে হোক অথবা করুণার বশে হোক অফিসার রাজি হয়ে বললেন, এমন করে বলছেন আপনারা, পরলোকের দোহাই পাড়ছেন—চুপিসারে চলে যান তবে মাঠ পার হয়ে। শব্দসাড়া করবেন না, রাস্তাপথেও আর এক-পা নয়। মিলিটারি মোতায়েন আছে, তারা নিজেরাই এক-একটা আস্ত জিন, বাঙালি-ভূত কাছ ঘেঁষতে পারবে না তাদের। টের পেলে আটক করে আমারই কাছে ফের নিয়ে আসবে। গ্রেপ্তার করা ছাড়া উপায় থাকবে না তখন আমার।

এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব কী হতে পারে। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে শ্মশানবন্ধুরা মড়া তুলল। কাঁধে তোলবার সময় বলতে হয় 'বলো হরি, হরিবোল'। ফিসফিস করে বলল সেটা। বাইরের কারো কানে গেল না—শুনল কেবল শ্মশানবন্ধুরা। এবং মড়ার যদি কানে আওয়াজ ধারণের ক্ষমতা থাকে, তবে তিনিও।

মাঠ ভেঙে ছুটেছে। পার হয়ে উঠল পত্রঘন আমবাগানের ভিতরে। মানুষজন আড়াল করে দিব্যি যাওয়া যাবে, সীমানা সম্পূর্ণ পার হয়ে গিয়ে তখন আত্মপ্রকাশ করবে, হরিধ্বনিতে আকাশ ফাটাবে।

হবার জো আছে তাই। ক্ষিতিনাথের আচমকা যেন পাতাল ফুঁড়ে আবির্ভাব। পরিত্রাণ নেই—ভূত যেমন, কাস্টমসের মানুষও অবিকল তেমনি। বুঝি অন্তর্যামী তারা, বাতাস হয়ে নিঃশব্দে সর্বত্র বিচরণ।

ক্ষিতিনাথ বললেন, মড়া নিয়ে পার হয়ে এসেছেন—দিল ছেড়ে? খুব ভাগ্যবান মড়া বটে—আপাদমস্তক গঙ্গা পেয়ে যাচ্ছেন। খাটে না শুইয়ে চালির উপরে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে নিয়ে এলেন যে?

মাঠঘাট ভেঙে আসতে হল, বিশ্রী বেয়াড়া উঁচুনিচু রাস্তা। শুইয়ে আনতে গেলে হয়তো-বা গড়িয়ে ভুঁয়ে পড়ে গেলেন—

তা বটে, তা বটে—ভালই করেছেন। এক দেশ থেকে ভিন্ন দেশে চালান হয়ে এলেন, সামলে করতে হবে বই কি। এবারে তো এসে গেছেন, বাঁধন-কষনের আর কি দরকার? মরা-মানুষের প্রাণ নেই বুঝলাম, দেখতে তবু উৎকট লাগছে।

শ্মশানবন্ধুরা আপত্তি তুলে বলে, ক'দিনের বাসি-মড়া, আলগা করে দিলে দুর্গন্ধ উঠবে। খোলাখুলি একবারেই শ্মশানঘাটে নামিয়ে হবে।

চালির প্রান্ত এঁটে ধরে ক্ষিতিনাথ আদেশের সুরে বললেন, নামিয়ে ফেলুন, এগোবেন না।

আর টুপ টুপ করে এ-গাছ থেকে ও-গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ছে সিপাহিরা। বিস্তর মানুষ পলকের মধ্যে ঘিরে ফেলল।

ক্ষিতিনাথ বললেন, দড়ি-দড়া খুলে ফেলুন। মড়াকে বড্ড কষ্ট দিয়েছেন, আর নয়।

নিজেই ক্ষিতিনাথ আরম্ভ করে দিয়েছেন। শ্মশানবন্ধুরাও অগত্যা দড়ি খুলতে লাগল। খুলছে অতিশয় ধীরে, ক্ষিতিনাথের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কোনো রকম যদি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, চোখ-টেপাটেপির পরে মকুব হয়ে যায় যদি বাঁধনের দড়ি খোলা।

ঝানু ক্ষিতিনাথ মড়ার পাশটিতে উবু হয়ে বসলেন। একটা লোক চিরকালের মতো চলে গেছে—ক্ষিতিনাথ কী নিষ্ঠুর গো! হাসছেন টিপে টিপে।

বলেন, কিসে মারা গেলেন? জল-উদরি বুঝি?

আজ্ঞে?

পেট নিদারুণ রকম মোটা। এমনি-এমনি হয় না, জল-উদরি রোগ—পেটের ভিতর জল জমে ঢাকের মতন হয়ে দাঁড়ায়। পিটলে বাজে। পায়েও রস জমেছে, মোটাসোটা তাই এমন। জলের পিপে বয়ে এনেছেন কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে, এতগুলো মরদ হাঁসফাঁস করছেন। জিরিয়ে নিন হাত-পা ছড়িয়ে।

ক্ষিতিনাথ রোগলক্ষণ বলে যাচ্ছেন, আর দেখি হাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন মড়ার গায়ে-জড়ানো কম্বলের তলায়। ধরেছেন বস্তা একটা, টানাটানি করে বাইরে এনে ফেললেন। চালে ভরতি, মুখ সেলাই-করা। হো-হো-করে হেসে উঠলেন: বঙ্গভূমির মতো স্বর্গধামেও চাল বাড়ন্ত, বুঝি ভেবেছেন—মড়ার সঙ্গে চালও দিয়ে দিচ্ছেন?

নির্দেশ মতো সিপাহিরা দড়ির বাঁধন কেটে ফুলের বোঝা সরিয়ে সম্পূর্ণ আলগা করে ফেলল। চালের থলি, ছোট মাঝারি বড় যেখানটা যেমন মানায়, মড়ার সর্বঅঙ্গে পরিপাটি করে সাজানো। রীতিমতো শিল্পকর্ম। সাজিয়ে পরম যত্নে কম্বলে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধেছে, থলি যাতে স্থানচ্যুত না হয়। এই কারণে মানুষটা স্থূলকায় ও জল-উদরি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, বস্তা-থলি সরিয়ে ফেলতে রোগমুক্ত হয়ে মড়া আবার রোগা-মানুষ হল।

শ্মশানবন্ধুরা বিন্দুমাত্র লজ্জা পায় না। মাতব্বরটি এগিয়ে এসে হাত বাড়াল: পদধূলি দিন। হেরেছি। আমরা বেড়াই ডালে ডালে, আপনি ঘোরেন পাতায় পাতায়। রিটায়ার করার পর দল পাল্টে আমাদের দিকে আসবেন স্যার। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান হয়ে দাঁড়াবেন—দেখতে হবে না মোটে। ওদিককার ঘাঁতঘোত সমস্তই জানা, তার উপরে এই রকম তাজ্জব মাথা একখানি! আপনাকে এঁটে ওঠা কাস্টমসের বাপের ক্ষমতায় কুলোবে না।

তোয়াজে মন ভিজিয়ে তারপর সরাসরি প্রশ্ন: হাতে-নাতে

ধরা পড়েছি, বলার কিছু নেই। তবে মাল যৎসামান্ত, পুরো তিনটে মনও নয়—দু-মন তিরিশ সের। মিথ্যে বলছিনে, মেপে দেখতে পারেন। এতগুলো মানুষ আমরা এত হাঙ্গামা করে বয়ে এনেছি। তা ছাড়া মড়া যিনি কাঁধে চেপে এলেন, গঙ্গায় দেবো বলে সত্যি সত্যি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। মরে গিয়ে বোবা হয়েছেন বলে দাবি নাকচ করা যাবে না। এই সমস্ত বিবেচনা করে কি আদেশ হয়, বলুন এইবারে।

ক্ষিতিনাথ উদারভাবে বললেন, দেখ, চুনোপুঁটি আমি ধরিনে—পাতেও নিইনে। রুই-কাতলার জন্যে জাল পাতা আছে, আপনা-আপনি তোমরা এসে খপ্পরে পড়লে। এসে ভালই হল—পরোপকার করে একটু পরকালের কাজ করব। সিকি-পয়সা লোকসান করব না তোমাদের—মালটা কেবল তোমাদের মনোমত বাজারে না বেচে আমার মানুষকে বিক্রি করা। যেমন যেমন ছিল, সাজিয়ে নিয়ে কাঁধে তোল। মড়া গঙ্গাও পাবে ঠিক—একটু ঘুর-পথে দেরি হবে হয়তো এক-আধ বেলার।

হাত ঘুরিয়ে সিপাহিদের ইঙ্গিত করলেন, মুখে কিছু বলতে হয় না। যে যার জায়গায় নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য।

ক্ষিতিনাথ আদেশ করলেন, কাঁধে তোল মড়া। আমি আগে আগে যাচ্ছি।

বলো হরি, হরিবোল—

শঙ্কা নেই আর, খোদ কর্তাই সঙ্গে। অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল—কাঁধে মড়া, তা যেন ধ্যান করতে করতে যাচ্ছিল। তারই শোধ তুলছে এবার : বলো হরি, হরিবোল।

॥ ছাব্বিশ ॥

বাংলার ছেলে মরতে পিছপাও কখনো নয়। সেকালে মরেছে। এখন তো পটাপট মরছে—মেরে ফেলছে হেঁসো-দায়ের কোপে কচুগাছ-কলাগাছ মারার মতন। ভবিষ্যতেও মরবে—অল্পেসল্পে হবে না, মরতে দিতে হবে অনেক—অনেক জনাকে।

সেকাল ধরে বলছি। কয়েকটি মৃত্যুর উপাখ্যান।

ভোরবেলা কানাইলাল দত্তকে নিতে এসেছে। বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন তিনি। ডেকে তুলতে কিছু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, সময় হয়ে গেছে বুঝি? গেঞ্জিটা গায়ে ঢুকিয়ে চোখে চশমা পরে তৈরি: চলুন।

'বন্দেমাতরম্' বলে নিজ-হাতে ফাঁসির দড়ি গলায় নিলেন।

গোপীনাথ সাহা প্রাতঃস্নান সেরে পট্টবস্ত্র পরে গীতাপাঠ করতে করতে ফাঁসিমঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। সর্বশেষ কণ্ঠধ্বনি: Every drop of my blood will sow the seeds of freedom in every Indian Home—আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু দেশের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করবে।

ক্ষুদিরামেরও এমনি। ফাঁসির হুকুম শোনার পর থেকে ধাঁ-ধাঁ করে ওজন বেড়ে গেল। এত বড় স্ফূর্তিতে ওজন না বেড়ে পারে।

বিনয়-বাদল-দীনেশ রাইটার্স-বিল্ডিংস আক্রমণে যাচ্ছেন। সেই লাল-বাড়ি—গবুচন্দ্রগণের বিরামভূমি যেখানে পরবর্তীকালে। বাদল-দীনেশ আছেন পার্ক-সার্কাস সেন্টারে। রওনা হবার আগে মেন্থু নিজেরা তৈরি করে দিলেন। মাংস-ভাত, দই-মিষ্টি। চুক্তি: যতক্ষণ না 'আর দিও না' 'আর দিও না' করছি, দিয়ে

যেতে হবে। হাসি-তামাসা ফুর্তি-ফার্তিতে ভরপেট খাওয়া, খাওয়ার পরে মগ্ন হয়ে বলাকা পড়ছেন: 'বন্দরে বন্ধনকাল হল শেষ।' সময় হল, বলাকা বন্ধ করে তখনই খাড়া—পকেটে রিভলভার ও সাইনাইড-বিষ।

আর দলপতি বিনয় বসু মেটিয়াবুরুজ-সেণ্টারে। আহার ও বিশ্রাম অন্তে যাত্রামুখে সেণ্টারের বউদিকে প্রণাম করলেন। বউদি'র চোখে জল। বিনয় ভর্ৎসনা করলেন: ছিঃ বউদি, হাসতে হয় সৈনিক যখন বিদায় নেয়।

প্রদ্যোত ভট্টাচার্য আঠারো বছুরে ছেলে, কলেজে পড়ে। সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসকে মেরে ফাঁসি-সেলে আছে। মা পঙ্কজিনী দেখা করতে এলেন। হাসি-ভরা মুখ ছেলের।

এ কি, একটুও ভয় করছে না প্রদ্যোত?

কিসের ভয়? মৃত্যু তো দেহত্যাগ। শেষ হয়ে যায় না, শুধু-মাত্র খোলস-বদল। মরণের মধ্যে আমি অমরতার গান শুনতে পাচ্ছি মা।

বলতে বলতে মুখ ঈষৎ মলিন হয়ে গেল: শুধু এক কষ্ট মাগো, তোমায় ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

ডগলাসের পরে বার্জ এবার ম্যাজিস্ট্রেট। ফাঁসি পরানোর সময়টা বার্জ হাজির আছে:

Are you ready Prodyot?

One minute Mr. Burge, I have something to say.

Speak out.

We are determined not to allow any European to remain at Midnapore. Yours is the next turn. Get yourself ready Mr. Burge.

ঠিক তাই। দেবতারা নেমে আসেন কিনা এইসব বীরকিশোর মূর্তি ধারণ করে—ওঁদের কথা অক্ষরে-অক্ষরে ফলে যায়।

১২ জানুয়ারি ১৯৩৩, প্রদ্যোতের ফাঁসি। আট মাসও গেল না—২ সেপ্টেম্বর আবার রিভলভার গর্জাল। ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ খতম।

এমনিধারা কত মৃত্যু জানি। কাকে রেখে কার কথা বলব, ধাঁধা লেগে যায়।

যাক সেকাল, একালে আসি। একাল সেকালকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছে মৃত্যু বাবদে। গান্ধী-শিষ্যেরা মসনদে বসে তাজ্জব খেল দেখাচ্ছেন। গুলি, গুলি, গুলি—পাইকারি হারে গুলি চলছে। সশস্ত্র চীনারা নেফা অঞ্চলে হামলা দিলে পলায়নের পাল্লাপাল্লি চলেছিল বটে, কিন্তু এবারের শত্রুর অস্ত্র নেই। তবে আর পরোয়া কিসের? ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি, এবং পাল্টা মিছিল। সরব মিছিল, মৌন-মিছিল। হাজার হাজার নরনারী মিছিলের অংশীদার। মিছিল কলকাতায়, দুর্গাপুরে, শিলংয়ে, লক্ষ্ণৌয়ে—কোথায় বা নয়। অভিশপ্ত পুলিশ—বন্দুকবাজিতে যাদের শান্তি বজায় রাখতে হয়। মৌন-মিছিলের মৌন ধিক্কার পুলিশের উপর, গবর্নমেণ্টের উপর, শাসনযন্ত্রের উপর।

সন্ধ্যার পর স্তিমিত চারিদিক—শ্মশানের শান্তি। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটা, বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ। নগরী নিষ্প্রদীপ। যেন শত্রুপক্ষের আক্রমণে সমস্ত চুরমার হয়ে গেছে। এবং পরের দিনের আক্রমণের ব্যবস্থা চলছে অন্ধকারের গোপনে।

যেদিকে তাকাবেন বিক্ষোভ সংঘর্ষ আর বন্ধ্-আন্দোলন। উনিশ বছরের স্বাধীনতায় যত মানুষ হতাহত, ইংরেজের দু-শ বছরেও এমন বোধহয় হয় নি। কালোবাজারি মুনাফাখোর সমাজশত্রুরা নয়—উঁহু, স্বদেশি বুলেট লুণ্ঠক নরখাদকদের হত্যা করে না। হত্যা করছে যারা চাল চায়, ন্যায্য দরে জীবন-ধারণের জিনিসপত্র চায়, যারা বাঁচতে চায়। নাথুরাম গডসে গান্ধিজীর

বুকে গুলি মেরে কী-ই বা করল, তিলে তিলে তাঁকে শেষ করে দিল শিষ্য-নামধারী ভণ্ডের দল।

খাদ্য দাও—রাজ্যে রাজ্যে কর্তারা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরেছেন। সবাই বিমুখ। ক্ষুধার্ত মানুষ পেটের জ্বালায় হন্তে হয়ে উঠেছে—কখন কী কাণ্ড ঘটে, বলা যায় না। খাদ্য দিলে না—পুলিশই দাও তা-হলে। মিলিটারি পুলিশ। আন্দোলনের যা বহর, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ যথেষ্ট নয় তাদের পক্ষে। এবং নির্ভরযোগ্যও নয়। প্রতিবেশী উড়িষ্যা উদ্বৃত্ত রাজ্য হয়েও চাল দেয় নি, তবে পুলিশ দিল। নয়-শ পুলিশের এক-এক কোম্পানি—এমনি ছয়টা কোম্পানি পাঠাল। তবে খরচখরচা যাবতীয় তোমাদের, অতিরিক্ত এই পুলিশ-মানুষদের খাওয়াবে তোমরাই। উপায় কি—বাঙালি পুলিশগুলোকে বিশ্বাস নেই, শুষ্কমুখ ক্ষুধাতুর জাতভাইদের ঠ্যাঙাতে নারাজ হয় যদি। বাইরে থেকে কিছু এনে মিশাল করে দেওয়া নিরাপদ। ইংরেজরা ঠিক এই রকম করত। নেটিভ পুলিশ বিশ্বাস করত না, নিজেদের স্বজাত গোরা-সার্জেন্ট মিশাল করে দিত তাদের সঙ্গে। ইংরেজের কায়দাকানুনগুলো হুবহু নিয়ে নিয়েছি আমরা।

গাঁ-ঘরে চক্কোর দিয়ে আসি চলুন।

দু-দিন কেটে গেছে। মৃত্যুতাণ্ডব আপাতত মুলতুবি, কিন্তু বাতাস ভারি এখনো। চাপা কান্না শুনি পাড়ার মধ্যে। পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, আর ক্ষোভের সঙ্গে আতঙ্ক। একটা সন্ত্রাসের ভাব। শুধু মানুষ মেরেছে তা নয়—পুলিশের খুশি মতন টানাহেঁচড়া, ধরপাকড়, বেপরোয়া মারধোর। জোয়ান-যুবা কেউ বাড়ি শোয় না রাত্রে—আত্মগোপন ও নিশিজাগরণের ক্লেশ মুখের উপর কালি মেড়ে দিয়েছে। বুড়োরাই লাঠি ঠুক-ঠুক করে সারা রাত পাড়া পাহারা দেন।

পুলিশের কর্মকাণ্ডের বিস্তর স্বাক্ষর—ঘুরে ঘুরে কিছু নমুনা

দেখছি। বাড়ির দরজা-জানলায় আস্ত কবাট বড়-একটা নেই। মানুষের দেহেও আঘাত-চিহ্ন। বারো বছরের মেয়ে মঞ্জু ঘোষের চোখের নিচে মস্তবড় কাটা—অল্পের জন্য চোখ বেঁচে গেছে। বাঁ-হাতি সরু রাস্তা ধরে আমিন-মিঞার-বস্তি। আর্তনাদ উঠেছে —মা বিভারানী মাথা ভাঙছেন দেয়ালে: ওরা আমায় কেন মেরে ফেলল না বাবা?

কী করে মারল আপনার নারায়ণকে?

রাস্তায় ব্যারিকেড, পুলিশ সরিয়ে ফেলছিল। দু-চারটে ইটপাটকেল পড়েছে। রাগ চড়ে গেল অমনি। যত্রতত্র ছুটছে পুলিশ। আর বেধড়ক গুলি।

বাড়ির একমাত্র রোজগেরে ছেলে নারায়ণ। ছুটে এসে ঘরের মধ্যে সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করল। কাটল বুঝি আজকের ফাঁড়া—বলছিল নারায়ণ। বলতে-না-বলতে ফট-ফট করে বাইরে একঝাঁক গুলি। দরমা-ঘেরা ঘর—বেড়া ভেদ করে পয়লা গুলি টিনের চালে গিয়ে লাগল। পরের গুলি নারায়ণের উরুতে। মাগো—বলে মুখ থুবড়ে ঘরের মেজেয় পড়ে গেল।

বিভারানী বলছেন, আর ওঠে নি আমার নারাণ। শেষবার সেই তার 'মা' বলে ডাকা। কাপড়ের কলের ক্যানটিনে কাজ করত, রিক্সা টানত অবসর সময়ে। মা আর ভাইবোন কতকগুলো। দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে। একলা সে-ই রোজগার করে খাওয়াত।

পাশের ঘরের লক্ষ্মীমণি হি-হি করে হাসে। টেনে নিয়ে বিছানায় কাপড়-চোপড়ে পোড়া-দাগ দেখাল। গুলি এ-ঘরের বেড়াও ভেদ করেছিল, শুধুমাত্র কাপড়-বিছানা পুড়িয়েই বিদায় হয়েছে। কী করে প্রাণ বাঁচিয়েছিল, কৌশলটা দেখাল হাসতে হাসতে। সদর রাস্তা থেকে ধুপধাপ বুট বাজিয়ে পুলিশ গলিতে এলো, সঙ্গে সঙ্গে এরাও একেবারে খাটের তলায়।

হি-হি-হি—গুটিসুটি হয়ে বোধকরি একহাত জায়গার মধ্যে গোল হয়ে ছিল।

লাবণ্যপ্রভা মুখে আঁচল দিয়ে ফোঁপাচ্ছেন। কোল-মোছা ছেলে সুধীর ইস্কুলে পড়ে। ছবি আঁকার শখ। সেই সকালে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ছবি আঁকছিল। লাবণ্য ডাকাডাকি করছেন: কত বেলা হল। চান করে খেতে বোস্। খেয়েদেয়ে তারপরে আবার ছবি হবে। বকাবকিতে সুধীর চান করে এলো। ভাত দিয়েছেন মা—খেতে বসতে যাবে, এমনি সময় রাস্তায় কলরব। ছোট ছেলে—কৌতূহলে গিয়েছে বড়-রাস্তায়। পুলিশে একটা দল তাড়া করল, ভয় পেয়ে সুধীরও বাড়ি ছুটেছে। গুলি। ঢলে পড়ল রাস্তার উপর। রক্তের স্রোত। আর খেতে বসবে না ছেলে। শাস্ত্রীজীর ছবি আর শেষ হল না।

মড়া সেই থেকে রাস্তায় পড়ে পুলিশ-পাহারায়। ছাড়বে না মড়া, হাসপাতালের লাসঘরে নিয়ে যাবে। পাড়ার একজনে ফোটো তোলে, তার কাছে মা কেঁদে গিয়ে পড়লেন: সুধীরের একটা ছবি তুলে দাও।

না, ছবি তুলতেও দেবে না। যে-পুলিশ হত্যা করেছে, তাদের কাছে মা সজল চোখে আকুলি-বিকুলি করছেন: হুকুমটা দিয়ে দাও, সুধীর আমার ছবি হয়ে দেয়ালের গায়ে থাকবে।

দিল না। এই সেদিন ছিল—আজ সুধীর কোথাও নেই দুনিয়ার ভিতর।

সন্তোষ দে সেদিক দিয়ে ভাগ্যবান। ছবি উঠেছে আজকের কাগজে। লাখ লাখ ছাপা হয়—সন্তোষের অতএব লক্ষ ছবি। সেদিন সকালে এই কাগজ পড়েই দেশের খবরাখবর নিচ্ছিলেন সন্তোষ। গুলির আওয়াজ শুনলেন বাইরে। রাস্তায় মেয়ে—এটা-ওটা কিনবার জন্ত। মুদিখানায় তো ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। ও খুকি, কোথায় গেলি রে? ব্যস্ত হয়ে মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। দুম করে

এক গুলি। রাস্তার উপরেই সন্তোষ মুখ থুবড়ে পড়লেন। এই যে আমি, ও বাবা, এই তো আমি এসেছি—। ইতিমধ্যে মেয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল, ছুটতে ছুটতে সেইখানে এলো। একা সে নয়—ভাইবোনে পাঁচটি, সবাই এসেছে। বাবা, বাবা—বলে বুক ছেড়ে কাঁদছে। ভাগ্যবান পুরুষ সন্তোষ—আশি বছরের মা-জননী এখনো জীবিত। আমরা যখন গেলাম, বুড়ি-মা আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে খবরের-কাগজের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। চারিদিক ঘিরে আছে—কালোপাড়-ধুতি পরনে সন্তোষের সন্ত-বিধবা স্ত্রী এবং অপোগণ্ড পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। পরশুও যে সন্তোষ ছিলেন, আজকের কাগজে সকলে মিলে সেই সন্তোষের ছবি দেখছে।

পাঁচ-বছুরে ইব্রাহিম জানলায় বসে মুড়ির বাটি থেকে মুড়ি খাচ্ছিল, পঞ্চাশ বছুরে দীনেশ বর্ধন পুকুরে স্নান করে ভিজে লুঙি মেলে দিচ্ছিলেন ঘাসের উপর। পর পর দুই গুলিতে ছিটকে পড়লেন উভয়ে। কতদিকে কত এমনি মরছে, সীমা-সংখ্যা নেই। সব জিনিস আক্রা, একমাত্র সুলভ জিনিস প্রাণ। খুশি মতন তাই নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে।

বিস্তর মরণ সামনের ভবিষ্যতেও—সেই যে গানের কলি 'এখনো অনেক প্রাণ, চাই যে বলিদান'। সে মৃত্যু কী চেহারা নেবে, কে বলবে? ঈশ্বর আছেন কিনা জানিনে, তাঁরই নামে তবু প্রার্থনা জানিয়ে রাখি, বাংলা দেশকে রক্ষা করুন তিনি!

ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ বর্মা বই থেকে মুখ তুললেন। সকলে উৎকর্ণ। বলছেন, প্যারীর উপকণ্ঠে বাস্তিলের বিরাট স্মৃতিস্তম্ভে অগুন্তি নাম রয়েছে—দুর্গ-ধ্বংসে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন। আমার চোখে পড়ে নি, কিন্তু শুনতে পাই ভারতীয় একটি নামও তাঁদের মধ্যে। মস্কোয় রেড-স্কোয়ারের পাশে ক্রেমলিনের গা ঘেঁষে পাইকারি কবর। বিপ্লবের কালে এক নিশিরাত্রে প্রকাণ্ড দুই

গর্ত খুঁড়ল। শহিদের দেহগুলো শহরময় ছড়িয়ে ছিল, এনে এনে গাদা করল সেখানে। গর্তের ভিতরে তারপর ইটের পাঁজা সাজানোর মতন উপর-নিচে ও পাশাপাশি মড়াদের সাজিয়ে মাটি চাপা দিল। কবরের উপর পরিপাটি পুষ্পোদ্যান এখন। চীনেও এমনি সব আছে। একটা দেখেছিলাম ক্যান্টনে—বাহাত্তর-শহিদের সমাধি। জায়গাটার নাম বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়াবে, 'হলদে ফুলের পাহাড়'। মর্মরসৌধের চারিদিকে লক্ষকোটি তারার মতো হলদে হলদে ফুল ফুটে রয়েছে।

ঈশ্বর যদি থাকেন—কামনা জানাচ্ছি, ভারতকে বাঁচান যেন তিনি!

॥ সাতাশ ॥

গুজব ছড়িয়েছে, এক ব্যাটালিয়ন কোথায় নাকি গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। সত্যি মিথ্যে খোদায় মালুম। নাকি বলেছে, ভারতের শত্রু যারা তাদের দিকে আমরা বন্দুক তুলব। দেশ-সেবক আমরা, মাইনে-খাওয়া কশাই নই। দেশের মানুষ ওরা, তায় নিরস্ত্র—ওদের আমরা মারতে পারব না।

বলেছে এই নাকি। এবং বন্দুক নামিয়ে লাইন ভেঙে বেরিয়ে এসেছে।

বলেছে সাচ্চা কথা। দেশের নরনারীর নয়নপুত্তলি এই জওয়ানরা। ভালবাসার দুলাল। লড়াইয়ের সময় কলকাতা শহরেই কত দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। খাবারের টানাটানি কর্তাদের ব্যবস্থার গুণে—পয়সা দিয়েও সব সময় মেলে না। কপালগুণে তাই হয়তো মিলেছে, বসে গেছে খাবার-টেবিলে। ঠিক এই সময়ে জওয়ান ক'জন রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল।

বুড়োআঙুল নেড়ে ম্যানেজার বলে, ঢনঢন। যা ছিল ঐ খতম হয়ে গেল।

খদ্দেররা কিন্তু টেবিল ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়: খান—আপনারা?

না-ই বা খেলাম আজ আমরা। পাহাড়ে জঙ্গলে কতদিন আপনারা নিরাহারে থাকেন—আমাদেরই জন্যে। আজকে সকলের মতন খাবার না জোটে তো আপনারাই খাবেন, আমাদের উপোস।

দুর্গম ফ্রন্টে ভাইফোঁটা পাঠায়, শীতের জন্য সোয়েটার বুনে পাঠায়। লেখকরা বই পাঠায়। আমরা এখানে যত কষ্টেই থাকি, অভাবের আঁচ না লাগে যেন তাদের গায়ে। জওয়ানরা মনে

রাখে এসব। তারাও বলে, তোমাদের ভালবাসা বর্মের মতন ঘিরে থাকে বলেই আমাদের শৌর্য-সাহস। সামান্য অস্ত্র নিয়ে প্যাটন-ট্যাঙ্ক সাবাড় করি, মিগ-বিমান দলা পাকিয়ে ভূতলে ফেলে দিই। শাসকদল নিজেরা অপদার্থ। হালে পানি পাচ্ছে না, বন্দুক বাগিয়ে আমাদেরই সামাল দিতে হবে। পরিণামে, ভালবাসা উপে গিয়ে ঘৃণা করবে দেশের মানুষ।

বৃত্তান্ত শুনে নীলকণ্ঠ বর্মা শিউরে উঠলেন: জল্লাদের কাজে জওয়ানদের লাগানো—সর্বনেশে জিনিস। ফল বড় সাংঘাতিক। বন্দুক যত্রতত্র তাক করবার হুকুম দেয়, সেই সব বন্দুকই একদিন হুকুমদারদের দিকে তাক করে। দুনিয়ায় হাজারগণ্ডা নজির—যার নাম মিলিটারি ক্যু। নাইজেরিয়া গণতন্ত্রে একেবারে হালফিল যা ঘটল।

নাইজেরিয়ার প্রধান-মন্ত্রীটি নিজে তত খারাপ ছিলেন না, কিন্তু সঙ্গীরা অতি জঘন্য। মন্ত্রী বানিয়ে যাদের সব মসনদে তুলেছেন, বেপরোয়া ঘুসখোর তারা। কোন রকম নীতির বালাই নেই। অর্থমন্ত্রী ঘুস খান রেখেঢেকে নয়, পুরোদস্তুর খোলাখুলি। ধরুন, আমদানি-লাইসেন্সের দরবার নিয়ে এসেছে এক ব্যক্তি। এসে নিজের ফার্মের গুণপনা বলছে: এমন সাচ্চা কাজকারবার দুনিয়ার উপর অন্য কারো নেই।

অর্থমন্ত্রী হাত ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেন, তবে আসুন মশায়।

থতমত খেয়ে দরখাস্তকারী বলে, আজ্ঞে?

লাইসেন্স পাবেন না আপনি। পেয়েই বা কী হবে? লোকসান খেয়ে মরবেন।

সরল সাফ কথা অর্থমন্ত্রীর। বলেন, গণতন্ত্রের দেশে মন্ত্রিত্ব হল পদ্মপত্রে-জল। আজকে আছে, কাল যদিই-বা থাকে, পরশু কদাপি নেই। ভোটে জিতে অন্য লোকে নিয়ে নেবে। তাড়াহুড়ো করে

যাবতীয় খরচ-খরচা আমায় তুলে নিতে হবে। দেবেন আপনারাই —এই পারমিট বাবদেও দেবেন। এত দিয়েথুয়ে সাচ্চা কাজকারবারে তো পোষাতে পারবেন না। সেই জন্তে বলি, আপোসে আপনি সরে পড়ুন, আপনাকে দিয়ে হবে না।

পদ্মপত্রে-জল—ঐ যে উপমা দিলেন, সেটা কিন্তু নিতান্তই বিনয়ের কথা। গণতন্ত্রের (বিলাতি গণতন্ত্রের কথা বলছিনে। তাদের ঘাঁটি থেকে গণতন্ত্রের নামে যে মাল নিরক্ষর দরিদ্র অঞ্চলে রপ্তানি হয়েছে) মজাই হল, যথোচিত তদ্বির-বন্দোবস্তের ফলে পার্টি চিরকাল ক্ষমতায় থাকে। এবং পার্টির ভিতরে দ্বিতীয় দফা তদ্বিরের ফলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মন্ত্রিত্বও। (পশ্চিম-বঙ্গেরই এক সত্য ঘটনা—গত ইলেকসনের মুখে কাগজে পড়েছেন। ভোটারদের তালিকায় বাদ পড়ে গেছে বলে পার্টির এক কেষ্টবিষ্টু বারো-শ ফরম সহ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির। বিভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানা। ম্যাজিস্ট্রেট সন্দেহ করলেন: আঙুলের ছাপ সবই যেন একরকম। কক্ষনো না, হতেই পারে না, ভুল ধারণা আপনার। প্রতিবাদ কানে না নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষজ্ঞ এনে পরীক্ষা করালেন। ভুল ম্যাজিস্ট্রেটেরই বটে—আঙুলের ছাপ একখানা হাতের কেন হবে, চার-চারখানা হাতের। অনুসন্ধান-ক্রমে সেই একগণ্ডা হাতের মালিকদেরও নিশানা পাওয়া গেল—কেষ্টবিষ্টু মশায় স্বয়ং, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে।)

পার্টির টাকার অনটন নেই, কালো-পথ ধরে ধারাস্রোতে টাকা আসছে। তালিম-দেওয়া লাখো লাখো কর্মী—ভোটের ব্যাপারে তারা বাস্তুঘুঘু এক-একটি। কিন্তু নাইজেরিয়ায় অঘটন—এত সব দরাজ ব্যবস্থা সত্ত্বেও ইলেকসনে জুত হচ্ছে না। তখন শেষ-অস্ত্র প্রয়োগ—ব্যালট-বাক্সের লেবেল পালটে দেওয়া। সর্বক্ষেত্রে তাতেও সুবিধে হল না দেখে ফলাফল-ঘোষণায় কারচুপি—পরাজিতকে জয়ী বলে ঘোষণা। গদি থেকে কেমন করে সরায় দেখি।

লোকে তিতবিরক্ত। যাচ্ছেতাই হোক গে—বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ঝড় কেটে গেছে, কর্তারা ভাবলেন। কিন্তু একচক্ষু-হরিণ তাকিয়ে দেখে না, একটা ভিন্ন দিক আছে—আচমকা সেখান থেকে প্রচণ্ড আঘাত আসে। নাইজেরিয়ায় হল তাই। সৈন্যেরা বিদ্রোহ করল—মিলিটারি ক্যু।

প্রধানমন্ত্রীর ঘরে গিয়ে সবিনয় নিবেদন: একটিবার বাইরে আসতে হয় যে হুজুর। মানুষ বড় উতলা হয়ে দেখতে চাইছে।

ঝাণু লোক তিনি, বুঝতে কিছু বাকি নেই। তাড়াতাড়ি পোশাক পরলেন—গির্জায় প্রার্থনার পোশাক। দুই হাত উঁচু করে এসে দাঁড়ালেন জনতার সামনে। চারিদিক একনজর দেখে নিয়ে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে খানিকটা আদেশের সুরে বললেন, হ্যাণ্ডকাফ পরাও—আমি অপরাধী।

প্রধানমন্ত্রীর হাতে হাতকড়া পরাল—না বললেও পরাত, এসেছে তারা এইজন্যেই। বন্দী মন্ত্রী ধীরপায়ে গিয়ে কয়েদির গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল, আর দেখা যায় না।

অর্থমন্ত্রীর বাড়িতেও সৈন্য ঢুকে গেছে। পায়জামা পরে দ্রুত তিনি বেরিয়ে এলেন। নোটের বোঝা পাঁজা করে এনেছেন। বলছেন, যত টাকা ইচ্ছে নাও। টাকা নিয়ে রেহাই দিয়ে যাও বাপধনেরা।

বাণ্ডিল খুলে নোট চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। অতি-দরিদ্র সব মানুষ—এক টাকা দু-টাকায় দিন ভোর মজুরবৃত্তি করে। কিন্তু কী হয়ে গেল হঠাৎ—লক্ষপতি কোটিপতি রাজা-ধিরাজ যেন এক-একটি। মন্ত্রীর টাকা জনতা আজ পায়ে দলছে, কেউ বা দু-হাতে নোট তুলে ধরে টুকরো টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে। বেগতিক বুঝে অর্থমন্ত্রী এইবারে দৌড়ে পালাচ্ছেন। চোর নির্বিঘ্নে চুরি করছিল, গৃহস্থ এতদিনে সজাগ হয়ে তাড়া করেছে—এমনি একটা ভাব।

তাড়া করে ধরে ফেলল মন্ত্রীকে। বুক-ফাটা আর্তনাদ, প্রাণের জন্য কী কাকুতি-মিনতি! মেরো না বাপসকল, বাঁচতে দাও। যথাসর্বস্ব নিয়ে প্রাণ-ভিক্ষা দিয়ে যাও আমায়।

জনতা বলল, পলিসি করে কত লোক এ-তাবৎ মেরেছ, গোণাগণতি নেই। হাজার হাজার জীবনের বদলা একটা মাত্র জীবন—তাতে আপত্তি করলে হবে কেন?

জনতা রাস্তার উপরে হিড়-হিড় করে টেনে চিত করে ফেলল। জনা দুই বুকের উপরে নাচছে উন্মত্তভাবে। নিঃসাড় হলে, ঠ্যাং ধরে টেনে নর্দমায় ফেলে দিল। প্রধান-মন্ত্রীকেও ভিন্ন এক নর্দমার মধ্যে পাওয়া গেল কয়েকটা দিন পরে।

আর একজন ছিলেন, আমির তিনি—শাসকদলের নেতা, গভর্নমেণ্টের পয়লানম্বরি স্তম্ভ। আমিরের প্রাসাদের সামনে দিয়ে যেতে বুক ধড়ফড় করত। সেই সব মূর্খ ভীতু মানুষেরা অবলীলাক্রমে প্রাসাদে ঢুকে গেল, আমিরকে ধরে আনল টানতে টানতে। দেয়ালে ঠেসে ধরে বুকের উপরে বন্দুকের নল ঠেকনো দিল। তারপর ধীরেসুস্থে ট্রিগার টিপল একেবারে অনুত্তেজনার মধ্যে গল্প করতে করতে। শেষ। ধাক্কা মেরে নর্দমায় ফেলল।

বিদ্রোহ ধোঁয়াচ্ছিল, একটা পাকাপোক্ত দল গড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। চরের মুখে বার্তা পেয়ে কর্তারা সন্ত্রস্ত হলেন। সৈন্যদের উপর ফরমাস হল বিদ্রোহী-দল সায়েস্তা করবার জন্য। পরিবর্তে কী চাই বলো। কত টাকা চাই? খাদ্য, সুখ-সুবিধা, মদ্য, স্ত্রীলোক? তাতেই আরো সৈন্যদল ক্ষেপে গেল: দেশের জন্য আমরা প্রাণ অবধি দিতে রাজি, তাই বলে কি দুষ্টচক্রের ঐ নায়কদের জন্য?

মন্ত্রীরা পরিণামে পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পান নি। বিদ্রোহ সফল হল, জনচিত্তে উল্লাসতরঙ্গ। শোভাযাত্রা বেরিয়েছে—তার মধ্যে সকল সম্প্রদায়। এ-দলে ও-দলে কত রকমের বিরোধ ছিল, এই মুহূর্তে ধুয়ে-মুছে পরিচ্ছন্ন সে সব। মানুষের মর্যাদা ও

আত্মশক্তি কোন বিবরে যেন লুকিয়ে ছিল, মুক্ত হয়ে সূর্যালোকে আজ বেরিয়ে এসেছে। বিশাল শবাধার কাঁধে বয়ে চলেছে—গায়ে লেখা রয়েছে 'অন্ধকার অনাচারের মৃতদেহ'।

নীলকান্ত বর্মা মন্তব্য করলেন: গোখরো নিয়ে খেলা বিপজ্জনক। হোক না পোষা-গোখরো। যে খেলাচ্ছে তার উপরেই কোন্ সময় ছোবল ঝাড়বে, ঠিক-ঠিকানা নেই। ওস্তাদ সাপুড়ে সাপ খেলায় বটে, কিন্তু ঝাঁপি খোলার আগে ভাল করে দেখে নেয় বিষদাঁত ভাঙা আছে কি না।

ফুল্লরা অধীর কণ্ঠে বলল, আর কতক্ষণ ভাই?

ফুলি বলে, অন্ধকার হোক। সিগন্যাল দেখাবে ওপার থেকে: বেরিয়ে পড়ো এইবার। তখন। বললাম তো, আগে এত সব বায়নাক্কা ছিল না—দিনে রাত্রে যার যখন দরকার, পার করে দিত। কর্তাব্যক্তিদের কেউ ঘাটের কাছাকাছি নেই, বেমক্কা ধরে ফেলবে না—এইটুকু শুধু জেনে নেওয়া। সিগন্যালটা চালু হল এইজন্যে। ফৌজ এসে পড়ল, ঘাটোয়ালরা সেই থেকে কড়াকড়ি করছে। হুম করে ঘাড়ে যদি একটা গুলি এসে পড়ে, বদনাম ঘাটোয়ালেরই তো।

পুরুষদের ঘরেও ঠিক সেই প্রশ্ন।

বীরেশ্বর বললেন, কখন রওনা?

আনোয়ার বলল, আমরা তো ছটফট করছি। কিন্তু ফাঁকা মাঠে সময় না বুঝে নামা চলবে না।

দিনের আলো একেবারে নেভে নি, আকাশের কোণে চাঁদ দেখা দিয়েছে। পাণ্ডুর খণ্ডচাঁদ। চাঁদ দেখে আনোয়ার ক্ষেপে উঠল: যাবেন কী করে? চাঁদ-শয়তান বেলাবেলি আকাশে চড়ে বসে আছে। দশমী তিথি, বিশ দণ্ড জ্যোৎস্না। তার মানে রাত দুটো-

আড়াইটে। ততক্ষণ ভোগান্তি আছে কপালে। এড়ানোর উপায় নেই।

পরক্ষণেই ভরসা দিয়ে বলে, কী আর হবে! জলে পড়েন নি স্যার, মল্লিকঘাটের উপর আছেন। শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিন যতক্ষণ না সিগন্যাল আসছে। লম্বা উঠোন পড়ে রয়েছে, মাঠের খোলা হাওয়া, চাঁদের আলোয় চক্কোর দিয়ে বেড়ান। সময় দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তবে যা-কিছু করবেন, পাঁচিলের ভিতরে। বাইরে কদাচ নয়। উঁকিঝুঁকিও দেবেন না মাথা বের করে। বিপদ ঘটতে পারে, গুলি এসে লাগতে পারে। কী দরকার! সময় হলে দলবদ্ধ হয়ে সকলে বেরিয়ে পড়ব।

আনোয়ার শুয়ে-বসে সময় কাটানোর কথা বলছে। ও-ঘরে ফুল্লরার সত্যি সত্যি প্রয়োজন তাই—তক্তাপোষের উপর শুয়ে পড়া, নিতান্তপক্ষে চোখ বুজে চুপচাপ বসা দেয়াল ঠেসান দিয়ে। সমস্তটা দিন বড্ড ধকল গেছে, চোখ ভেঙে আসছে ঘুমে।

আনোয়ার ব্যবস্থা দিলে কি হবে, ফুলি হতে দিল আর কি! জড়িয়ে ধরেছে ফুল্লরাকে। আর অবিরাম বকবক করছে সেই থেকে। হাই তুলল ফুল্লরা তো হাঁ-হাঁ করে ওঠে: ও কি হচ্ছে? মতলব তোমার ভাল নয়। চুপচাপ থাকতে হলে দম ফেটে নির্ঘাৎ আমি মারা পড়ব। কপালগুণে তোমায় একজন পেলাম, তা তুমিও ঘুমিয়ে থাকতে চাও। একটা রাত্রি না-ই বা ঘুমুলে! বলি, নাক ডেকে ঘুমুতে চাও তো বিয়ের চেষ্টায় যাচ্ছ কোন বিবেচনায়?

ফুল্লরা শুধায়: বিয়ে কে বলল?

জানতে বাকি থাকে বুঝি! অমলেশ-দা জানল, আনোয়ার-ভাই জানল—আমিই কেবল জানব না? বিয়ে হতে যাচ্ছে, ভালই তো! মস্ত খুশির কথা। কিন্তু ঘুমে ইস্তফা পড়ল।

ফুল্লরা বলে, কেন? কেন?

ঘুমুতে দিলে তো।

একগাল হেসে আবার বলল, হয় তুমি একেবারে গোবেচারা, নয় তো অতি-সেয়ানা—ধরা-ছোঁওয়া দিতে চাও না। বিয়ের পরে দুনিয়ার কোন্ বর ঘুমুতে দেয় শুনি ? তোমাকেও দেবে না। না-ঘুমুনো অভ্যেস করো ভাই। আজ থেকেই।

মৃন্ময়ার মুখে এসেছিল : তুমিই বা জানলে কিসে ? ক'টা বরের সঙ্গে ঘর করে পাকা-গিন্নি হয়েছে এমন ?

বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, মুখে আটকাল। তারাফুলির মতন লহমায় সে ভাব জমাতে পারে না।

প্রজাসাধারণ নিতান্তই গাড়োল। রুটির অনটন—কেক খেলেই তো ঝামেলা চুকে যায়।

দয়া-বিগলিত সম্রাজ্ঞী মারী আঁতোয়ানাতে এক-কথায় কেমন সমাধান করে দিলেন। তবু তারা কেন দাপাদাপি হাঁকাহাঁকি করে মরে—জিনিসটা রানীর মাথায় ঢোকে না কিছুতেই। আমাদেরও এখন ভাত জুটছে না—মানুষে ভাতের বদলে পোলাও-বিরিয়ানি খাক, কর্তাদের মধ্যে সুবুদ্ধিমান কেউ বাতলেছেন কি না কানে আসে নি। তবে ফল এবং কাঁচকলার পরামর্শ দেদার পেয়েছি।

রানী তো ঐ বললেন, কিন্তু সমাধানটা শেষ অবধি কি রকম দাঁড়াল ? মাঝপথে গল্পটা চাপা পড়ে আছে—যাত্রাওয়ালা প্রমথ উসকে দিয়ে বলে, তারপর ?

বই থেকে মুখ তুলে নীলকণ্ঠ বর্মা সংক্ষেপে বললেন, মুণ্ডচ্ছেদ —রাজার, রানীর।

বোমা ফাটল যেন কথায়, শ্রোতাদের আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। রাজা-রানী তো ঠাকুর-দেবতার শামিল। আমাদেরও অঢেল ছিল। সাফ হয়ে গেছেন। নমুনা হিসাবে মিউজিয়ামেও রেখে দেওয়া হয় নি কোন-একটিকে। অথচ আজও দেখতে

পাবেন, ঝুড়ি কাঁধে কোন চাষীপ্রজা ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাটে যাচ্ছে —রাজবাড়ির সামনে এসে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে পড়বে। কাঁধের ঝুড়ি মাটিতে নামিয়ে, কাপড়ের প্রান্ত গলায় তুলে গলবস্ত্র হয়ে পথের ধুলোর উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে রাজবাড়ির উদ্দেশে। সে রাজবাড়ি অথচ একেবারেই রাজাবিহীন—রাজার আমলের টিকটিকিটা আরশুলাটা অবধি থাকে না সেখানে।

স্তম্ভিত প্রমথ প্রশ্ন করে: মেরে ফেলল রাজা-রানীকে?

গলা কেটে দিল।

শান্তকণ্ঠে নীলকণ্ঠ বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন: আঁশবঁটিতে মাছ-কোটার মতন করে রাজা-রানীর মুণ্ড কেটেছিল গিলোটিন-যন্ত্রে। প্যারী শহরের ভিতরে ঠিক সেই জায়গায় গিলোটিন আজও রয়েছে। হত্যা করে ওরা তিলেক লজ্জিত নয়, জাঁক করে দেশবিদেশের মানুষের কাছে বলে, অকুস্থল দেখিয়ে দেয়। ভার্সাই প্রাসাদের দিকে সামান্য-সাধারণে একদা বোধহয় চোখতুলে তাকাতেই ভরসা পেতো না। কী হয়ে গেল তারপর—রে-রে করে করে বিদ্রোহী জনতা ঢুকে পড়ল। প্রকাণ্ড উঠান ভরে গেল মানুষে মানুষে, যাদের মুখের অন্নে বঞ্চনা করেছে রাজ সরকার। ট্যাক্সে ট্যাক্সে চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে ছেড়েছে: লবনের ট্যাক্স, পাউডারের ট্যাক্স, বিবাহিতের ট্যাক্স, পায়রা পুষতে হলে তারও ট্যাক্স। গোল-মাল শুনে রানী দোতলার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে গেল মানুষ, ধাক্কা দিতে দিতে রানীকে নামিয়ে আনল। রাজাকেও ধরেছে। রাজা বন্দী, রানী বন্দী। বন্দী করে দ্য টেম্পল কারাগারে রেখেছে। যে ফটক দিয়ে শত্রুরা প্রাসাদে ঢুকেছিল, সোনার-রং তার এখন। নাম —গোল্ডেন গেট, সোনালি ফটক।

থেমে একটুখানি দম নিয়ে নীলকণ্ঠ বললেন, বন্দী করেই রাখত বোধহয়, হত্যা অবধি যেত না। কিন্তু নানা সূত্রের খবর, প্রতি-

বিপ্লবের জোর ষড়যন্ত্র চলেছে—রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে। রাজা ষোড়শ লুই আসামির কাঠগড়ায়। রাজা, তুমি চিরকাল সকলের বিচার করে এসেছ, তোমার বিচার আজকে। আইনের নানা রকম তর্ক—রাজা বিচারের উর্ধ্বে। কিন্তু রাজকীয় ভাবমূর্তি একেবারে বিলয় হয়ে গেছে, কূটতর্ক কারো মনে আঁচড় কাটে না আজ। রায় দিল মৃত্যুদণ্ড। ২১ জানুয়ারি, ১৭৯৩—গিলোটিনে রাজমুণ্ড কাটা পড়ল। সুন্দরী রানীরও রেহাই হল না। গিলোটিন কবলিত হলেন ন'মাস পরে ১৬ অক্টোবর। সে হত্যা কতদূর নৃশংস, চোখে দেখে আন্দাজ নেবেন তো ব্যবস্থা রয়েছে লণ্ডনে মাদাম তুসোর মিউজিয়ামে। গিলোটিনের ফলায় মেরি আঁতোয়ানাতের গলা দুই খণ্ড হচ্ছে, দৃশ্যটা জীবন্ত হয়ে আছে মোমের মূর্তিতে। মূর্তিকার রানীই এক অন্তরঙ্গ সহচরী—চোখে যা দেখেছিলেন, হুবহু তাই বানিয়ে রেখেছেন। কী বীভৎস! গায়ে আপনার কাঁটা দিয়ে উঠবে।

॥ নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট ॥

বিক্ষোভের আগুন কৃষ্ণনগরকে দুই দিন সম্পূর্ণ গ্রাস করেছিল। তিনজন মারা পড়ল, আর শত শত মানুষের নিগ্রহ। তার মূলে কী? পেটে ভাত নেই, পরনের কাপড় নেই, আলো জ্বালবার একফোঁটা কেরোসিন নেই। তার উপর রয়েছে লেভি। লেভি ধরার মুখে অবিচার, আদায়ের সময় অত্যাচার। তার বিরুদ্ধে গান বেঁধেছে, গোপীযন্ত্র বাজিয়ে গায়:

জুলুমে ধান নিতে দেবো না—
(আমরা) ভীরুও নই, ক্লীবও নই—
জুলুমে ধান নিতে দেবো না।
ছেলের মুখের অন্নটুকু,
চাষীর ঘরের প্রয়োজন,
রাখতে না দেয়, কাড়তে সে চায়—
চোরা রাজা দুঃশাসন।

(তাই)   জুলুমে ধান নিতে দেবো না।
নামেই শুধু নিয়ন্ত্রণ (রে ভাই)
লেভির নামে অত্যাচার,
চাষীর কেড়ে দস্যু-শাসক পুষতে
চায় রে চোরাবাজার।
(আজ)   হাহাকারে ভরল মুলুক,
বিচার হোক সে দোষী কিনা।

বছরের পর বছর ক্ষোভ জমে জমে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। গঙ্গার ঠিক ওপারে বর্ধমান জেলায় অজস্র ধান, চালের কে-জি পঁচাত্তর পয়সা থেকে একটাকা। খালের মতন নদীটুকু পার হয়েই সেই দর উঠে গেল পৌনে-দুই থেকে সওয়া-দুই টাকা। তা-ও মেলে না। ধান গম রেশনে যা দেয়, কারো তাতে পেট ভরে না। পেট ভরাতে হলে কালোবাজারে যাও। হিন্দুস্থানের মধ্যেই আবার যেন দেশ ভাগাভাগি—আবার এক দফা হিন্দুস্থান-পাকিস্তান। নিশ্বাস ফেলো গঙ্গার এপার থেকে বর্ধমানের দিকে তাকিয়ে, এবং দু-হাতে খালিপেট বাজাও। মানুষের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ঠিক সেই মুখে গুলি। গুলি চালিয়ে পলিশপুঙ্গবদের সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন, কারো আর টিকিটি দেখা যায় না—

সরকারি কর্তারা কথাবার্তায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন: কী রকম বুঝছেন? আগুন দেওয়া-দেওয়ি শুরু না হয়ে যায়।

হবেই। সামাল হোন, কাগজপত্র সরিয়ে ফেলুন।

আয়রনসেফের টাকাকড়ি সরাল, কাগজপত্র যেমন-কে-তেমন পড়ে রইল। ঐ গন্ধমাদন কোথায় নিয়ে তোলে, কে-ই বা তার ঝামেলা পোহায়।

নিজেদের মধ্যেই আবার প্রবোধ নিচ্ছেন: আগুন দেবে না। অত সাহস হতেই পারে না, কি বলেন?

ঘটল তাই সত্যি সত্যি। শহর জুড়ে লঙ্কাকাণ্ড। রেলস্টেশন

পোড়ে, মন্ত্রীমশায়ের বাড়ি পোড়ে। সরকারি অফিসগুলো পুড়ছে। কর্তারা হায়-হায় করছেন: কী সর্বনাশ বল তো? জরুরি কাগজপত্র সমস্ত আগুনের গর্ভে, কত রকম লেনদেনের হিসাব—

বুক চাপড়াচ্ছেন বটে, মুখের হাসি তবু চাপতে পারলেন কই সার? চতুর্দিক দাউ-দাউ করে জ্বলল, সেই আগুনে দিব্যি তো আপনারা হাত-পা সেঁকে নিলেন।

॥ আঠাশ ॥

হিন্দুস্থানের যে হাল হয়েছে, তার কথা অনেক তো হল। পাকিস্তানেও একটু-আধটু উঁকি দিয়ে দেখা যাক, পাকিস্তানের কাগজগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিই।

একুশে ফেব্রুয়ারি আর তো কয়েকটা দিন পরে—

'একুশে ফেব্রুয়ারি,
ভুলি নাই, ভুলবো না, ভুলতে কি পারি ?'

আত্মাহুতি আর ইষ্টসিদ্ধির দিন। একুশে ফেব্রুয়ারির এক চোখে অশ্রু, আর চোখে হাসি। শহিদদের বিয়োগ-বেদনা, বঙ্গভাষার বিজয়োল্লাস।

'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়্যা নিতে চায়।
ওরা কথায় কথায় শিকল পরায়
আমার হাতে পায়।
কইতো যাহা আমার দাদায়
কইতো যাহা আমার বাবায়—
এখন, কও দেখি ভাই মোর মুখে কি
অন্য ভাষা শোভা পায় ?'

[মাঝে টুকরো খবর একটা নিয়ে নিন—কাগজের উদ্ধৃতি :
'স্টেশনের প্রতিটি সাইনবোর্ড দেখলাম। হিন্দীতে নাম লেখা আছে, ইংরেজিতে আছে। বাংলায় লেখা স্টেশনের নাম সকলের নিচে ছিল—আলকাতরা দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে। হাঁ, বাংলাদেশের বুকে—কলকাতা থেকে মাত্র বারো মাইল দূর—টিটাগড়ে।']

বাংলাভাষার উপর হিন্দু-পৌত্তলিকতার প্রভাব—মুসলমানের পক্ষে গুণাহ্, হয় বাংলার পঠন-পাঠনে। বাংলা লেখকের মধ্যে মুসলমান ক'জনই বা—গল্প-উপন্যাসে ক'টা মুসলমান চরিত্র ইত্যাদি,

ইত্যাদি। অতএব বাংলা বর্জন করে উর্দুর পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা চাই পাকিস্তানের পশ্চিম ও পূর্ব অংশে। দেশ যখন একটা—হোক না হাজার মাইলের ব্যবধান পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে—ভাষা একটিমাত্র থাকবে উভয় অঞ্চলে। উর্দু ভাষা। হিন্দু দেবদেবীরা ছদ্মবেশে বাংলা হরফের মধ্যে ঢুকে বসে আছে—ওদের বিসর্জন দিয়ে আরবি হরফ চালু করো। ঢাকা রেডিও-র বাংলা-প্রোগ্রামে অন্তত পক্ষে চল্লিশ পার্সেন্ট উর্দু জবান মিশাল দিয়ে বলো, ইস্কুলের বাংলা বইয়ে দেদার উর্দু কথা ঢোকাও। সরকার দরাজ হাতে টাকা ঢালছে, মৌলবি-মোল্লাদের ছুটোছুটি পড়ে গেছে।

শহীদুল্লা ইত্যাদি বাঘা বাঘা পণ্ডিতের ঘোরতর প্রতিবাদ—কে বা শোনে কার কথা! ১৯৪৮, ফেব্রুয়ারিতে করাচির গণ-পরিষদে ধীরেন দত্ত বললেন, উর্দুর মতন বাংলারও ব্যবহার চাই রাষ্ট্রিক কাজকর্মে। লিয়াকত আলি সঙ্গে সঙ্গে নস্যাৎ করে দেন: কখনো না। মুসলিম-রাষ্ট্র পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা উর্দু।

চোখ-টেপাটেপি করে অনেকে: বাঙালি হিন্দু কিনা—হিন্দুস্থানের দালাল। আর ঢাকায় পা দিতেই সেই ধীরেন দত্ত'র কী উত্তাল অভিনন্দন বাংলাভাষার দাবি তুলে ধরেছেন বলে।

কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ্‌ পরের মাসে নিজেই ঢাকায় চলে এলেন। কার্জন-হলে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন: আমি পাকিস্তানের স্রষ্টা। রাজ্যের ভালমন্দ আমি বুঝব। 'Urdu and only Urdu shall be the State language of Pakistan' উর্দু—একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা, অন্য-কোন ভাষা নয়। যারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে, চিনে রাখো তাদের। পাকিস্তানের দুশমন!

না—

বক্তৃতা থামিয়ে কঠিন-দৃষ্টিতে জিন্নাহ্‌ তাকিয়ে পড়লেন।

চতুর্দিকে রোল উঠেছে : না, না, না—। বাংলার ছাত্রছাত্রী বড় কঠিন ধাতুতে গড়া। এমন যে কায়েদ-ই-আজম, তাঁরও মুখোমুখি স্পষ্টকথা বলতে ডরায় না। সরকারি ইজ্জত আর ছাত্রদের সঙ্কল্প—দেখা হাক, কাদের জোর কতখানি—কারা হারে কারা জেতে! 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা-কমিটি' গড়লেন ছাত্রেরা। ভূত একেবারে সর্ষের ভিতরেই ঢুকে পড়েছে। ক্যাবিনেট-মন্ত্রী হবিবুল্লাহ্ বাহার কবি ও সাহিত্যিক মানুষ, 'বুলবুল' কাগজের সম্পাদক। জিন্নাহ্‌র অত বড় অসম্মানের পরেই তিনি জাঁকিয়ে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব করলেন। বেগতিক বুঝে মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন কথা দিলেন, উর্দুর সঙ্গে বাংলার দাবিও তিনি সমর্থন করবেন।

টালবাহানায় চার-চারটে বছর গেল। ১৯৫২। জিন্নাহ্‌র এন্তেকাল হয়েছে। লিয়াকত আলিও মাটি নিয়েছেন। নাজি-মুদ্দিন গবর্নর-জেনারেল। ঢোক গিললেন ভদ্রলোক : কী করব, কমিটি ঠিক করে ফেলেছে উর্দুই রাষ্ট্রভাষা। বাংলা-টাংলা নয়, একলা উর্দু।

বটে রে! 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়্যা নিতে চায়—'। কথার খেলাপ—প্রতারণা। জ্বলছে পূব-বাংলা অপমানে—ভাষার লাঞ্ছনায়। দেশ-জোড়া ছাত্র-হরতাল। সারা পূব-বাংলার ধর্মঘট ঘোষণা—২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। ৪ ফেব্রুয়ারির ছাত্র-ধর্মঘটে পরখ হয়ে গেল : ঠিক আছি তো সকলে? হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করে ঢাকা টহল দিল : হাঁ, ঠিক—

তারপরে ছক-বাঁধা কার্যকলাপ—নতুন করে পরিচয় দিতে হয় না। এ বাবদে এপারের গান্ধিবাদী অহিংস সরকার আর ওপারের লীগপন্থী সহিংস সরকারে কণামাত্র ফারাক নেই। একশ-চুয়াল্লিশ ধারা—পাঁচজনের বেশি একত্র চলাচল বেআইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় পুলিশ আর পাঞ্জাবি-বেলুচি ফৌজ কাঁধে

কাঁধ দিয়ে মোতায়েন আছে। দৃশ্যটা এপারের ভারতখণ্ডে একেবারে আজব ঠেকছে নাকি? বলুন।

সূর্য ঠিক মাথার উপরে। টং-টং করে ঘড়িতে বারোটা বাজে—আর সেই সঙ্গে দশজন করে এক-একটা দল আইন ভাঙতে আগুয়ান। ধরো, কয়েদির গাড়িতে ঢুকিয়ে দাও। গ্রেপ্তার করে করে পুলিশ নাজেহাল। একটি তরুণও আর জেলের বাইরে থাকবে না, বুঝি পণ করেছে। গাড়ি বোঝাই করে করে কত আর চালান দেবে! অতএব লাঠি আর কাঁদানে-গ্যাস। দৃশ্যটা নতুন ঠেকছে নাকি? বলুন।

বেলা দুটোয় বান ডাকল ঢাকা শহরে। বান এসে আছড়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে। মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, সলিমুল্লা হল, ফজলুল হক হল—সর্বদিক হতে ছাত্র আসছে বানের জলের মতো। আকাশ চৌচির করে সকল মুখের একটিমাত্র দাবি: বাংলা চাই—

বন্যা রুখবে, কার এত ক্ষমতা! নিশ্চিহ্ন পুলিশের কর্ডন। পরবর্তী ঘটনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। রাইফেল রয়েছে, হত্যা করো। নিরস্ত্র উনিশটি কিশোর-হত্যা—জব্বর, বরকত, সালাম, রফিক, সফি এবং আরো সব। অপরাধ সাংঘাতিক বটে! মাতৃভাষা মুখ থেকে কেড়ো না, এই চেয়েছিল তারা।

অ্যাসেম্বলি চলছে তখন, বাজেট অধিবেশন। মনোরঞ্জন ধর বললেন, আমাদের ছেলেদের খুন করেছে, অধিবেশনের এইখানে ইতি। মওলানা আবদুল রশিদ তর্কবাগীশও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আরও অনেকে। সবাই য়ুানিভার্সিটির দিকে ছুটলেন। জনতা উত্তাল। ঢাকার ইমাম ভাষা-শহিদদের উদ্দেশে 'গায়েবি জানাজা' পাঠ করলেন। তারপরে প্রার্থনা: খোদা তালা, আমাদের প্রাণের সন্তানদের যারা হত্যা করেছে, তাদের তুমি ক্ষমা কোরো না।

নয় বছর তিন মাস পরে—তিন মাস পুরো নয়, দুটো দিন কম, ১৯ মে ১৯৬১—এপারে শিলচরেও অবিকল এমনিধারা নরমৃগয়া। একই অপরাধ—'বাংলা চাই' বলছিল। মাতৃভাষা মুখ থেকে ছিনিয়ে নিও না প্রভুগণ। এগারোটি হত্যা রাইফেলের মুখে—একটি তার মধ্যে মেয়ে, কমলা ভট্টাচার্য। কিন্তু ভারতের ঈশ্বর অতিশয় ক্ষমাশীল, এবং ভারত-সরকারও বটে। খুনেদের গায়ে আঁচড়টি পড়ে নি। ১৯ মে প্রতি বছর আসে এবং নিঃশব্দে চলে যায়। গোণাগণতি কয়েকটা চাপা-নিশ্বাস পড়ে হয়তো। এগারোটি নামও কেউ মনে করে রাখে নি।

যাকগে, আগের কথায় আসি। নামাজের পর লাখ মানুষের মৌন-মিছিল। মিছিল হাইকোর্টের কাছাকাছি গেছে—গুলি! গুলি, গুলি—মাথা ফাটল, হাত-পা ভাঙল কতজনার। মারাও গেল কত। সদরঘাটে পুনশ্চ লাঠিচার্জ। মিছিল ভাঙে না।

পরের দিন সকালবেলা মানুষ তাজ্জব হয়ে দেখে, মেডিকেল কলেজ হস্টেল-গেটের পাশে ছেলেরা রাতারাতি শহিদ-মিনার তুলে ফেলেছে। সেই রাত্রে ঢাকা শহরে যেখানে যত ফুল ফুটেছিল, সমস্ত বুঝি কুড়িয়ে এনে মিনার সাজিয়েছে। উদ্বোধন করলেন শহিদ সফিউরের বাপ। তাঁর চেয়ে মানী মানুষ শহরে আজ কে আছেন ?

বাঙালি মাত্রেই এক—মুসলমান-হিন্দু নেই, নারী-পুরুষ নেই, বয়সের বাছবিচার নেই, দলে দলে মিনারের সামনে প্রতিজ্ঞা নিতে আসছে। ভয় পেয়ে গেল সরকার, পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে : মিনার চুরমার করে দাও। সেটা বড় সহজ নয়—ছাত্রে-পুলিশে লড়াই। তিন দিন ধরে চলল। তিন দিন খাড়া ছিল সেই ইটের মিনার।

'স্বৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ?
ভয় কি বন্ধু
আমরা এখনো চার কোটি পরিবার।'

আর এক কবি লিখেছেন :

'তারা পঞ্চাশ জন আজ নেই—
আর আমরা সেই অমর শহিদদের জন্তে
তাদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্তে
এক-চাপ পাথরের মতো—
এক হয়ে গেছি,
হিমালয়ের মতো অভেদ্য বিশাল হয়ে গেছি।'

একুশে ফেব্রুয়ারি এসে পড়ল। পূব-বাংলায় মস্তবড় পরব। যাত্রাওয়ালা প্রমথ বিশ্বাস চলেছে তাই সেখানে। যত বায়নাই থাকুক, যাবেই সে এই সময়টা। তিনটে-চারটে দিনের জন্ত হলেও যাবে। প্রণব ও রঞ্জন দত্ত এসে বসেছে ইতিমধ্যে। রঞ্জন দত্ত পরিচয় দিয়ে দিল প্রণবের—বাপ-পিতামহ'র ভিটে বিনিময় করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে প্রণবরা।

প্রমথ খিল-খিল করে হাসে : খাসা করেছেন—সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়েছেন, কথনো আর যেতে না হয়। জন্তু-জানোয়ার থাকে সব সেখানে—কাছে পেলেই টপ করে মুখে পুরে ফেলবে। খবরদার, খবরদার—ও-মুখো ভুলেও যাবেন না।

পাকিস্তানের কাগজ একগাদা সে বের করে আনল। শ্রীধর মল্লিকের বাড়িতে কোথায় কি আছে, প্রমথর জানা। বলে, পড়ে পড়ে দেখুন তো, মানুষের বদলে বাঘ না ভালুক না কুমির—কী সব ঘরবসত করে সেখানে। চেঁচিয়ে পড়ুন, সবাই যাতে শুনতে পান।

॥ মাইকেল জন্মোৎসব ॥

গত ২৭ জানুয়ারি যশোর বি. সরকার-মেমোরিয়াল হলে সন্ধ্যা সাতটায় যশোর তথা বাংলার গৌরব মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সাহিত্যালোচনা ও গীতি-বিচিত্রার মাধ্যমে মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হয়। স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন মিস সলিমা শহিদ ও মীর আবুল হোসেন। কবির বিভিন্ন রচনা হইতে আবৃত্তি করেন মুনীর আকতার। কবি অবলাকান্ত মজুমদার রচিত মধুগীতির গানের উপর ভিত্তি করিয়া শেখ হাসানউদ্দিন একটি গীতিনক্সা গ্রন্থন করেন। উহাতে অংশ গ্রহণ করেন—এম. জি. হায়দার, শাহ মোহাম্মদ খোরসেদ ও গৌরগোপাল হালদার।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, গত ২৬ জানুয়ারি বেলা দুই ঘটিকায় যশোর শহর হইতে আঠাশ মাইল দূরে কপোতাক্ষ নদীতীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের গৃহ-প্রাঙ্গণে কবির জন্মদিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়……

প্রমথ বিশ্বাস বলে, আরো শুনুন। এ বছর বলে নয়, উৎসব বছর বছর হয়ে থাকে। পাকিস্তান হাসিল হওয়া ইস্তক। হাটে হাটে চাঁদা তোলে, যার যেমন সাধ্য দিয়ে দেয়—এক-আনা থেকে এক-টাকা। লেখক মানুষ, বিশেষ করে বাংলা বই যাঁরা লেখেন—পীর-পয়গম্বরের শামিল তাঁরা সকলের কাছে। সাগরদাঁড়ি যাওয়ার বড় কষ্ট ছিল আগে। বিশেষ করে শেষ ছয় মাইল। পথ-ঘাট ছিল না—এর ঘর-কানাচ দিয়ে ওর ভুঁইয়ের আ'ল দিয়ে জল-জাঙ্গাল ভেঙে উঠতে হত। এখন সোজা সড়ক বানিয়ে দিয়েছে—মাইকেল রোড। চোখ বুজে চলে যান, দত্তবাড়ির বাইরের-উঠোনে গিয়ে উঠবেন।

যায়ও তাই লোকে। বিশেষ করে কবির জন্মদিনে জমায়েত বসে, সেই দিন। মেলা দস্তুরমতো। এক দিনের পথও মানুষজন পায়ে হেঁটে হেঁটে আসে। গরুর-গাড়িতে আসে মেয়ে-

লোক ও ছেলেপুলেরা। গাছতলায় রাঁধাবাড়া করে খায়। দত্তবাড়ির আশেপাশে অস্থায়ী দোকানপাট বসে। হিন্দু হোক মুসলমান হোক, গ্রামের যে বাড়িতে যাবেন আদর-যত্ন ও সাধ্যমতো অতিথিসেবা করবে। এত কষ্ট করে আসে—বেশির ভাগই কিন্তু নিরক্ষর। মাইকেলের কবিতা পড়া দূরস্থান—অ-আ ক-খ'ই পড়তে পারে না। তবু আসে তারা কবির মচ্ছবে—আমাদেরই তল্লাটের কবি মাইকেল বলে দেমাকে মটমট করে।

সংবাদের পর সংবাদ পড়ে যাচ্ছে প্রণব :

॥ সিরাজগঞ্জে সরস্বতী-পূজার প্রস্তুতি ॥

আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে সিরাজগঞ্জে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠানের জন্য স্থানীয় হিন্দু ছাত্রগণ বর্তমানে তোড়জোড় করিতেছেন। শহরের প্রায় সব কয়টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই প্রতিমা উঠিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরপ্রতিমাগুলির তুলনায় নিজেদের প্রতিমাটি সুন্দরতর করিয়া তুলিবার জন্য হিন্দু ছাত্রগণের মধ্যে এক প্রকার প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে।......

॥ ঈদের বাণী ॥

মাহে রমজান বিদায় লইয়াছে এবং ঈদের আনন্দ সম্মুখে লইয়া মুসলিম জাহান প্রহর গণিতেছে। রোজার ফজিলত ও ঈদের অনুষ্ঠানের গূঢ় ইঙ্গিত সারা অন্তর দিয়া মুসলমানকে উপলব্ধি করিতে হইবে। মাহে রমজান ছিল সিয়ামের মাস, সংযমের মাস, সাধনা ও এবাদতের মাস। একটি মাস ভরিয়া উদয়াস্ত আমরা পানাহার বর্জন করিয়া চালয়াছি। সারাদিন লোভ, মোহ, লালসা, ভোগ, অসংযমকে কঠোর শক্তি ও দৃঢ়তায় দমন করিয়াছি, এবং পরাজিত করিয়া চলিয়াছি। হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধ নীচতা হীনতা প্রভৃতি সকল পাপাচারকে সাধনার প্রজ্জ্বলন্ত আগুনে দাহন করিয়াছি।

নীলকণ্ঠ বর্মা বই থেকে মুখ তুলে বললেন, একুশে ফেব্রুয়ারি

এসে যাচ্ছে—তার কথা পড়ুন কিছু। সে তো আমাদেরও দিন—বাংলা কথা বলি যারা, বাংলা বই পড়ি।

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে আবার বলেন, আরও একদিন আছে—উনিশে মে। ক'জনই বা মনে রেখেছে!

॥ চিরস্মরণীয় একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

ভুলতে পারিনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে। একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলার মানুষের কাছে এক রক্তাক্ত শপথ আর সুদৃঢ় ঘোষণা: বাংলাভাষার মৃত্যু নেই। যে ভাষাকে ভালবেসে জীবন দিয়েছে বরকত-সালামেরা সে ভাষা আমাদের জীবনের চেয়েও প্রিয়—

পাঠে সহসা বাধা পড়ল। বাধা দিলেন স্থিতধী প্রবীণ পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বর্মা। প্রণবের কণ্ঠের অনুকৃতি করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, যে ভাষাকে ভালবেসে কমলা-সুকমল-সুনীলেরা জীবন দিয়েছে, সে ভাষা আমাদের জীবনের চেয়ে প্রিয়। বাংলাভাষার মৃত্যু নেই।

যত জন ছিল মল্লিকের বৈঠকখানায়, সমস্বরে অচঞ্চল দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, বাংলাভাষার মৃত্যু নেই।

মুখের উচ্ছ্বাস মাত্র। উচ্ছ্বাসের কতটুকু মূল্য! আপনার আমার ট্যাক্সের লাখ লাখ টাকা নিয়ে বাংলা এবং অপরাপর রাজ্য-ভাষার অপমৃত্যুর জন্য যারা চক্রান্ত-জাল বিস্তার করছে, তাদের কি আসে যায় হাজার কয়েক মানুষ গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, কি শ-কয়েক প্রাণ বিসর্জন দিল ভাষার নাম নিয়ে? ভারত-ভাগ্যবিধাতা মহাপুরুষেরা নিরাপদ ব্যবধানে পরম নিশ্চিন্তে আছে।

প্রণব চুপ করে গিয়েছিল। ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে আবার শুরু করল:

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির বিজয়ের দিন। সূর্য ওঠার আগেই রমনার

পথ প্রভাতফেরীর গানে গানে মুখরিত হয়ে উঠবে। ভোর হতে না-হতে দলে দলে সবাই আসবে শহিদ-স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে। বাংলাভাষাকে ভালবাসায়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকে বরণের প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা এগিয়ে যাবে আজিমপুর-গোরস্থানের দিকে। সেখানে তারা ফুলে ফুলে ঢেকে দেবে ভাষাশহিদের কবর। কামনা করবে তাদের আত্মার অফুরন্ত শান্তি। তারপর আবার সমবেত হবে শহিদ-মিনারের পাদমূলে। ভাষাসংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য ফুলের পাপড়ি দিয়ে সাজাবে সেই মিনার। বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব এটাই। সভা হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রয়োগে গড়িমসি নীতির নিন্দা করে দাবি জানানো হবে বাংলাভাষার পরিপূর্ণ মর্যাদা-দানের······

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের জন্য প্রদেশব্যাপী সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কালো-পতাকা উত্তোলন, কবর জিয়ারত, নগ্নপায়ে মিছিল, জনসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা-সভার মাধ্যমে প্রদেশের ছাত্র-জনতা শ্রদ্ধা-নিবেদন করবেন একুশে ফেব্রুয়ারির পবিত্র স্মৃতির প্রতি। এই উপলক্ষে ঢাকার কর্মসূচী: ভোর পাঁচটায় সরকারি-বেসরকারি ভবনে ও ইস্কুল-কলেজে কালো-পতাকা উত্তোলন। ভোর ছ'টায় আজিমপুর-গোরস্থানে জিয়ারত ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন। সাতটায় গোরস্থান থেকে খালি-পায়ে মিছিল। ন'টায় কেন্দ্রীয় শহিদ-মিনারে জনসভা। দুপুর দু'টায় কার্জন-হলে আলোচনা-সভা। সন্ধ্যা সাতটায় কেন্দ্রীয় শহিদ-মিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও সকাল দশটায় ললিতকলা একাডেমিতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হবে। অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ, জনাব আহম্মদ শরিফ এবং জনাব সালাউদ্দিন মোহাম্মদ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন। তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের আসর বসবে।

রঞ্জন দত্ত ওরফে রমজান আলি 'পূর্বদেশ'-এর সংখ্যা টেনে নিয়ে নিল। সে বলে, ঢাকার বৃত্তান্ত শুনলেন—পুব-বাংলার যা হল মাথা-শহর। মফস্বলের খবরাখবর নিন—রংপুরের মতন জায়গাতেও কী হচ্ছে শুনুন:

॥ রংপুরে 'বাংলা চালু কর' অভিযান শুরু ॥

১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথ ছাত্র-জনতার বুকের রক্তে রাঙা হয়েছিল, সেই একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে রংপুরে ছাত্রসমাজের উদ্যোগে 'বাংলা চালু কর' অভিযান শুরু হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পূর্ণ বাস্তব মর্যাদা লাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত নিম্নোক্ত কর্মসূচী পালন করে বাংলাভাষার পূর্ণ মর্যাদা দান করার জন্য পাকিস্তান ছাত্রশক্তির পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়—(১) সদাসর্বদা বাংলায় কথা বলা ; (২) সাইনবোর্ড ক্যাশমেমো হিসাবপত্র নামফলক ইত্যাদি বাংলায় লিখা ; (৩) মোটর সাইকেলের নম্বর বাংলায় লিখা ; (৪) পত্র নিমন্ত্রণপত্র ঠিকানা ইত্যাদি বাংলায় লিখা।

॥ উনত্রিশ ॥

রাষ্ট্রভাষা বাংলা—শুনে নিলেন কানে? মন ভরে গেল—আহা, মাতৃভাষার রাজসম্মান এই তো কয়েক বিঘা মাত্র ভূঁইক্ষেত পার হয়ে গিয়ে। এখানে থরথর কাঁপছে বাংলাভাষা—হিন্দীর রথচক্রের তলায় গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কখন। ঐশ্বর্য অপরিমেয়—কেবা তার হিসাব নিতে যায়! গণতন্ত্রে মুড়ি-মিছরির এক দর, শুধুমাত্র ভোটের বিচার। অতএব হিন্দী বিজয়ী, চেয়ারম্যানের কাস্টিং-ভোট তার দিকে। কাস্টিং-ভোটেই যখন চূড়ান্ত মীমাংসা, চেয়ারম্যান তেমন-তেমন ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থার দিকেই ভোট দিয়ে থাকেন। অলিখিত-বিধি হল তাই। ভারতে বিপরীত। দেশমান্য রাজেন্দ্রপ্রসাদের শক্তির তারিফ করি—সুভাষচন্দ্র-বিতাড়নের সময় তিনিই অগ্রবর্তী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কলকাতা পৌরসভার ঘোর কলঙ্ক—রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামে আজও একটা রাস্তা হল না।

নীলকণ্ঠ বর্মা উঠে দাঁড়ালেন। গাছপালার ফাঁকে খানিকটা ফাঁকা মাঠ, এবং মাঠের ওপারে আবার গাঁ-গ্রাম দেখা যায়। আঠারো বছর আগে এ-গাঁয়ের মানুষ হাট করতে যেত ও-গাঁয়ে, ও-গাঁয়ের ছেলেপুলে মাঠ ভেঙে নিত্যিদিন এ-গাঁয়ের ইস্কুলে আসত। কী করে দিল কলমের একটি খোঁচায়! যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, বাংলাভাষা এখানে মুমূর্ষু রোগির মতন—কখন আছে কখন নেই। বিশাল রাষ্ট্রের সর্বশক্তি ও বিপুল অর্থ দিয়ে হিন্দীর জন্য আহিমাচল-কুমারিকা হাইওয়ে বানাচ্ছে, মাটির নিচে বাংলা ও অন্যদের চাপা দেবার ব্যবস্থা। আর ওপারে কয়েক-শ গজ মাত্র দূরে বাংলার বিজয়-পতাকা পত পত করে উড়ছে।

রঞ্জন দত্ত আবার এক বৃত্তান্ত পড়ল : করাচী থেকে এ-পি-পি পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, করাচী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, নবম ও দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ভাষাতেও প্রশ্নপত্রের জবাব দানের সুযোগ দেওয়া হবে।

নীলকণ্ঠ বললেন, ভাষাকে পূব-বাংলা পাগল হয়ে ভালবাসে। জান দিয়েছে তাদের ছেলেরা—লোকের বুকের মধ্যে সে আগুন অনির্বাণ। বাংলা-একাডেমি গড়েছে ঢাকায়—আত্মনিবেদিত অগুন্তি জ্ঞানীগুণী ভাষার সেবার কাজ করে যাচ্ছেন। একটা মহাকীর্তির কথা বলি। ডক্টর শহীহুল্লাহ্-র নেতৃত্বে একাডেমি পূব-বাংলার আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলনে হাত দিয়েছেন। অধ্যাপক-ছাত্র ভাষ্যপ্রেমী সামান্যসাধারণ মানুষও গাঁয়ে গাঁয়ে শব্দ-সংগ্রহের কাজে মেতে আছেন। প্রথম দুই খণ্ড বেরিয়ে গেছে। পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে নিষ্ঠা আর ভালবাসা ছড়ানো। শেষ হয়ে গেলে এপার-ওপারের সকল বাঙালি মাথায় তুলে নেবে এ বই। যদি অবশ্য এপারের বাঙালির মুখে বাংলাভাষা টিকে থাকে ততদিন।

নিশ্বাস ফেললেন নীলকণ্ঠ বর্মা। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলেন, আয়োজন দেখে সে দুর্দৈব অসম্ভব মনে করিনে। ধরো সত্যি সত্যি তাই ঘটল। হিন্দীর দাপটে হিন্দুস্থানের উপর বাংলাভাষা আয়ার্ল্যাণ্ডের গেলিক ভাষার মতন পুরোপুরি বাতিল। তেমন দিনে কোন বাঙালির বাংলা বলার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠল—উপায় তখন পাকিস্তান। এই আজকে যেমন ব্লাকে চলেছি—সেই মানুষ শুধুমাত্র বাংলা বলার লোভে পার হয়ে চলে যাবে, একটা-দুটো দিন মনের সুখে বাংলা কথা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরবে আবার।

প্রমথ বিশ্বাস উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে, খাঁটি কথা বলেছেন স্যার। পূর্ব-বাংলা তাজ্জব দেখাল বটে। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—যেখানে

যত কাজেই থাকি, এই সময়টা ওদের মচ্ছবে একবার না গিয়ে পারিনে। বাঁধনদায় কতজনকে খোশামোদ করেছি, ভাষার লড়াই নিয়ে একটা পালা বেঁধে দাও। সেই পালা নিয়ে আসরে নামব। সবাই উড়িয়ে দেয়ঃ ঐটুকু জিনিস নিয়ে কী আবার পালা হবে! নাকি সামান্য জিনিস—শোনেন তো কথা!

রঞ্জন দত্ত প্রণবকে দেখিয়ে বলে, এঁকে ধরো বিশ্বাসমশায়। এঁর বাবার রচনাশক্তি খুব। খাতা থেকে প্রণববাবু কিছু কিছু আমায় শুনিয়েছেন। এসব জিনিসে কর্তার বিষম হাত খুলবে। অন্যায় অবিচারের কথা উঠলে আগুন হয়ে ওঠেন তিনি।

প্রণব বলে, সীতাহরণ দুর্যোধন-বধ এইসবই তো যাত্রার পালা। ভাষার লড়াই নিয়েও পালা করতে চান?

হেসে প্রমথ বলে, আসলে জিনিস একই, বুঝে দেখুন। অশোকবনে আটকে ফেলে চেড়ি লাগিয়ে সীতাকে নাস্তানাবুদ করছিল। রামে-রাবণে লড়াই—রাম লড়াই জিতলেন, রাবণের দশমুণ্ড কাটা গেল। রাজধানী অযোধ্যায় গিয়ে সীতা রাজরাজ্যেশ্বরী হয়ে সিংহাসন আলো করে বসলেন। সীতার জায়গায় ধরে নিন মাতৃভাষা। পালা দাঁড়িয়ে গেল কিনা বলুন।

নীলকান্ত জুড়ে দেনঃ পুরাণ-ইতিহাস বাদ দিয়ে যাত্রাগানে নতুন কালের কথা—এ জিনিস বাংলাদেশে অনেক পুরনো। মুকুন্দ দাস গোড়ায় শুরু করলেন, দেখাদেখি এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে স্বদেশি যাত্রাদল। সে একদিন গিয়েছে। তানসেন, শুনতে পাই, দুপুরবেলা দীপক রাগিণী গাইলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেত। যাত্রার আসরে তেমনি আমি শ্রোতাদের বুকের মধ্যে আগুন ধরে যেতে দেখেছি।

আবার বললেন, স্বাধীনতা মুফতে আসে নি। অনেক মানুষের অনেক সাধনা এর পিছনে। হঠকারীরা তাই বানচাল করে দিচ্ছে। ছাড়ব আমরা?

প্রমথ বলল, তেমনি আগুন ভাষার পালাতেও ধরিয়ে দেবে ঠিক-ঠিক যদি লিখে দেন কেউ। চোখের উপরেই এ লড়াইয়ের শুরু, জিতও একেবারে হাতে হাতে। আমাদের যাত্রার লড়াইয়ে যেমনধারা হার-জিত। খ্যাচ করে খাপ থেকে তলোয়ার খুললাম। ডুমাডুম বাঁয়াতবলা বাজতে লাগল। পাঁয়তারা কষছি আসরের এমুড়ো-ওমুড়ো, লম্ফ দিচ্ছি, বীররসের অ্যাক্টো করছি। তলোয়ার গেঁথে দিলাম অরাতির পেটে—বিজয়বাদ্য বেজে উঠল। হুবহু সেই জিনিস সার। ঝড়ে কলাগাছ সুপারিগাছ পড়ে, গুলি খেয়ে ছোঁড়ারা অমনি পটাপট ভুঁয়ে পড়তে লাগল। তার পরেই দেখি লড়াই ফতে। বেলুচি-পাঞ্জাবিরাই বাংলার ছেলে মারতে আগুয়ান হয়েছিল। কোন পুরুষে কেউ বাংলা জানে না। সেই তারাই দেখি আজকে লাইন দিয়ে বুড়োবয়সে অ-আ-ক-খ'র পাঠ নিতে বসে গেছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলাটা শিখে না নিলে সরকারি চাকরি বজায় থাকবে না। যা বললাম সার—এত কম সময়ে এমনধারা ষোলআনা জিত যাত্রাদলেই হয়ে থাকে। বাঁধনদারে অথচ হেলা করেন, একুশে ফেব্রুয়ারির একটামাত্র ঘটনা—আসরের পুরো পালা তাতে কেমন করে হবে?

আরও এক তারিখ আছে—উনিশে মে। দুটো তারিখ জুড়ে নিয়ে পালা বানাতে বলো—

নীলকণ্ঠ গম্ভীরকণ্ঠে বলতে লাগলেন, সেই পালা পাগল করবে পাকিস্তান হিন্দুস্থান উভয় দেশের মানুষকে। হয়েও এসেছিল তাই। তারপরে দেখি, উনিশে মে চাপা পড়ে গেল—কলে-কৌশলে চাপা দিয়ে দিল। সংহতিতে নয়তো চিড় ধরবে নাকি। কুশিয়ারা নদী—তার এপারে হিন্দুস্থানের করিমগঞ্জ, ওপারে পাকিস্তানের জকিগঞ্জ। শিলচরে উনিশে মে এগারোজন হত্যা করল বাংলাভাষার দাবি জানিয়েছিল বলে। করিমগঞ্জে শোক-সভা—জকিগঞ্জের পারেও মানুষ ভেঙে এসেছে বাংলাভাষার কথা

শুনবে বলে। এপারে হিন্দুস্থান বলে, 'মাতৃভাষা—' ওপারে পাকিস্তান বলে, 'জিন্দাবাদ!' রণহুঙ্কার নয়, খবরের-কাগজ রেডিও'র কুৎসা নয়—বিশ বছর আগে যখন পৃথক হয়ে যাই নি, তখনকার মতোই মিলিতকণ্ঠ শুনতে পেলাম মাতৃভাষার নামে। এপারো শহিদের চিতাভস্ম ভেলায় তুলে শিলচরের মানুষ সাগরে পাঠাল। সেই ভেলা ভেসে ভেসে যাচ্ছে। যখন এপারে হিন্দুস্থানের কূলে এসে লাগে এরা মাঝগাঙের স্রোতে ঠেলে দেয়, ওপারে পাকিস্তানের কূলে যখন লাগে তারাও দেয়। এপার-ওপারের অগণ্য মানুষের ভালবাসা আর চোখের জল নিয়ে মুহুর্মুহু ভাষার জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে ভস্মকুণ্ডেরা দরিয়ায় চলে গেলেন। জাদুকরী বাংলাভাষা।

বাংলাভাষা জিন্দাবাদ!

জান দেবো, জবান দেবো না।

ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা জুড়ে হিংসার আগুন: বঙাল খেদাও—আসাম অসমীয়াদের জন্য। বাঙালির ঘরবাড়ি দোকানপাট দাউ-দাউ করে জ্বলছে। প্রাণও যাচ্ছে বাঙালির। গৌহাটির ডেপুটি-কমিশনার অবধি বাঙালি হওয়ার অপরাধে আক্রান্ত হলেন। প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে বাঙালি। পূর্ব-বাংলা থেকে পালাতে হয়েছিল এক সময়, এবারে ভারতবাসী হয়েও ভারতের একটি রাজ্য থেকে।

রাজ্যভাষা বিল পাশ হল: আসামের একমাত্র সরকারি-ভাষা অসমীয়া। কিন্তু বাংলাভাষা ছাড়বে কেন দাবি? সভা-সমিতি, আন্দোলন। বাংলাকেও অন্যতম রাজ্যভাষা মেনে নিতে হবে। করিমগঞ্জ-সম্মেলন তারিখ চিহ্নিত করে দিলেন—৩১ চৈত্র, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের মধ্যে।

মেয়াদ পার হয়ে গেল। ১ বৈশাখ নববর্ষে কাছাড় শপথ নিল: জান দেবো, জবান দেবো না। সংগ্রাম অহিংস-সত্যাগ্রহের

পথে। বুকের রক্তে নাম লিখে দিচ্ছেন সত্যাগ্রহীরা। হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে নাম লেখানোর জন্য।

॥ সংগ্রাম-পরিষদের ইস্তাহার ॥

দিল্লি-আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য আমরা সংগ্রামী জনসাধারণ হতাশ হই নাই। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমরা জানাইয়া দিতে চাই, সম্পূর্ণ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম বন্ধ করিব না। মাতৃভাষা জিন্দাবাদ!

তারিখ ঘোষণা হল—১৯ মে, শুক্রবার। হরতাল, পিকেটিং ঐদিন থেকে। উত্তাল কাছাড়ভূমি। পুরুষ-মেয়ে ছেলে-বুড়ো সকলের ঘুম হরে গেছে—কত আর দেরি সেই উনিশের! সরকারও ছেড়ে কথা কইবে না। সৈন্যে সৈন্যে ছেয়ে ফেলছে। মাদ্রাজ-রেজিমেণ্ট, আসাম-রাইফেলস, সেণ্ট্রাল রিজার্ভ-ফোর্স। ছাউনি পড়ছে এখানে-সেখানে। ছাই-রঙের মিলিটারি গাড়ির অস্থির ছুটোছুটি, তার সঙ্গে অস্ত্রধারী পুলিশ। সবগুলো থানা পুলিশে ভরভরতি। একশ-চুয়াল্লিশ ধারা—পাঁচজনের বেশি একসঙ্গে হতে পারবে না। আর এন্তার ধরপাকড়। সত্যাগ্রহ না লাগতেই জেলখানা দস্তুরমতো জমে গেল।

উনিশে মে। ভোরবেলা কে ভেবেছে, শিলচরের বিশেষ দিন একটি। ইতিহাসের পাতায় নৃশংসতার একটা কলঙ্করেখা। আজকে কলে-কৌশলে চেপেচুপে রাখলেও এইদিনটা ভেবে চিরকালের মানুষের নিশ্বাস পড়বে।

বারো ঘণ্টা হরতাল—ভোর চারটে থেকে বিকাল চারটে।

॥ ইস্তাহার ॥

উনিশে মে কাছাড়বাসীর সামনে এক অগ্নিপরীক্ষার দিন। এইদিন প্রমাণ হবে, আমরা আমাদের মাকে—মাতৃভাষাকে কতটুকু ভালবাসি।

ভাষা দিয়েই জাতির পরিচয়। ভাষা না থাকলে জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই আহ্বান জানাই—ওরে ভাই, এগিয়ে এসো, তোমাদের মাতৃকণ্ঠকে অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্ত কর, উত্তর-পুরুষের ভবিষ্যৎ নির্মল কর।

শিলচর রেলস্টেশনে লোকারণ্য। পয়লা ট্রেন ৫-৪০ মিনিটে। লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন। একটা টিকিটও বিক্রি হয় নি এযাবৎ। সত্যাগ্রহীরা সারবন্দী বসে পড়েছে লাইনের উপর—হাজার হাজার সত্যাগ্রহী। সৈন্যদলও অদূরে মোতায়েন।

খটমট করে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ-সুপার পৌঁছে গেলেন। সত্যাগ্রহীদের এক কর্তাব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা: গ্রেপ্তার করলে কি গোলমাল হবে? বাধা দেবে তোমরা?

কখনো নয়। আমরা সত্যাগ্রহী—অহিংস।

তবু গ্রেপ্তারের ঝামেলায় গেল না তারা। পিটিয়ে তাড়াবে। মানুষজন তাড়িয়ে নিঃশেষ করে ট্রেন ছাড়বে। মারমূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সৈন্যরা। বেদম মার মারছে। ছেলে-মেয়ে শিশু-বৃদ্ধ বাদ নেই।

কিন্তু মার ওদের গায়ে লাগে না। মন্ত্র জানে। আঘাত যত প্রচণ্ড, মন্ত্রের ততই আকাশ-মন্ত্রিত ধ্বনি। মাতৃভাষা জিন্দাবাদ। এ মন্ত্র মুখে থাকতে ঠাঁই থেকে নড়াবে কার সাধ্য?

মেরে মেরে সৈন্যদল ক্লান্ত হয়েছে। হাঁপ ধরে গেছে, খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে নেয়। কিন্তু শেষ নয়। সমুদ্রে এক ঢেউ শেষ হয়ে আবার ঢেউ আছড়ে পড়ে—তেমনি এদের। বিশ্রাম নিয়ে দ্বিগুণ বিক্রমে লাঠিচার্জ। লাইন আঁকড়ে ধরে সত্যাগ্রহীরা ঘাড় নিচু করে আছে। যত খুশি মেরে যাও। সাড় নেই বোধ-হয় কোন অঙ্গে। এতটুকু নড়ে না।

আবার খানিক জিরিয়ে নিয়ে তৃতীয় দফা। কাঁদানে-গ্যাস ফাটাচ্ছে। বার বার তিনবার। দম বন্ধ হয়ে আসছে তবু একটি

সত্যাগ্রহী নড়বে না, যতক্ষণ না অন্য কেউ এসে জায়গা নিয়ে নিচ্ছে।

স্তব্ধ করা গেল না। হাতের অস্ত্রগুলোই বুঝি সৈন্যদের ব্যঙ্গ করছে। ছেলেদের ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবার মেয়েদের ভিতর। লাথি লাঠি আর বুটের গুঁতো। তলপেটে লাথির পর লাথি ঝাড়ছে কয়েকটা মেয়ের। গৌরী বিশ্বাস, সীতা দে, রজনী মালাকার গড়িয়ে পড়ল—ক্ষতবিক্ষত অর্ধমৃত। ঠোঁট নড়ছে তবু, শব্দ বেরুচ্ছে : বাংলাভাষা জিন্দাবাদ!

অস্থায়ী রেডক্রস-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কিন্তু মেয়ে হোক ছেলে হোক, লাইন ছেড়ে কেউ সেদিকে যাবে না। দু-হাতে অবিশ্রান্ত রক্ত মুছছে, আর ফাঁকে ফাঁকে ধ্বনি তুলছে : জান দেবো, জবান দেবো না।

হদ্দমুদ্দ দেখল কর্তারা। জোরজবরদস্তিতে সরবে না, মালুম পেয়েছে। মারধোর বন্ধ করে এবারে সন্ধির প্রস্তাব : গ্রেপ্তার করা হবে এক-একটা দল ধরে। সত্যাগ্রহীরা আগুয়ান হও।

তাই চলল। গ্রেপ্তার করে কিন্তু জেলে নিয়ে যায় না, ট্রাকে তুলে শহর থেকে অনেক দূরে মাঠে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে। খবর পেয়ে সংগ্রাম-পরিষদ বাসের বন্দোবস্ত করল। ট্রাকের পিছু পিছু বাসও ছুটেছে। পুলিশ সত্যাগ্রহীদের ট্রাক থেকে নামিয়ে দিল, বাস সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আবার তাদের জায়গায় পৌঁছে দেয়। কাঁহাতক এই খেলা ভাল লাগে! গ্রেপ্তার বন্ধ করে দিয়ে পুলিশও তখন চুপচাপ।

দুপুর গড়িয়ে যায়। হরতাল নিখুঁত—একটি ট্রেন চলে নি। লাইনের বাস একখানিও না। বেলা দুটো—আর দুই ঘণ্টা কাটিয়ে চারটা বাজিয়ে দিলেই হয়ে গেল। পূর্ণ বিজয়ী।

হঠাৎ চেঁচামেচি, ছুটোছুটি। একদল সত্যাগ্রহী পুলিশ-গাড়ি ভরতি করে নিয়ে যাচ্ছিল—গাড়িতে আগুন। স্টেশনের

সত্যাগ্রহীরাই ছুটল আগুন নেভাতে, কাদা কচুরিপানা বালি চাপা দিয়ে নেভাল সে-আগুন।

পরাজয়ের আক্রোশ পুলিশকে পেয়ে বসেছে—বেধড়ক লাঠি চালাচ্ছে। দু-পাঁচখানা ইট এসে পড়ল, কারা মেরেছে খোদায় মালুম। এক কনস্টেবল চিৎকার করে উঠল, কার যেন রাইফেল পাওয়া যাচ্ছে না।

বহুদর্শীরা বুঝেছেন, পরিপাটি একখানা গোলমাল জমানোর আয়োজন। মাতব্বররা লাউড-স্পিকারে সামাল করছেন: বন্ধুগণ, সামান্য সময় আর বাকি। জিতবই আমরা। মাতৃভাষা জিন্দাবাদ! শান্তি কিছুতেই যেন না ভাঙে।

চতুর্দিকের অগণিত মুখে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল: মাতৃভাষা জিন্দাবাদ! সাগর-গর্জনের মতো আলোড়ন।

তারই মধ্যে সহসা বুম—বুম—বুম—

বন্দুকের গুলি। সতর্ক করে নি জনতাকে। ফাঁকা আওয়াজও নয়। ক্ষিপ্ত পুলিশ গুলি চালাচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে। সত্যাগ্রহীরা লুটিয়ে পড়ছেন। আর্তনাদ, রক্তস্রোত। স্বদেশি পুলিশের গুলি—ঝাঁকে ঝাঁকে। সাত মিনিটে সতেরো রাউণ্ড—পাকা হাত সন্দেহ কি! প্লাটফরম রাঙা, রেললাইন রাঙা। কী আশ্চর্য, মাটি আঁকড়ে তবু সত্যাগ্রহীরা। চোখে আগুন, মুখে অগ্নি-শপথ: জান দেবো, জবান দেবো না।

নয় জনকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন হাসপাতালের হাউস-সার্জেন। কমলা ভট্টাচার্য, হিতেশ বিশ্বাস, কুমুদ দাস, তরণী দেবনাথ, চণ্ডী সূত্রধর, সুকমল পুরকায়স্থ, কানাই নিয়োগী, শচীন পাল, সুনীল সরকার। দু-দিন পরে আরও দুটি যোগ হল নয়ের সঙ্গে। সত্যেন্দ্র দেবের দেহ রেল-পুকুরের জলে ভেসে উঠল, আর হাসপাতালে বীরেন্দ্র সূত্রধর চোখ বুজলেন। এগারো হল, এগারোটি ভাষা-শহিদ।

প্রমথ বিশ্বাস হঠাৎ গায়ের জামা তুলে দেখায়ঃ দেখুন দেখুন, সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। বীরের মৃত্যুকালে স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি—পৌরাণিক পালার মধ্যে গেয়ে থাকি আমরাই। দেবতা-গন্ধর্ব যক্ষ-রক্ষ অন্তরীক্ষে এসে নিরীক্ষণ করেন। সেদিনও নিশ্চয় তাই হয়েছিল—শিলচরের মরণ দেখতে দেবতারা অলক্ষ্যে এসেছিলেন।

নীলকণ্ঠ টিপ্পনী কাটলেনঃ অ্যাটমবোমা ফাটানোর যা পাল্লাপাল্লি, ধকল কাটিয়ে যদি অবশ্য দেবতারা টিকে থাকেন!

খানিকটা যাত্রার সুরে প্রমথ আবার বলল, বরকত-সালাম-জব্বরের আত্মারাও এসেছিলেন, এপারের এগারো শহিদকে পাশে টেনে নেবার জন্য।

রঞ্জন বললে, মরার পরে ভারি সুবিধা, বর্ডার পারাপারে আমাদের মতন দালাল ডাকতে হয় না। হিন্দু-মুসলমানেও ভেদা-থাকে না আর তখন।

প্রণব বলে, জ্যান্ত থাকতেই বা সত্যিকারের ভেদাভেদ কোথা? আপনার কাছেই তো খবর শুনি। আইন করে দেশের মাটি খণ্ডবিখণ্ড করল—মাটিটুকুই পেরেছে, মানুষেরবেলা পরাস্ত। ভাষার ঘাড়ে কোপ পাড়তে গিয়েছিল—কোপ ফিরে এলো হাতের অস্ত্র ভোঁতা হয়ে। বর্ডারের ওপারে পারে নি, এ-পারেও হতে দেবো না আমরা। বঙ্গদেশ দু-টুকরো—বঙ্গভাষা আজও এপার-ওপার এক করে বেঁধে রেখেছে।

রঞ্জন জুড়ে দিলঃ শুধু ভাষা! দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে সমাজ-সামাজিকতা চালচলন খাওয়াদাওয়া আরও যেন বেশি একাকার। সাদা-চোখে আর তফাৎ বুঝবেন না হিন্দু-মুসলমানে, অণুবীক্ষণে দেখতে হবে। মোল্লাদের মুখে চিরকাল শুনে এসেছি, মুসলমান-মেয়েদের সিঁদূর পরলে গুণাহ্ হয়। কত মেয়ে এখন এ্যাবড় এ্যাবড় সিঁদুরফোঁটা পরে ঘোরেন। শাঁখা-আলতাও পরতে

দেখেছি। বলেন, হিন্দুয়ানি নয় এসব, বাঙালিয়ানা। বাঙালির আচার হিন্দুরা একচেটিয়া করে রাখছিল, হকের দাবি ছাড়ব কেন —এদ্দিনে দখল নিয়ে নিচ্ছি।

প্রমথ বিশ্বাস রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে পড়ে খপ করে প্রশ্ন করল: খাঁটি জবাব দাও দিকি। তুমি নিজে কি—হিন্দু না মুসলমান? নাম কখনো শুনি রঞ্জন দত্ত, কখনো রমজান আলি। আসল কোনটা?

রঞ্জন উড়িয়ে দিল একেবারে: দরকার বুঝে ব্যবস্থা। যা-হোক একটা হলেই হল। ওসব নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যায়!

কী আশ্চর্য, ধর্ম নেই তোমার?

ক'জনার থাকে, আপনিই বলুন না। বিশেষ করে আমাদের বয়সের মানুষের—

একটু থেমে রঞ্জন দত্ত আবার বলে, হিন্দু বলুন মুসলমান বলুন, সবই লোকে বুড়োবয়সে হয়ে থাকে। ছুনিয়ার লীলাখেলা খতম করে অন্যত্র যেতে হবে যখন। আর দেখছি ভোটের সময়টা ধর্মের খোঁজখবর পড়ে যায়। সাতপুরুষের মধ্যে নামাজ করে নি, সেই মানুষ দেখেছি ভোটের মীটিং করতে গিয়ে ঘন ঘন নামাজে বসে যাচ্ছে। আরে ভাই, পথে না বেরিয়ে এমনি-এমনি কে খেয়ানৌকোর খবর নিতে যাবে? রাজনীতি করিনে আমি, হাবাগবা লোক পটিয়ে ভোট কুড়াতে হবে না, কিম্বা বয়সেও বুড়িয়ে যাই নি এখনো —ধর্মে আমার গরজটা কি বলুন তো।

প্রণব ভাষাশহিদদের নিয়ে তোলাপাড়া করছিল মনে মনে। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে ওঠে, দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ তো কতই শহিদ হয়েছেন, কিন্তু ছুনিয়ার ইতিহাসে ভাষার জন্য প্রাণদান শুধু এই ভারতবর্ষে—ভাগ হয়ে গিয়ে যার নাম এখন পাক-ভারত। বাংলাভাষার জন্যে ছুই খণ্ডেরই মানুষই প্রাণ দিয়েছেন—

উঁহু, উঁহু—নীলকণ্ঠ প্রতিবাদ করে ওঠেন: তামিল বাদ দিয়ে শুধু-বাংলা কেন? তামিলের কথা বেশি করে বলতে হবে। স্বাধীনতা-দিবসে দিল্লিতে আর রাজ্যে রাজ্যে উৎসবের রোসনাই। তামিল ছেলে রোসনাই করল মাতৃভাষার নামে গায়ের উপর দাউদাউ করে পেট্রোল জ্বালিয়ে। রোসনাইয়ের জৌলুষে হারিয়ে দিল সেদিন ভারতের তাবৎ রাজ্যগুলোকে।

একটু থেমে প্রদীপ্তকণ্ঠে আবার বললেন, বাঙালি আর তামিল দুই জাত প্রাণ দিয়েছে। আপাতত এই অবধি। চক্রীদের তবু চোখ ফোটে নি। মানুষও কোমর বাঁধছে—প্রাণ দেবার আরও কত মানুষ এগিয়ে আসবে দেখো।

॥ ত্রিশ ॥

একটা খবর : হরিহর খাঁ-চৌধুরির মৃত্যু। উৎকট নৃশংস মৃত্যু —মেরে নদীকূলে ঘন জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিন-চার দিন শীতল জোলো হাওয়ায় আনন্দে দোল খেয়েছেন, তারপরে আবিষ্কার হল। এবং নিশানদিহি হল, আমার আপনার মতন আজে-বাজে দেহ নয়—দস্তুরমতো ঘি-দুধ মাছ-মাংস বাদসাভোগ ভাত-খাওয়া মহামূল্য দেহ একখানি।

প্রণব আদ্যোপান্ত শুনে এসেছে। বলল, এক-গোলা ধান ম্যাজিকে অদৃশ্য করে রেখেছিল। ম্যাজিক শেষটা আর খাটল না, বেরিয়ে পড়ল সব ধান। বাবার সেই পয়লা দিনের কথাগুলো মনে পড়ে রঞ্জনবাবু? এই হরিহরকে নিয়েই বলেছিলেন—শঙ্করমাছের চাবুকে আগাপাস্তলা চাবকে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে কড়িকাঠে ঝোলানোর কথা। সত্যি সত্যি তাই হল—কড়িকাঠে না ঝুলিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

রঞ্জন বলে, কড়িকাঠের চেয়ে গাছ অনেক ভাল। ঘরের কড়িকাঠে কত আবরু, গাছে দশেধর্মে দেখতে পাচ্ছে।

চুপচাপ শুনছিলেন নীলকণ্ঠ বর্মা, হি-হি করে হেসে উঠলেন : ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাতে হবে, তোমাদের জওহরলাল বলেছিলেন না? বক্তৃতাবাজ আর খামখেয়ালি রগচটা হলেও ইচ্ছেটা তাঁর ফলে যাচ্ছে কেমন, দেখ। মহাজন-বাক্য ফলে এমনি উত্তরকালে। কার্ল মার্ক্সের উক্তিও পথ করে নিল মৃত্যুর অনেক পরে। হরিহর খাঁ দিয়ে শুরু—এমনি অনেক হবে, পুরানো ইতিহাস আমায় বলে দিচ্ছে।

ভাঁড়ে মাছ জিইয়ে রাখা, ইচ্ছে মতন তুলে নিয়ে বঁটি পেতে কাটবে—উপমাটা বড় খাঁটি, হরিহর পদে পদে টের পাচ্ছেন

এখন। একলা ত্রিপাঠি নয়—হিতৈষী যার কাছে যাচ্ছেন, সকলের মুখে এককথা: তিলার্ধ কালক্ষেপ নয়, সরে পড়ুন পৈতৃক-প্রাণ নিয়ে। কিন্তু তারই বা কায়দাটা কী? বাড়ির চতুর্দিকে অহর্নিশি পাহারা —শান্তিলতার যাওয়ার দিনে ভালমতেই তা জানা হয়ে গেছে।

একলা বাড়িতে দিনমানটা তবু যাহোক একরকম, রাত্রি একেবারে অসহ্য। চোখে ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই, শয্যাতেও পড়ে থাকতে পারেন না—ঘরময় ছটফট করে বেড়ান। শত্রুর অঞ্চল—বাড়িটাও শত্রুপুরী। অন্ধকারে মনের কল্পনায় শত শত ছোরা-ছুরি ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

নিজস্ব নৌকো আছে। ছোট লঞ্চও আছে একটা। লঞ্চের ড্রাইভার বয়সে ছোকরা, চুস্তো-প্যান্ট পরে, চোখে-মুখে কথা বলে। ছোকরা-মানুষের উপর আস্থা করা চলে না। লঞ্চের উপর উঠে পড়লাম—তার পরে হয়তো কোন-এক অজুহাত দেখিয়ে পাড়ের উপর ধরল শত্রুর একেবারে ঘাঁটির মধ্যে। পালান মাঝি সেদিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য। বুড়োমানুষ—ঠাকুরদেবতা খুব মানে, মনে ধর্মভাব আছে। তবে যা দিনকাল, জোর করে কিছু বলবার জো নেই। চিরদিনের বিশ্বস্ত মাঝি সে কথা ঠিক, মনিবের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারত—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনোভাব কী রকম দাঁড়িয়েছে, কে বলবে।

রাত পোহালে হরিহর পালানকে ডেকে পাঠালেন। দোতলায় একেবারে খাস-কামরায় নিয়ে তুললেন। বললেন, আমি শ্বশুরবাড়ি যাবো পালান, পৌঁছে দিয়ে আসবে।

পলায়ন ভাবছে নাকি মাঝি? কৈফিয়ৎ বানিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন, তোমাদের ঠাকরুনের বাড়াবাড়ি অসুখ—শালামশায় লোক পাঠিয়েছে। না গেলে চলবে না।

পালান একটুখানি ভেবে ইতস্তত করে বলল, তাইতো! ওরা কি আর বিপদ-আপদ বুঝবে?

হরিহর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন : আমার বাড়ি, আমার শ্বশুরবাড়ি। ইচ্ছে হয়েছে, বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। কার কাছে সেজন্য কৈফিয়ৎ দিতে যাবো?

পালান বলল, কৈফিয়ৎ তো চাইতে আসবে না হুজুর। টের পেয়ে গেলে বিশ-পঁচিশ মরদ জুটে পড়ে মাঝ-গাঙে নৌকোই বা দিল ডুবিয়ে। ঠিক এমনি একটা ঘটেছে কালীগঞ্জ থানায়।

হরিহরের উল্টো সুর সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, টের যাতে না পায়, তাই করো তবে। বউয়ের এখন-তখন অবস্থা, যেতেই হবে। তুমি ছাড়া এ-কাজে অন্য কারো উপর ভরসা করতে পারিনে।

ভেবেচিন্তে পালান বলে, বাড়ির ঘাটে নয়, চেনা-নৌকোতেও নয়। কড়া নজর রেখেছে। সেদিন তো একবার পরখ হয়ে গেল।

তবে? হরিহরের কণ্ঠস্বর হাহাকারের মতন শোনায়।

এক হতে পারে, আমার দুই ছেলে ডিঙিনৌকো নিয়ে পাতি কাটতে গেছে। কষ্ট করে সেই অবধি যদি যেতে পারেন, টুক করে তারা পৌঁছে দিয়ে আসবে। তল্লাটের কাকপক্ষীও টের পাবে না।

হরিহর বলেন, কোথায় তোমার ছেলেরা?

বয়ারমারি।

হরিহর আঁতকে ওঠেন : সে তো অনেকখানি দূর—

ঘাড় নেড়ে পালান সায় দিল : আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘাটও তেমন-কিছু নয়, লোক-চলাচল নেই সেদিকটা। পাতিবন। বড় একটা শিমূলগাছ আছে, শিমূলগাছ নিশানা। পাতি কাটতে গিয়ে ঐখানটা সবাই নৌকো বাঁধে।

আরও সামাল করে দিচ্ছে : দিনমানে বেরুতে যাবেন না হুজুর। খবরদার! আঁচ পেয়েছি, যাচ্ছেতাই কথাবার্তা কানে আসে। রাত্রিবেলা অন্ধকারে মুখ ঢেকে বাড়ি থেকে যদি বেরিয়ে পড়তে পারেন।

পরামর্শ পছন্দসই নয়। নিজের বাড়িতে আছেন—যা-হোক তবু চার-দেয়ালের ঘের, মাথার উপরে ছাত। বাড়ি ছেড়ে পথে নেমে একলা প্রাণী তিন-চার মাইল মুখ ঢেকে চলে যাবেন—একটি মানুষ দেখতে পাবে না, দেখলেও চিনতে পারবে না। অবাস্তব জিনিস এর চেয়ে আর হয় না। আর বেরুচ্ছেনই বা কেমন করে পথে? পুলিশের কনস্টেবল নয় তারা যে একই সঙ্গে পাহারা দিচ্ছে আর ঘুমও দিচ্ছে লাঠি ঠেকনো দিয়ে। দিন আর রাত আলো আর অন্ধকারের বাছবিচার নেই তাদের কাছে। সেদিনই তো দেখলে তোমার ঠাকরুনের নৌকোয় উঠবার বেলা।

ভেবে কূল মেলে না। চুপচাপ আরও কিছুক্ষণ বসে পালান উঠে পড়ল।

আকস্মিক ভাবে হরিহর পথ পেয়ে গেলেন, রাত্রিবেলা ও অন্ধকার অবধি অপেক্ষা করতে হল না। এক বিকালে রে-রে করে বাড়িতে মানুষ ঢুকে গেল। রাস্তার উপরেও প্রচণ্ড ভিড়। খবর ছড়িয়ে পড়তে নানা দিক দিয়ে দলে দলে ছুটে আসছে। গিসগিস করছে মানুষ।

প্রতিবেশী বৃদ্ধ তারাবল্লভ বেড়াতে বেরিয়েছেন। ভিড় ঠেলে যাওয়া অসম্ভব, দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। একজনকে শুধালেন: ব্যাপার কি পঞ্চানন?

পঞ্চানন দাঁত বের করে অকৃত্রিম উল্লাসে বড়লোকের লাঞ্ছনা দেখছে। জবাব না দিয়ে সে হি-হি করে হাসতে লাগল।

বৃদ্ধ জ্বলে উঠলেন: হেসো না, হেসো না। ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। খাঁ-চৌধুরির বাড়ি লুঠ হচ্ছে, চোখে দেখে বড্ড সুখ। যেদিন তোমার আমার বাড়ি ঢুকে পড়বে? কিছু বিশ্বাস নেই। আবাদে দেখ নি—বাঁধ বেঁধে গাঙের জল আটকানো।

এক মুখে একটুকু ভাঙন দেখা দিল—তক্ষুনি যদি মাটি ফেলে জলের তোড় রুখে না দাও, বাঁধের চিহ্নমাত্র থাকবে না।

চতুর্দিকে নজর ঘুরিয়ে দেখে বললেন, কোনো বেটা পুলিশের পাত্তা নেই। ঝিমুচ্ছে থানায় বসে বসে। কাজকর্ম সেরে চলে যাক, হুঁই-হাই করে তখন রীতি-রক্ষে করতে আসবে।

কোন্‌দিক থেকে এক ছোকরা এসে মুখ বাড়িয়ে বলল, পুলিশ এই তো আমরাই সব—বেসরকারি পুলিশ।

তারাবল্লভ বললেন, তাই তো দেখছি বাবাসকল। বয়স কম তোমাদের, রক্ত গরম। বাড়ি ঢুকে দলবদ্ধ হয়ে হামলা করা—কাজটা কিন্তু ঘোরতর বেআইনি।

ছোকরা বলল, ধানের খবর আছে, ধান মজুত করে রেখেছে। সেটা তো আরও বেআইনি। খুন করেছে, খুনি ধরতে বাড়ির মধ্যে ঢুকব—আইন দেখালে চলে তখন দাছ ?

দোতলায় হরিহর পাগলের মতন ছুটোছুটি করছেন। কোথায় যাবেন কী করবেন, কিনারা পাচ্ছেন না। চোরকুঠুরি সিঁড়ির ধারে, বাতিল কাঠকুটো ও আজেবাজে জিনিসে বোঝাই হয়ে আছে—গুটিসুটি হয়ে তার মধ্যে বসে পড়লেন।

পেয়েছি, পেয়েছি—

কে হঠাৎ আকাশ-ফাটানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের কলরোল। ঝোড়ো-সমুদ্রের তরঙ্গ আছড়ে আছড়ে পড়ছে। বাইরে যারা আছে, তাদের মধ্যেও হুড়োহুড়ি—সকলে ঢুকে পড়তে চায়। ধাক্কাধাক্কিতে কতজনা মাটিতে পড়ল। পদপিষ্ট হচ্ছে—কায়ক্লেশে উঠে পড়ে আবার ছুটেছে। মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার মিলে গেছে, ছুটে যাও—লুটেপুটে নিয়ে নিল অন্য সবাই।

ধান, ধান, ধান!

প্রচণ্ড উল্লাস আর হাঁকডাকের মধ্যে হরিহর চুপচাপ মাথা গুঁজে থাকতে পারেন না। জানলার কপাট ফাঁক করে দেখেন। দুরন্ত

মধ্যের ভিতর-উঠানে। সুলুকসন্ধান নিয়ে দস্তুরমতো তৈরি হয়ে সব বাড়ি ঢুকেছে। দমাদম কুড়ালের ঘা পড়ছে ভল্টের কঠিন দরজায়। দু জুটো বরকন্দাজ এবং একগাদা চাকর-বাকর বাড়িতে পুষে আসছেন—এই চরমক্ষণে পুতুল হয়ে গেছে তারা। চক্ষু থেকেও দেখতে পাচ্ছে না যেন। মুখ থেকেও বাক্যস্ফূর্তি নেই, হাতখানা অবধি উঁচু করে তোলবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ওর মধ্যে দাঁত মেলে হাসছেও কেউ কেউ—এমনিধারা মনে হল। বিপদের মুখে আপন কেউ নয়, সবাই শত্রু। শৈশবে পদ্য পড়েছিলাম, সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়। দেখ চেয়ে চোখের উপর তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মানুষ হন্যে হয়েছে। বস্তা বস্তা ধান এনে উঠানে ফেলছে। বাধা-বন্ধ নেই, নিয়ে নিলেই হল। এরই মধ্যে জন কয়েক মাতব্বর হয়ে হাঁক পাড়ছে: পেটের ক্ষিধে সকলের, সবাই প্রত্যাশী। ইচ্ছে মতন নিয়ে নিলে হবে না, বাঁটোয়ারা করতে হবে। সবাই যাতে চাট্টি চাট্টি পায়।

এক দঙ্গল ছোকরা জুটে গেছে, ভলান্টিয়ার হয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে তারা। হাতে হাতে শিকল বানিয়ে পথ করে দিয়েছে—এই পথ ভিতরে ঢুকবার, আর এই পথ বেরুনোর।

আপন-বাড়িতে চোরকুঠুরির মধ্যে বন্দী থেকে হরিহর গজর-গজর করছেন: উঃ, বাপের ধান দানখয়রাত করছে শালারা!

কলজে খসে খান খান হয়ে যাচ্ছে, তবু কথা বলার জো নেই। এমন কি, জানলা ফাঁক করে এই যে দেখছেন, নেহাৎ লুঠপাট নিয়ে মত্ত—নজরে পড়লে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি চেপে হাড়মাংস ছিঁড়েখুঁড়ে প্রতিহিংসা নেবে।

ধান নিয়ে পাগল—বিশাল জনতার সকলগুলো চোখ উঠানের ধানের দিকে। ঐ দিকটা চুকিয়ে-বুকিয়ে তারপর মজুতদারের খোঁজ পড়বে। সুযোগ এইবারে। পাহারা এই মুহূর্তে ঢিলা—

হেন মহেন্দ্রযোগ আর মিলবে না। পিছন দিককার ঘোরানো-সিঁড়ি দিয়ে নেমে টিপিটিপি খিড়কি-দরজা খুলে হরিহর নদীকূলে এসে পড়লেন। কেউ নেই কোথাও। বনজঙ্গল অপথ-বিপথ ভেঙে ছুটলেন তিনি।

ভাগ্য ভাল, এই সন্ধ্যাবেলা পালান বাড়িতে। একলা সে মাদুরে বসে জাল বুনছে। বাড়িটা দেখা ছিল, নৌকোয় যেতে যেতে হরিহর অনেক বার দেখেছেন। যেতে যেতে মিনিটখানেকের জন্য পালান হয়তো কলকে-তামাক কি বোঠে নিতে বাড়িতে নেমে পড়েছে। নড়বড়ে গোলপাতার ঘর—মহাধনী মহামানী মানুষটি চোরের বেহদ্দ হয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে সেই ঘরে ঢুকলেন। হাঁপাচ্ছেন উদ্বেগে আর ক্লান্তিতে। ছেঁড়া-মাদুরের উপর পালানের পাশে থপ্ করে বসে পড়লেন।

পালান স্তম্ভিত: এলেন কেমন করে হুজুর?

ম্লান হেসে হরিহর বলেন, মোটরলঞ্চ-মোটরগাড়ি নয়, সাইকেল-রিক্সাও নয়। পায়ে হেঁটে এসেছি, তোমরা সব যেমন এসো।

আবার বললেন, তোমাদের ঠাকরুনের বড্ড বাড়াবাড়ি আছে, কি নেই—উদ্বেগে ছুটে এসেছি। চলো পালান, বয়ারমারি না কোন্ জায়গায় তোমাদের ডিঙি—নিয়ে চলো সেখানে। দেরি হলে হবে না, এক্ষুনি বেরুব।

তবু দেরি। পালানের বউ পাড়ায় গেছে, ডেকে এনে তাকে ঘরে মোতায়েন করে তবে বেরুনো। হরিহর সতর্ক করে দেন: দেখো হে—আমি এখানে, ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না পায়।

পালান সবিনয়ে বলে, জানি হুজুর। দায় এখন আমারই। এইখানে বাড়ির উপরে যদি কেলেঙ্কারি ঘটে যায়, আপনার কাছে ইহকালে মুখ দেখাব কেমন করে? একা রইলেন, চট করে আমি আসছি।

যাবার মুখে পালান দুয়োর ভেজিয়ে দেয়। হরিহর বলেন, তা কেন। খিল দিয়ে বসি আমি। হঠাৎ কেউ না ঢুকতে পারে। তুমি এসে ডাকলে খুলে দেবো।

সেই গেল পালান, আর আসে না। উদ্বেগে হরিহর বারম্বার হাতঘড়ি দেখছেন। কোথায় কত দূর বেরিয়েছে পালানের বউ—হনলুলু না হাওয়াই-দ্বীপে—এতক্ষণ কিসে লাগে জানিনে বাবা।

ঘড়িতে ঘণ্টা পুরতে যায়, তখন দরজায় টোকা। খিল খুলে হরিহর বলেন, এত দেরি ?

বউকে তুলতে পারিনে, শনির সিন্নি দক্ষিণের বাড়ি। পুঁথিপাঠ সারা না হলে নড়বার উপায় নেই। কাঁচাখেগো দেবতা যে শনিঠাকুর।

পালানের পাশ কাটিয়ে বউ এসে ঘরে উঠল। পালান বলে, দেরি হয়ে কাজের কিন্তু জুত হয়েছে হুজুর। কী রকম ঘুটঘুটে অন্ধকার, বেরিয়ে দেখুন। নিজের হাত-পা ক'খানাই নজরে পাবেন না।

খুব একটা অতিশয়োক্তি নয়। রাস্তা ছেড়ে পালান বাঁশবনে নিয়ে তুলল। পথ সংক্ষেপ হবে, লোকের মুখোমুখিও পড়তে হবে না।

ঝাড়ের পর ঝাড়—অনন্ত। ছড়িয়ে-পড়া কঞ্চিও গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। তা হোক, তা হোক—ঝাড় সেই বয়ারমারি অবধি চললেই বা মন্দ কি। পালান আগে আগে যাচ্ছে পথের নিশানা দিয়ে। মানুষটা নজরে আসে না—শুকনো পাতা পায়ে পায়ে ছিটকে পড়ে, সেই খসখসানি। বেশ প্রখর আওয়াজ, ঝড় ছুটিয়ে চলেছে যেন।

হরিহর ডাকছেন : অত জোরে নয় পালান। আস্তে, আস্তে। অত আমি ছুটতে পারিনে।

জবাব আসে না। জোরও কমে নি। ওদের কি ! চাষাভুষো মানুষ, অন্ধকারে বেশি করে নজর খুলে যায়। রাত্তে আলো জ্বালে না—কেরোসিন কোথা ? বিলাসিতার গরজই বা কি ? ভাত খাওয়ার সময়েও আলো লাগে না—মাছের কাঁটা বাছবার সময় হয়তো বা একটু জ্বালিয়ে নেয়, পরক্ষণে ফুঁ দিয়ে নেভায়। প্রভুদের দয়ায় ও ব্যবস্থার গুণে আলোর ব্যাপারে বিষম কড়াকড়ি। শ্বাপদ-সরীসৃপের মতো অবাধ চলাচল—সাপের ভয় করে না, সাপেরাও বোধহয় স্বজাতি ভেবে খাতির করে। আপনি-আমি হলে ফোঁস করে কেউটে ফণা তুলে ওঠে, ওদের বেলা কেঁচোর মতন সড়সড় করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

পালান, ওরে পালান—

সাড়া মেলে না। অন্ধকার কালো কাদার মতন সর্বাঙ্গে লেপটে যাচ্ছে, এমনি এক বিচিত্র অনুভূতি। অন্ধের মতো চলেছেন হরিহর—চোখ বুজছেন ক্ষণে ক্ষণে। চোখ মেলে থেকে কিছুমাত্র ফয়দা নেই, সর্বক্ষণ চোখ খাটিয়ে তবে মুনাফাটা কি ?

সর্বনাশ পিছু নিয়েছে, বুঝলেন এতক্ষণে। বাঁশপাতার খসখসানি সামনে ছিল—তেমনি আওয়াজ পিছনেও যেন পাওয়া যায়। ডাইনেও, বাঁয়েও। সর্বত্র। চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে—জাল গুটিয়ে আনছে। দৃষ্টি প্রাণপণে বিসারিত করেও মানুষ দেখা যায় না—অশরীরী অলক্ষ্য শত্রুপক্ষ। ভয় পেয়ে হরিহর পালান-মাঝিকে ডাকছেন। গলা শুকিয়ে কাঠ—আওয়াজ বেরোয় না।

হরিহর মর্মান্তিক চিৎকার করে উঠলেন : হাত ধরো এসে পালান। পথ ঠাহর পাচ্ছিনে।

কা কস্য পরিবেদনা ! পালান-মাঝিও বিশ্বাসঘাতক। সরে পড়েছে, কিম্বা কাছে থেকেও কথা বলছে না। অন্ধকারের মধ্যে ঘোরতর ব্যস্ততা—হুটোপাটি লেগেছে যেন অনেক জনের মধ্যে।

নজরে পাচ্ছেন না হরিহর, কিন্তু স্পষ্ট উপলব্ধি। চোখে দেখার চেয়ে বেশি প্রকট।

গোলকধাঁধার মধ্যে এনে ফেলেছে চক্রান্ত করে। কোনো সন্দেহ নেই আর। পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লেন। শুকনো বাঁশপাতা জমে গদির মতন—তার উপরে আঘাত লাগল না। কিন্তু অন্ধকারচারী রসিকবৃন্দের হা-হা হি-হি হাসি। এদিকে-সেদিকে প্রতিধ্বনি—হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন সারা বাঁশবন। নিঃসংশয় এখন, বহুজন চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে, খেলাচ্ছে হরিহরকে। বিড়াল যেমন মুখের ইঁদুরকে ছেড়ে রেখে খেলায়। বড়শি-গাঁথা মাছ ডাঙায় তোলার আগে জলের মধ্যে যেমন খেলিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

দু-হাতে ভর দিয়ে হরিহর উঠে পড়লেন। ছুটছেন প্রাণপণে—হাসির ব্যূহ ভেদ করে গোলকধাঁধা কাটিয়ে বেরুনোর প্রয়াস। এদিকে-সেদিকে আরও বিস্তর ছুটেছে পায়ে পায়ে বাঁশপাতা ছড়িয়ে—অনুভব করছেন সেটা। কখন রাস্তায় পড়বেন, আলোয় পৌঁছে যাবেন অন্ধকার পাড়ি দিয়ে! এই অন্ধকার কূলহীন সমুদ্রের মতো—দিনরাত্রি ছুটেও বুঝি পাড়ে ওঠা যাবে না। চোখে না দেখেও হরিহর বুঝতে পারছেন, শতসহস্র কঙ্কাল-মানুষ চতুর্দিক ঘিরে। অস্থিময় হাত বের করেছে তারা, অস্থিগুলো বুঝি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। অস্থিসার আঙুলগুলো জিঘাংসার উত্তেজনায় আকুলিবিকুলি করছে—হাড়ে হাড়ে খটখট বাজনা। সহস্রখানা হাত গলা চেপে ধরতে আসছে, গলা ছুঁই-ছুঁই করেছে। সহস্র বুভুক্ষু বিশীর্ণ মুখের উপর দাঁত বের-করা উৎকট হাসি। আতঙ্কে হরিহর চেতনা হারিয়ে সেই বাঁশের জঙ্গলে লুটিয়ে পড়লেন। কায়দায় পেয়েছে—নিশ্চল দেহ ছিঁড়েখুঁড়ে আক্রোশের এইবারে শোধ তুলবে।

॥ একত্রিশ ॥

নীলকণ্ঠ বর্মা বলছেন, এই হরিহর খাঁ দিয়ে শুরু। এমনিই হবে, ইতিহাসে দৃষ্টান্ত পচ্ছি।

রুশ-বিপ্লবের আমলেও ঠিক এই জিনিস। জারের এত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছায়ার মতন মিলিয়ে গেছে। পায়ের নিচে মাটি পাচ্ছেন না নিকোলাস। ছনিয়ার মধ্যে আপন বলতে রানী আর গুটিকয়েক পরিচারক। রাজকীয় শক্তির মূলাধার হল সৈন্য-পুলিশ—তাদের বন্দুকের নল। সেই নল উল্টো দিকে ঘুরে যায় বুঝি এবার।

জার নিকোলাস বুঝেছেন অবস্থা। সর্ববস্তুর অনটন চলছে—দিনের পর দিন বছরের পর বছর কিউ দিয়ে দিয়ে ঐ কর্মে মানুষ নিরতিশয় পটু। রুটির জন্য হুধের জন্য কয়লার জন্য মানুষ বরাবর কিউ দিয়ে এসেছে—কিউয়ে দাঁড়িয়ে এখন আর ছিঁটেফোঁটাও জিনিস মেলে না, সমস্ত কালোবাজারে ঢুকে গেছে। তার জন্যে আলাদা তদ্বির। কিউয়ের অভ্যাসটা লোকে তবু ছাড়ে নি। কিউ দিয়ে দাঁড়ায় এখন গরম গরম রাজনৈতিক বক্তৃতা শোনার জন্য। সকলের মনের উত্তপ্ত ফুলকি বক্তৃতার ভাষায় আগুন হয়ে দাউদাউ করে জ্বলে।

উদাসীন জার। সমস্ত ছেড়েছুড়ে গাঁ-গ্রামের ভদ্রলোকের মতন নিরিবিলি থাকতে চান। যত-কিছু দায়দায়িত্ব রানী নিয়ে নিয়েছেন। জর্মন-কন্যা তিনি, লড়াইটা আবার জর্মনির সঙ্গেই। রাসপুটিন নামে এক গেঁয়ো দৈবজ্ঞ ত্রাণকর্তা হয়ে প্যালেসে চেপে বসেছে—রানী তার কথায় ওঠেন-বসেন। লোক ছু-চক্ষে দেখতে পারে না রানীকে। যত অপদার্থ লোক নিয়ে তাঁর সরকার—

আঙুল ফুলে তারা কলাগাছ হয়ে পড়েছে। মারাত্মক রকমের অযোগ্যতা, তার উপর ঈর্ষা-বিদ্বেষ পরস্পরের মধ্যে।

জনসাধারণ এত দুঃখ সয়ে আসছে এযাবৎ, সৈন্যরাও সাহসী সুচতুর—তবু কিন্তু লড়াই জেতার বিন্দুমাত্র আশা নেই। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা। সেনাপতিরা উপরের কম্যাণ্ড গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে নিজ নিজ বুদ্ধি-মতো সৈন্য চালনা করে। সৈন্য ওদিকে হাজারে হাজারে তৈরি হয়ে ক্যাম্পে দিন কাটাচ্ছে—ফ্রণ্টে পাঠানো যাচ্ছে না যেহেতু রাইফেলের অভাব। লড়তে লড়তে হঠাৎ বা দেখা গেল গুলি-গোলা বিলকুল বাড়ন্ত, পৈতৃক প্রাণ নিয়ে পলায়ন ছাড়া তখন আর উপায় থাকে না। আহতেরা পড়ে পড়ে আর্তনাদ করে, হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা নেই। রসদ বিহনে সৈন্যসামন্তের উপোস যাচ্ছে, আর ওদিকে সাইবেরিয়ায় মাংস ডাঁই হয়ে পচছে। ওয়াগনের অভাবে চালান দেওয়া যাচ্ছে না।

সৈন্যদের মতিগতি ভাল নয়: দেশের জন্য আমরা মরতে রাজি, কিন্তু হামবড় জেনারেলদের খেয়াল-খুশির বলি হতে পারব না।

চরম দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসে। বিষ খাইয়েছিল রাসপুটিনকে, তাতে মরে নি—বিস্তর কৌশলে অবশেষে হত্যা করল। কৃষকরা বিক্ষুব্ধ: আমাদের ভিতরের একজনে প্যালেসে জমিয়ে নিয়েছিল, কিছুতে ওরা সইতে পারল না—খুন করে নিশ্চিন্ত হল।

জারিনা অবসাদে ভেঙে পড়ছেন। তাঁকে চাঙ্গা করবার জন্য জাল-চিঠি পাঠানো হচ্ছে জনসাধারণের নামে: এমন মহীয়সী সেবাব্রতা রানী ভুবনে আর দ্বিতীয় নেই। হত্যার হুমকি দিয়ে তেমনি আবার পালটা চিঠিও আসছে: রাসপুটিন বিহনে তার অনুগতদের ডেকে ডেকে চাকরি দিচ্ছ। রাসপুটিনের পরিণাম তোমারও, সেদিনের বেশি দেরি নেই।

জ্যু-র .শলাপরামর্শ। দুশ্চারিণী জারিনার সামনে মাথা

ঘোরাবো না—সেনাপতিরা ভড়পাচ্ছে। বিপ্লবের পূর্বাভাস। আসন্ন বিপদ জারকে শোনাতে যায় কেউ কেউ। নিস্পৃহ নিকোলাস—কে যেন কী বলছে কার সঙ্গে! এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। জানলায় বসে দূরের অরণ্যে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। আঙুল দেখিয়ে বলছেন, জানো, ঐ বনের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আজ চলে গিয়েছিলাম। দলবল নিয়ে নয়, একেবারে একলা। একলা যাওয়ার দিন পেলাম প্রথম আজ জীবনে। কী শান্তি, কী শান্তি! প্রাসাদের চক্রান্ত, অঞ্চলে অঞ্চলে অশান্তি, ফ্রন্টের গোলমাল—ভাবনাচিন্তা সমস্ত ভুলে থাকা যায়। জীবনের নতুন আস্বাদ বনের মধ্যে।

ডায়েরিতে এই সময়টা নিকোলাসের লেখা: ফাঁক পেলেই আমি তাস খেলতে বসে যাই···

পেট্রোগ্রাডে পয়লা হাঙ্গামা—লোকে রুটি পাচ্ছে না, তাই নিয়ে। পরে জানা গেছে, রুটি অঢেল ছিল—বিতরণে অব্যবস্থা। শত শত কণ্ঠ চেঁচাচ্ছে: জর্মন স্ত্রীলোকটা (জারিনা) নিপাত যাক!

তারপর একদিন জনতার রায় এসে প্যালেসে পৌঁছল: ছাড়ো সিংহাসন—

নিকোলাস হাউহাউ করে কাঁদেন রানীকে জড়িয়ে ধরে। চারিদিকে তাকান—এতটুকু দরদ নেই কোনো মুখে, চাপা হাসি ঝিকমিক করছে। প্রাসাদ থেকে বেরুলেন—ছ'টা সৈন্য বন্দুক বাগিয়ে ধরেছে পিছনে। কুঁদো দিয়ে পিঠে ঠোক্কর দিল: ওপথে নয়, ওদিকে যাওয়া মানা।

জারিনা জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন।

রাজা বন্দী। এ মূল্যবান মাল কোথায় নিয়ে রাখা যায়—মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে ধরে। নিকোলাসকে মুক্ত করে আবার মসনদে বসাবে, একদলের চেষ্টা।

ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। ফরাসি-বিপ্লবের শেষে যা ঘটেছিল, তেমনটি না হয়—রাজতন্ত্র ফিরে না আসে।

সসম্ভ্রমে জারকে আহ্বান করে: একবারটি নিচে আসতে হবে যে হুজুর।

জার নীরব, উদাসীন—কলের পুতুলের মতো যা বলে তাই করেন।

চেয়ার দিল বসতে। একজন লোক অনতিদূরে কফি খাচ্ছিল, পাত্র রেখে উঠে এলো। বলে, হুজুরকে মুক্ত করবার জন্য নানা কলকৌশল খাটাচ্ছিল। অত হাঙ্গামের দরকারটা কি? খুব সহজে আমি মুক্ত করে দিচ্ছি।

হতভম্ব জার বললেন, কী করবে?

এই যে, দেখুন না—

বন্দুক তুলে নিয়ে দুম করে গুলি। বুকের মাঝখানটায়। চেয়ার থেকে জার মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন।

লোকটা নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে সামোভার থেকে কফি ঢেলে নিল পাত্রে। কিছুই নয়—যেন একটা পাগলা কুকুর মেরে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বসল। হাতে একটুকু রক্তের দাগ লাগে নি। মন প্রসন্ন।

তারপর একে একে সকলের ডাক পড়ল। জারের ঘরের প্রতিটি জন। ছেলে মেয়ে কাউকে বাদ রাখল না বংশে বাতি দেবার জন্য। মায় রাঁধুনি ও ডাক্তার। জারিনা বুকের উপর দুই হাতে ক্রুশ করলেন—গুলি সেই ক্রুশের উপরে।

তবু তারা বলে, অগুন্তি বাদ রয়ে গেছে। ক্ষুদে জার-জারিনা দুনিয়ার দেশে দেশে। সবাই নিপাত যাবে।

আমাদের হরিহর খাঁ-চৌধুরিও বুঝি তার মধ্যে।

বলো হরি, হরিবোল—

মড়া শ্রীধর মল্লিকের উঠানে। শ্রীধর কোন্ দিকে ছিলেন, হন্তদন্ত হয়ে এলেন।

কী ব্যাপার, ঘাটের উপরে মড়া কেন ?

ক্ষিতিনাথ দলের সঙ্গে। সহাস্যে বললেন, ঘাট ছাড়া মড়া আর কোথায় যায় ? সেই ভদ্রলোক আছেন তো এখানে ? বুঝতে পারলেন না—যাঁর কথা বলতে আপনি আমবাগান অবধি ধাওয়া করেছিলেন। বাপকে গঙ্গায় দেবেন বলে ঝঞ্ঝাট করে এঁরা মড়া নিয়ে এসেছেন। পাকিস্তানের গেঁয়ো-মানুষ সব—গঙ্গা-টঙ্গা চেনা নেই। ভদ্রলোককে ডেকে আনুন, ব্রাহ্মণের সৎকারের ব্যবস্থা তাঁকেই করে দিতে হবে।

হেসে পুনশ্চ বললেন, খাটনিটা মুফতের নয়। তা হলে আনতে যাব কেন ? পাওনাগণ্ডা আশার অধিক।

ঘাটের ঘাটোয়াল, পাকা লোক—এতেই মোটামুটি বুঝে নিলেন।

প্রণবকে ক্ষিতিনাথ বললেন, দীনদয়াল চাটুয্যের নাম শুনেছেন ? শুনবেন কী করে, পাকিস্তানে তো যাতায়াত নেই। ধনী-মানী হয়েও পরোপকারী মানুষ। দেহটা গঙ্গায় সমর্পণ করতে যাবেন। আপনাদের বাড়ি অতিথ হলে নাকি বড্ড আরাম। এঁরাও তাই হবেন। ঘণ্টাখানেক ওখানে জিরিয়ে যাবেন, সেই ব্যবস্থা হয়েছে।

বলার ঢঙে শ্রীধর হাসছেন।

প্রণব একটুখানি ভেবে বলল, শ্মশান অবধি মিছে কেন যেতে যাব ? এখান থেকেই মড়া হালকা করে দিয়ে সোজা ওঁরা কলকাতার নিমতলায় চলে যান। বিচার করে আপনারা বলে দিন, খরচখরচা সেই মতো আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।

দীনদয়ালের পুত্রেরা—পিতৃভক্তির তোড়ে এই কষ্ট করে চলেছে—প্রস্তাবে অতিশয় প্রসন্ন। বলে, তা হলে তো ভাল হয়। খুবই ভাল হয়। ঝামেলা সহজে মেটে। হোক তাই, আমরা রাজি।

আর এক পুত্র বলে, তবে আর অত দূর নিমতলাই বা কেন? পথে কি আর গাঙ-খাল নেই? সব গাঙই সাগরে গেছে—জলে জলে মেশামেশি, গাঙ মাত্রেই তো গঙ্গা।

ক্ষিতিনাথ বললেন, বটেই তো। ঝামেলা এখান থেকে মিটে গেলে বাপকে কাঁধে তুলে একটা কোনো গাঙ-খাল খানা-ডোবা তাক করে স্ফূর্তিতে আপনারা বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু প্রণববাবু নিজের উপায়টা তলিয়ে ভাবছেন না। মাল নিয়ে তিনি কেমন করে ঘরে পৌঁছবেন?

প্রণব বলে, ভেবেছি বইকি। কিন্তু আরো বড় ভাবনা, মড়ার গায়ে-বাঁধা চাল—মায়ের বড্ড ঘেন্না—মরে গেলেও এই চাল রান্নাঘরে নিতে চাইবেন না। আবার এ-ও সত্যি, মড়া বিনে শুধু আমাদের ক্ষমতায় চাল ঘরে তোলা যাবে না। পথের মানুষ টের পেলে কেড়েকুড়ে নেবে। পুলিশে টের পেলে ডি-আই রুলে ধরবে।

ক্ষিতিনাথ বললেন, ধরবার লোক আমরাও তো। সরকারের চাকর হলেও অন্যায়টা কী আর বুঝিনে? ব্লাকে চারগুণ পাঁচগুণ দামে কিনে নিজেই আবার চোরের দায়ে পড়া। অথচ পেটে না খেয়ে মানুষ বাঁচেই বা কেমন করে? দু-দিন চারদিনের ব্যাপার নয় যে, কচুঘেচু ঘাসপাতা খেয়ে কাটিয়ে দিলাম। বছরের পর বছর ধরে এই মন্বন্তরা। দেখেশুনে আমরাও তাই একরকম চোখ বুজে থাকি। চাকরি বাঁচানোর মতন একটু-আধটু কাজ দেখিয়ে বাকি সব ছেড়ে দিই। মুফতে করি, সেটা বলছিনে। নিজেকেও ব্লাক-মার্কেটে কিনতে হয়, সে খরচা মাইনের কড়িতে কুলোয় না।

আপত্তি শ্রীধরের: প্রণববাবু তা বলে এখনই যেতে পাচ্ছেন না। ডাল-ভাতের ব্যবস্থা হয়েছে। পাত পেড়ে পাশাপাশি বসে খাবো। আপনিও কিন্তু ছাড় যাচ্ছেন না বাগচিমশায়।

ক্ষিতিনাথ বললেন, না পেলাম ছাড়—আমার কোনো অসুবিধে

নেই। কিন্তু শ্মশানবন্ধুদের লহমাও দেরি করা চলবে না। এমনিই দু-দিনের বাসি মড়া—এর পরে গন্ধ ছাড়বে, নাকে কাপড় চেপেও বমি ঠেকানো যাবে না।

প্রণব অনুনয় করে বলে, নেমন্তন্ন আজ মুলতুবি থাকুক মল্লিকমশায়। যে আপ্যায়ন পেয়ে গেলাম, আবার আসতে হবে। বারম্বার আসব। আর রঞ্জনবাবু লোভ ধরাচ্ছেন: আপ্যায়ন ওপারেও। বুক-ভরা আপ্যায়ন আঠারো বছর ধরে ওপারের ওঁরা মজুত করে রেখেছেন। সরেজমিনে দেখে আসতে হবে বই কি। চেনা-জানা করে আসব ওপার গিয়ে। বাংলা কেটেছে বলে মানুষ কেন মুশড়ে যায়, জানিনে। পার হতে ভয় লাগে তো আপাতত বর্ডার অবধি এসে ঘাড় উঁচু করে ওপার পানে তাকিয়ে দেখতে পারে। যারা পারাপার হচ্ছে, কানে শুনতে পারে তাদের কথা—

রঞ্জন মাঝখানে টিপ্পনী কেটে উঠল: জুজুর ভয় দেখিয়ে রেখেছে—যেমন এপারে, তেমনি ওপারে। মানুষ এদ্দিনে ভাঁওতা ধরে ফেলছে। চুক্তিপত্র বানিয়ে দেশ কেটে দু-খানা করা আর মাঝে মাঝে দাঙ্গা উসকে আসর গরম রাখা—চিরকালের সম্বন্ধ ওতে মুছে যাবে না।

রোয়াকে উঠে বৃদ্ধ একজন বোঁচকা নামালেন। ধনাই মিঞা, চেনা মানুষ। ঘরের মধ্যে জমিয়ে বসে সকলে জারের পরিণাম শুনছে। শ্রীধর মল্লিক বেরিয়ে এসে সবিস্ময়ে বললেন, কী ব্যাপার, ক'দিন আগেই তো ওপার থেকে এলেন। আবার চললেন যে আজ?

ধনাই মিঞা বেজার মুখে বলেন, আমি আর মানুষ কোথা মল্লিকমশায়? তাঁতের মাকু হয়ে টানা-পোড়েন করে বেড়াচ্ছি। গণ্ডগোল দেখে ছেলেপুলে ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছি—বেঁচে

থাকুক প্রাণে প্রাণে। আমার জমিজিরেত ধান-চাল সমস্ত এপারে —যা খেয়ে তারা বেঁচে থাকবে। এই বয়সে আমি একবার ওপারে যাচ্ছি ছেলেপুলে দেখতে, এপারে আসছি ধান-চাল দেখতে।

শ্রীধর প্রবোধ দিয়ে বল্লেন, গণ্ডগোল সরকারের সঙ্গে লেগেছে। তাতে ছেলেপুলে সরানোর কী হল?

ধনাই তিক্তকণ্ঠে বলেন, এখন তাই বটে—ঘুরিয়ে দিতে কতক্ষণ! পুলিশে পাবলিকে চলছে—রাত পোহালে দেখব হিন্দু-মুসলমানে ধুন্দুমার, পুলিশ ক্যা-ক্যা করে হাসছে। এ খেলা কতবারই তো হল—সোনার দেশ ছারখারে দিল মতলবীরা প্যাঁচ খেলে খেলে।

হুঁকো-বিলাসী মানুষ ধনাই। এক কলকে সারা হলে কলকে ঢেলে নতুন করে সাজবেন। হুঁকো-কলকে টিকে-তামাক বোঁচকায় ভরে কাঁধে নিয়ে ঘোরেন। চেন-স্মোকার সিগরেটখোর আছেন, ধনাই মিঞা হুঁকোর বাবদে তাই।

আকাশে মেঘ—দেখতে দেখতে গাঢ় হয়ে উঠল। চমকিত শ্রীধর উঠানে নেমে তীক্ষ্ণচোখে দেখছেন। নন্দ রাউত ও তারাপদকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন: বেরিয়ে আয় রে। কাজ বুঝি শুধু নিচেই—উপর দিকে তাকাবিনে একবার? মানুষ-জন আসছেন, তাঁদের নিয়ে আমি ব্যস্ত, তোরা কোথায় হুঁশ করে দিবি—তা নয়, আমিই ডেকে মরছি তোদের। আলো-টালো বের করে ফেল, এক্ষুনি হয়তো লাগবে।

ভুড়ুক-ভুড়ুক মৃদু আওয়াজ রোয়াকের দিকে। প্রমথ বিশ্বাস কান খাড়া করে শুনল কয়েক সেকেণ্ড। সাঁ করে বেরিয়ে এলো। বেঞ্চির উপর উবু হয়ে বসে ধনাই মিঞা হুঁকো টানছেন।

কদমতলায় কালার বংশী। মন উচাটন মিঞাসাহেব, আসর ভেঙে বেরিয়ে পড়েছি।

হুঁকো থেকে মুখ তুলে ধনাই একদৃষ্টে প্রমথর দিকে তাকিয়ে আছেন।

প্রমথ বলে, ওস্তাদ গুড়ুকখোর আপনি—হুঁকো নিয়ে পথে বেরিয়েছেন। ওস্তাদেই এ জিনিসের মাহাত্ম্য বোঝেন। বিড়ি বলুন চারমিনার বলুন, হুঁকোর কাছে কিছুই নয়।

পাশে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। হাত বাড়িয়ে বলে, কলকেটা দিন মিঞাভাই, দু টান টেনে যাই। জমাটি আসর ছেড়ে চলে এসেছি।

হুঁকোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বলেন, আপনাকে চিনি কিন্তু আমি।

তা হবে—

কষে একটা দম দিয়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিরুত্তাপ কণ্ঠে প্রমথ বলে, এদেশ-সেদেশ পালা গেয়ে বেড়াই। আমায় চিনবেন সে আর কত বড় কথা!

ধনাই ঘাড় নেড়ে বলেন, সে চেনা নয়। পালা গেয়ে প্রাণদান দিয়েছিলেন আপনি আমার।

সকৌতুকে প্রমথ ধনাইয়ের দিকে তাকিয়ে পড়ে: আছে বটে একটা পালা—লক্ষ্মণের শক্তিশেল। কিন্তু প্রাণদান আপনার কিসে হবে, সে তো লক্ষ্মণের।

ধনাই বলে, সেই যে সেবারে, আম্মার-বটতলায় মেলার মধ্যে—মনে পড়ছে না? জান-প্রাণ গিয়েছিল আর কি, ঠেকানোর কোন আশা ছিল না—ধাক্কা দিতে দিতে আপনি তখন মন্দিরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন।

মনে পড়ল। দুই প্রাণী—ভয়ে থরথর কাঁপছিল। এই লোক তার একটি। তখন কি তাকিয়ে দেখেছি ছাই! দেখার ফুরসত কোথা?

মেলায় পালা গাইতে গিয়েছিল। মাইনর-ইস্কুল বসিয়েছে

কালী-মন্দিরের অদূরে। ইস্কুলবাড়িতে যাত্রাওয়ালাদের বাসা। কী নিয়ে দাঙ্গা বেধে গেল। মার-ধর-কাট—দোকানপাট পুড়ে ছাই। তখন তো আখচার এমনি হত। মেলা বরবাদ। দাঙ্গায় তবু ইতি পড়ে নি—কায়দায় পেলে কোনো পক্ষ ছেড়ে কথা কইবে না।

এরা দু'জন দলছাড়া হয়ে বিপক্ষের ঘেরের মধ্যে পড়ে গেছে। তীরবেগে ছুটে এসে ইস্কুলবাড়ি ঢুকে পড়ল—যে ঘরে প্রমথ বিশ্বাসের আস্তানা।

বুঝেছে প্রমথ। গর্জে উঠল: আমার খোপে মরতে এসেছ কেন, আর জায়গা পেলে না? এ-ঘরে আরো তিন জন আছে—এসে পড়লে অন্য লোক লাগবে না, তারাই খতম করবে। তোমরা যাবে, আমিও যাবো সেই সঙ্গে। মায়ের আমি একলা ছেলে—বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি বেরোও বলছি।

ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করল। ধাক্কা দিতে দিতে কালী-মন্দিরের ভিতরে। বিগ্রহের পিছনে বেদীর আড়ালে ঠেলে দিল।

যারা তাড়া করেছে, তারাও এসে পড়ল। ঘর পুড়েছে তাদের, খুনজখম হয়েছে—আক্রোশে ফুঁসছে।

গেল কোথায়?

প্রমথ বিশ্বাস একেবারে ভিজে-বিড়ালটি: এদিকে আসে নি, ভুল দেখেছ তোমরা। আমি তো আছি সর্বক্ষণ। আসে নি।

তন্ন-তন্ন করে খুঁজল। বিশেষ করে ইস্কুলবাড়িটা—এরই কোনখানে ঘাপটি মেরে আছে। কালী-মন্দিরে ঢুকে যাবে, এতখানি সাহস ভাবতে পারা যায় না। তা-ও কী করত, বলা যায় না। ইতিমধ্যে মন্দিরের নাটমণ্ডপে গিয়ে প্রমথ বিশ্বাস গান জুড়ে দিয়েছে। নিমাই-সন্ন্যাস পালায় শচীমাতার গান। ছেলে নেই, মায়ের ব্যাকুল খোঁজাখুঁজি। খোঁজাখুঁজি মুলতুবি রেখে

লোকগুলোও গানের টানে দাঁড়িয়ে পড়ল। খানিক পরে বসে পড়ল নাটমণ্ডপের ভিতরে।

বড্ড জমেছিল সেদিন। গান গেয়ে প্রমথ বিস্তর আসর মাত করেছে, কিন্তু এদিনের বুঝি জুড়ি নেই। নিজেও মেতে গিয়েছে, একের পর এক গেয়ে যাচ্ছে বিস্তর ক্ষণ ধরে। চোখ বোজা—দু-চোখে শোকাশ্রুর ধারা। শ্রোতাদেরও চোখ ভিজে—গানের শেষে নিঃশব্দে তারা ঘরে চলল, প্রতিহিংসার কথা মনে নেই। আক্রোশ নিভে গেছে চোখের জলে। সামান্য দূরে মন্দিরগর্ভে ঐ দু'জন—প্রাণের আতঙ্ক ভুলে গিয়ে তারাও কি কেঁদেছিল সেদিন?

মাঝরাত্রে উঠে টিপিটিপি মন্দিরে ঢুকে সেই দু'জনকে প্রমথ সরিয়ে দিয়ে এলো। বেহালাদার হীরু হালদার টের পেয়েছিল—চলনের ভঙ্গিমা দেখে প্রমথর পিছু নিয়েছিল সে। লোক দুটো অন্ধকারে তো ছুটে পালাল। হীরু খপ করে হাত এঁটে ধরে প্রমথর: কী সর্বনাশ করেছিস তুই!

থতমত খেয়ে প্রমথ বলল, কেন?

মা-কালী উনি, ভারি জাগ্রত। মন্দিরে অজাত-কুজাত নিয়ে ঢোকালি—দেখিস কী হয়। মুখ দিয়ে গল-গল করে রক্ত বেরুবে, আসরে আসরে এমন আর গান গেয়ে বেড়াতে হবে না।

সেই রাতে ইস্কুলঘরে শুয়ে শুয়ে নানা ভয়ঙ্কর কাহিনী শোনাল হীরালাল। আম্মার কালীমায়ের জাগ্রত মহিমা। ভক্তজনের উপর অশেষ কৃপা—কিন্তু তিলার্ধ অনাচারে রক্ষে নেই। বলির পাঁঠা বেধে গিয়েছিল একবার, রাতটুকুও রেহাই হল না—পাঁঠা-কাটা কামারের শেষরাত্রে কলেরা।

শুনতে শুনতে প্রমথ হেন দুর্ধর্ষেরও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সকালে যাত্রাওয়ালারা চলে যাবে—প্রমথ রাতারাতি পুরুতের কাছে গিয়ে এক টাকা দক্ষিণা কবুল করল, মায়ের চরণে তার

নামে রক্তজবা দিয়ে ক্রোধ শান্তি করতে হবে। ভয়ে ভয়ে পুরুতের সঙ্গে কালী-মন্দিরে ঢুকল। রক্তজবা পড়ে নি এখনো, মা-জননী তবু যে ভারি প্রসন্ন। কাল দেখেছে, আবার এখন এই দেখছে। পাষাণ-বিগ্রহও বুঝি প্রমথর গানে বিভোর হয়েছিলেন, অনাচার ধরতে পারেন নি। গায়ককে কাছে পেয়ে মা-কালীর দু-চোখে হাসি উছলে পড়ছে, ঐ দেখ।

দুই বিপন্নের একটি নাকি এই ধনাই মিঞা। বিস্তর কাল হয়ে গেল, চেহারা বিলকুল বদলে গেছে—প্রমথ চিনতে পারে নি। প্রাণদাতাকে ধনাই চিনেছে—চিনতে পেরে গদ-গদ।

॥ বত্রিশ ॥

তারাফুলি তো কথার ফুলঝুরি একেবারে। ফুল্লরাকে জড়িয়ে ধরে অবিরত বকবক করছে। বাইরের দিকে একবার উঁকি দিয়ে বলল, মেয়েলোক আর কেউ আসবে বলে মনে হচ্ছে না। লোভ অনেকের—এ যাবে সে যাবে, বলেও থাকে অনেকে। শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। বলে, আরও দিন কতক যাক—ভাল করে ঠাণ্ডা হোক চারদিকে। গরম কবে হল সে তো জানিনে, যে ঠাণ্ডা হতে সময় দিতে হবে। ফৌজ এসেছে—বলি ফৌজ বুঝি মানুষ নয়, পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হয় নি তাদের অঞ্চলে—চোখ-কান নেই, লোকের দুঃখকষ্ট বুঝি তারা টের পাচ্ছে না!

উচ্ছ্বাস থামিয়ে বলল, তুমি এসে দোসর পেয়ে গেলাম ভাই। বেঁচে গেছি। রাত দুপুরে একলা মেয়ে মাঠ ভেঙে বাঁই-বাঁই করে ছুটছি—সে বড় বিশ্রী।

ফুল্লরা অবাক হয়ে বলে, ছুটতে হবে মাঠে?

তারাফুলি বলে যাচ্ছে, তেপান্তরের মাঠ। জনমানব নেই কোনদিকে, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তুমি যদি না আসতে, মেয়েলোক বলতে একলা আমি। ডাইনে-বাঁয়ে আগে-পিছে পুরুষের দঙ্গল। ছুটেছি যেন ভূতপেত্নীর দল একটা—কেউ কারো মুখ দেখতে পাইনে।

খিলখিল করে উচ্ছল হাসি হেসে উঠল। বলে, আনকোরা তুমি ভাই একেবারে। হুমহাম করে ষোল-বেহারার পালকি তোমায় মাঠ-পারে নিয়ে তুলবে, তাই বোধহয় ভেবে এসেছ। আজগুবি তা বলছিনে—মা-দিদিমাদের আমলে হয়েও এসেছে তাই। এখন আজাদির দিন। মহাপ্রাণ ইংরেজ আমাদের তা-বড় তা-বড় নেতাদের সঙ্গে শলা করে তাঁদের জোব্বার পকেটে আজাদি

ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। দেশ জুড়ে সেই থেকে চোরাগোপ্তা কারবার। যেদিকে তাকাবে দুর্ভোগ মানুষের।

ফুল্লরা একটুও দমে নি। বলে, আমার তো কানে শুনেই মজা লাগছে। পালকির মধ্যে পুঁটলি হয়ে না থেকে তেপান্তর মাঠে ছুটোছুটি রাত্রিবেলা—

তারাফুলি বলে, শিশির পড়ে মাঠের শক্ত-মাটি পিছল হয়ে আছে—পড়ে গেলাম ধরো পা হড়কে। হি-হি-হি। হ্যাঁ ভাই, নাম কি তোমার? পড়ে গিয়ে—অন্ধকারে চোখে তো দেখছিনে—নাম ধরে তখন ডাকতে হবে। আমার নাম তারাফুলি—তারাফুলি বেগম। পড়ে গিয়ে 'ফুলি' 'ফুলি' করে ডেকো।

আমি ফুল্লরা—

ও মা, ফুল্লরা তো তোমার ডাকনামই বা ফুলি হবে না কেন? এখন থেকে তাই। এক-নামের মিতা আমরা।

আলিঙ্গনের মধ্যে ফুল্লরা আটক তো ছিলই, মিতার পরিচয়-স্বরূপ দুই গালে এবারে সশব্দ দুই চুমু। পাগল ঠিক মেয়েটা! চুমুতে শেষ নয়—শূন্যে আড়কোলা করে সারা উঠোন এক-পাক নেচে এলো। মা গো মা, শক্তিই বা ধরে কী প্রচণ্ড!

নেচেকুঁদে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে ফুলি বলে, ঐ যে ক'দিন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা হয়েছিল, সেই থেকে ঝামেলা। আগে ফৌজ ছিল না, অন্ধকার লাগত না, ছুটতে হত না—দিনে রাতে যখন খুশি হেলে-দুলে গল্পগাছা করতে করতে এপার-ওপার করতাম।

ফুল্লরা বলতে যাচ্ছিল, আপনি বুঝি—

পাগলি যেন ক্ষেপে যায়: দেবো এক চাঁটি। 'তুমি' ডাকছি, তার জবাবে 'আপনি' 'হুজুর'। কেন রে, পাহাড়-পর্বতের বয়স বুঝি আমার—আর তুমি কচিখুকি! 'তুমি' বলতে হবে। বলো তাই—

একগাল হেসে ফুল্লরা বলে, তুমি।

'তুমি' 'তুমি' চলুক আপাতত—

ডান হাত ঘুরিয়ে তারাফুলি হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলে, চলবে এই রকম ধরো আটটা অবধি। 'তুমি' তার মধ্যে পুরোপুরি রপ্ত হয়ে যাবে। পরের ধাপ আটটার পর থেকে—'তুই'। আমি 'তুই' বলব তোমায়, তুমিও 'তুই' বলবে। বুঝলে? ভুল হলে থাবড়া খাবে কি রকম, তখন বুঝবে। কিন্তু এটা কী হল ভাই, একছিটে 'তুমি' বলেই চুপ। 'আপনি'র সঙ্গে আরও কত সমস্ত বলতে যাচ্ছিলে—বলো এইবারে শুনি।

ফুল্লরা বলে, খুব বুঝি এপার-ওপার করে বেড়াও?

অন্য সকলের এপার-ওপার, আমার এপাড়া-ওপাড়া। মামার-বাড়ি ছিল ওপার, হিন্দুস্থানের ভিতরে—বর্ডারের কাছাকাছি। ছোট বয়স থেকে যাতায়াত। অঢেল চেনাজানা সেই বাবদে, অগুন্তি আপনলোক। মামারা বিনিময় করে চুকিয়ে-বুকিয়ে এসেছেন। আমার যাতায়াত তা বলে বন্ধ হবার নয়। মামার-বাড়ি গিয়ে গিয়ে আরও কত বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক জমে গেছে। মামারা না-ই রইল, তারা সব আছে। পালপার্বণ বিয়েথাওয়া যাত্রা-জারি হরবখত লেগে আছে। মন কেমন করে ওঠে এক-এক সময়—পার হয়ে গিয়ে খানিকটা গুলতানি করে আসি।

ফুল্লরা বলে, কিন্তু রাজ্য তো দুটো। কথায় কথায় পার হও কেমন করে?

আইন মতে দুই রাজ্যই বটে। কে তা বেকবুল যাবে। কিন্তু দিল্লি-পিণ্ডির কড়া কড়া আইন খাল-বিল পাহাড়-পর্বত মাঠ-জঙ্গল পার হয়ে এদ্দুর ঠিক মতো পৌঁছয় নি কখনো। এপার আর ওপার—তফাতটা এই হালে কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে। লড়াইয়ের সময় থেকে। জিনিসটা এতখানি গোলমেলে, আঠারো বছরের আজাদির মধ্যে ক'জনে তলিয়ে ভেবেছে?

বিজ্ঞান-জগতে বিপ্লব ঘটে গেছে। কথাটা বড্ড পুরানো,

বিস্তর শোনা। দূরত্বের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের অভিযান। পথের দূরত্ব, আর মনের দূরত্ব। দুনিয়ার কোন ঠাঁই অজানা নেই এখন, মানুষের মনোভূমিও নেই।

কূটনীতি কিন্তু বিজ্ঞানকে বানচাল করে দিল—বিজ্ঞান তারই দাসত্ব করছে। কোথায় মানুষ হবে বিশ্বনাগরিক, এদেশ-ওদেশ সীমানা-চিহ্নগুলো মুছে দেবে ম্যাপের উপর থেকে—হচ্ছে ঠিক বিপরীত। এক-ভিয়েতনামের উপর খাঁড়ার মতন লাইন কেটে দুই-ভিয়েতনাম বানিয়েছে। তেমনি দুই-কোরিয়া। ঐতিহ্যময় এমন যে জর্মনি দেশ, দুনিয়াকে বারম্বার কাঁপিয়ে দিয়েছে—সে-ও আজ দুইখণ্ডে বিচ্ছিন্ন হয়ে ম্রিয়মাণ। সকল জর্মনের প্রাণের অধিক প্রিয় বার্লিন—শহরটার উপরেও পাকা-পাঁচিল তুলে পৃথক করে দিয়েছে। বাপ মরার পর ছেলেরা ভদ্রাসনের মাঝে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি। পূর্ব-বার্লিন আর পশ্চিম-বার্লিন। খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়েও তো সোয়াস্তি নেই, ধুন্দুমার উভয় তরফে। কূটনীতির বাহাদুরিই এই—এর বিপক্ষে ওকে লাগিয়ে দেওয়া। সমৃদ্ধিবান সুখী কেউ না হতে পারে। তা হলে তো মাথা খাড়া করে দাঁড়াবে, পদতলে পড়ে 'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' করবে না। মাতব্বররা কখনো একে কোল দিচ্ছে, কখনো ওকে। আহা, কমজোরি ভাবছ বুঝি নিজেকে—মাভৈঃ। দিচ্ছি অস্ত্র-সাহায্য, নিয়ে নাও। সাহায্য মানে বিক্রি। এমনি প্যাঁচে ফেলেছে, কিনতে পেয়ে আপনি কৃতকৃতার্থ। ক্ষুধার অন্ন নির্বিকারে বিক্রি করে দামের জোগাড় করছেন। অস্ত্র কিনে কিনে ডাঁই করলেন কাল অবধি যার সঙ্গে একাত্ম ছিলেন তারই মুণ্ডপাতের ব্যবস্থায়। অপর পক্ষ চেঁচামেচি লাগিয়েছে: আমরা যে নেমে যাচ্ছি এদিকে। কৃপাবানরা অভয় দেয়: কুছ পরোয়া নেই। কিনুকগে যত খুশি। অস্ত্রশস্ত্র ওদের পলকে লোহার পিণ্ড বানিয়ে দেবে, এমনি চিজ আছে আমাদের। টাকা জোগাড় করে আনো।

অস্ত্রের বাবদ ধড়িবাজ জাতগুলোর পায়ে যথাসর্বস্ব বিকিয়ে দেবার পাল্লাপাল্লি লেগে গেছে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। বীরেশ্বর ঘর থেকে বাইরে এলেন। উঠানে পায়চারি করছেন। মধুর হাওয়া দিয়েছে। আকাশে চাঁদ। 'আমার সোনার-বাংলা, তোমায় আমি ভালবাসি—' কত ছেলের মুখে শুনেছেন এই গান—কী আকুল-করা সুর। লাইন টেনে আমার সোনার-বাংলাকে ওরা চিরে ফেলেছে। ঘা দগদগ করছে। বর্ডার-লাইন আনোয়ারের এই ঘাট-অফিসের সামান্য দূর দিয়ে। অলঙ্ঘ্য গিরি-সমুদ্র-নদী নয়—এমন কি লাফিয়ে পার-হওয়া যায়, এমনি খালও নেই সীমানা-চিহ্ন রূপে। ইতস্তত পিলার গেঁথে দিয়েছে। একই ক্ষেতখামার ফলসা-বাগান পুকুর-বাড়ি ভেদ করে সে-লাইন চলে গেছে। কারো পুকুরের সিকিখানা পাকিস্তানে বাকিটা ভারতে, কারো রান্নাঘরটা ভারতে শোবার-ঘর পাকিস্তানে—আগে হাজার হাজার ক্ষেত্রে এমনি দেখা যেতো। মানুষ তারপরে সরিয়ে ঘুরিয়ে ঘর বেঁধে নিয়েছে, পুকুর খানিক-খানিক ভরাট করে ফেলেছে।

ক'দিনের কথা। কুড়ি বছরও হয় নি এখনো। আঘাত এমন জোরে আর এত আকস্মিক ভাবে এসে পড়ল, জাতির আত্মচেতনা অসাড় হয়ে রইল কিছুকাল। সরল নিরক্ষর মানুষেরা পরম বিশ্বাসে যাঁদের নামে জকার দিয়ে বেড়িয়েছে, বিশ্বাসের মর্যাদা তাঁরা রাখেন নি—সাদা-কথায় আজকে বলবার দিন। কত বড় সর্বনাশ হয়েছে, দিনকে-দিন সেই জিনিস প্রকট হয়ে পড়ছে।

দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের শেষে মসনদ প্রায় হাতের নাগালে এসে গেল। এক লম্ফে উঠে বসে বাদশা বনে যাই, নইলে আর কোন্ হতভাগা কোথা থেকে এসে দখল নিয়ে নেবে—লোভ আর লালসা সামলানো সত্যি সত্যি কঠিন। দেশ-খণ্ডন বিনে

সিভিল-ওয়ার হবে নাকি। সে নাকি ভয়ানক ব্যাপার—দেশের লোক মারা পড়ে। অতএব নিখিল-ভারতবর্ষের ঘাড়ের উপর মায়ো কোপ। ভানুমতীর খেল—এক-দেশ গিয়ে দুই-দেশ: পাকিস্তান আর ভারত। চরম প্রতিশোধ নিয়ে ইংরেজ বিদায় হল। ভূত কাঁধ থেকে নেমে যাওয়ার সময় একখানা বড়-ডাল ভেঙে চলে যায়, জনশ্রুতি এই প্রকার। গোটা গাছই অচিরে উপড়ে পড়বে, বিদায় নেবার সময় ইংরেজ তেমনি ব্যবস্থা করে গেছে। ভাইসরয়েরা শত হলেও শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষ—এত বড় সর্বনাশের নিমিত্তভাগী হতে লজ্জা-লজ্জা করছিল বোধহয়। ওয়াভেল তো সোজাসুজি গররাজি: আমার দ্বারা হবে না। এবং পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে উড়ে গিয়ে দেশে উঠলেন। কাজ চুকিয়ে-বুকিয়ে মাউণ্টব্যাটেনও কৈফিয়ৎ দিয়ে লজ্জা ঢাকছেন: জাহাজি সৈনিক আমি, রাজনীতিক ঘোর-প্যাঁচের কী বুঝি! ওঁদের কর্তারাই মাথা-ভাঙাভাঙি লাগালেন—দেশভাগ ছাড়া উপায়ই বা কী ছিল তখন?

আরও বললেন, ক্রীপস-প্রস্তাব বাতিল কেন হল? তাতে তো দেশ-ভাগের কথা ছিল না—অনেক ভাল ছিল সে জিনিস।

কংগ্রেস লীগ উভয়েই মোটামুটি রাজি, কিছু রদবদলের পর নিয়ে নেওয়া যাক তবে ক্রীপস-প্রস্তাব। শেষ মুহূর্তে ভেস্তে গেল। আমাদের মহামান্য নেতাটি বক্তৃতা পেলে আর কিছু চান না—এবং বক্তৃতায় কী বলে যাচ্ছেন, তা-ও হুঁশ থাকে না অনেক সময়। বম্বের এক কনফারেন্সে বলে বসলেন: নিলেই বা কী, কনস্টিট্যুয়েণ্ট এসেম্বলি আছে না এর পরে? জিন্নাহ্‌র টনক নড়ল: বটে রে, সংখ্যার জোরে কনস্টিট্যুয়েণ্ট এসেম্বলিতে ওলটপালট করে দেবে? বিগড়ে গেলেন তিনি: না, দেশই কাটতে হবে—তার কমে শোনাশুনি নেই।

সেই কর্তারাই উল্টে বাহাদুরি নিচ্ছেন: বিনি-রক্তপাতের স্বাধীনতা—দুনিয়া অতঃপর এই পথই আদর্শ বলে মেনে নেবে।

ছনিয়ার সে দুর্মতি কখনই হবে না আঠারো বছর-ব্যাপী আমাদের খোয়ার দেখবার পর। রক্তপাত হয় নি—কত বড় ভাঁওতাবাজি, জানতে কারো আজ বাকি নেই। নাটের গুরু যারা, তাদেরই একজন চার্চিল সাহেবের হিসাব : অন্তত ছয় লক্ষ মানুষ দাঙ্গায় প্রাণ দিয়েছে। এর সিকি-পরিমাণও যদি সহজ পথে সাম্রাজ্যবাদী বিতাড়নে প্রাণ দিতে পারত, স্বাধীনতা ভিন্ন চেহারা নিত। নেতাজী আহ্বান দিয়েছিলেন : আমায় রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দিচ্ছি। ধারে-কাছে যে-সব ভারতীয় ছিল, বিদ্যুৎ-স্পর্শ পেয়েছিল তারা অন্তরে—নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিল। সহস্র বাধা পেরিয়ে সে আহ্বান সুদূরবর্তী আমাদের কানে কতটুকুই-বা পৌঁছল! যুবশক্তি তবু ক্ষেপে উঠেছিল—অহিংসার দড়াদড়িতে বেঁধে-ছেঁদে এবং কানে রামধুন-গীতি শুনিয়ে কোন রকমে সামলানো হল তাদের। তেড়েফুঁড়ে জওহরলাল তো নেতাজির সঙ্গে সম্মুখ-সমরে উদ্যত। বক্তৃতার সময় নয়, অস্ত্রশস্ত্রের সময়। দৃশ্যটা উপভোগ্য হত সন্দেহ নেই, ততদূর অবধি সত্যি সত্যি যদি গড়াত।

চিরকালের মাস্টার-মানুষ বীরেশ্বর—ইতিহাসের পড়ুয়া। যে জিনিস নিয়ে ভারত-খণ্ডন, ছনিয়ার ইতিহাসে কোথাও তার নজির পাওয়া যায় না। জাত-বেজাত আছে সকল দেশে, এবং সকল সম্প্রদায়ের ভিতরেই। শুধু হিন্দু-মুসলমান কেন, গাঁ-গ্রামে আমাদের ছত্রিশ জেতের ঘরবসত। চিরকাল ধরে আছে। বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া, শেখপাড়া, বস্তিপাড়া, জোলাপাড়া—এমনি ভাবে আছে সব পাশাপাশি পৃথক আচার-বিচার পূজো-নামাজ নিয়ে।

আর বীরেশ্বর যাদের পড়িয়েছেন, তাদের ভিতরে তা-ও ছিল না। তারা হিন্দু ছিল না, মুসলমানও নয়—বলতে পারেন বড়জোর বাঙালি-ছাত্র। ছাত্রসমাজ থেকে জাত-বেজাত বিদায় নিচ্ছিল প্রায় সেই স্বদেশি আমল থেকে। ধরুন, বিয়েথাওয়া কি পালপার্বণে

কোনো এক বাড়ি ছাত্রদের নেমন্তন্ন। খেতে ডাকছে : কায়স্থরা বসে যান দক্ষিণের বারান্দায়, ব্রাহ্মণরা দরদালানে, মুসলমানরা পুবের-বারান্দায়। কই, আপনারা কেউ ওঠেন না যে ?

ছেলেরা একটি জায়গা নিয়ে একত্র বসেছে। গুলতানি করছে। তারা বলল, ওসব ছাড়াও আমাদের ভিন্ন এক জাত। ছাত্র। ওঁদের সব হয়ে যাক—আমাদের তখন ঠাঁই হবে, সকলে একসঙ্গে বসে খাবো।

শিক্ষা ছড়াচ্ছে দিনকে-দিন। ছাত্র অগুণতি—বছরের পর বছর দুরন্ত বেগে বাড়ছে। পুরানো ছাত্রেরা পড়াশুনো চুকিয়ে সংসারে ঢুকেছে, নতুনেরা এসে দলে দলে ইস্কুলে-কলেজে ঢুকছে। যত্রতত্র ইস্কুল-কলেজ খোলা হচ্ছে, ছাত্র ভর্তির তবু জায়গা পাওয়া দায়। কী মুশকিল, সবই যে একাকার হয়ে যায়! জাতের বুজরুকি ক'দিন আর টিকিয়ে রাখা যাবে হেন অবস্থায় ? মুসলমান আর হিন্দু তফাতটা জিইয়ে রাখায় যাদের স্বার্থ, উঠেপড়ে লাগল তারা। বিস্তর ক্ষমতা তাদের, অঢেল ঐশ্বর্য, ক্ষুরধার কূটবুদ্ধি। ফলে দেশ-বিভাগ— মুসলমানের নামে টুকরো কেটে ফেলা হল ভারতবর্ষ থেকে। আরও লাখ লাখ মুসলমান যে ভারতে রইলেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিন্তু নিশ্চুপ। প্রগতির বড়াই করে মানুষে, অথচ একালেই এমনি-সব বিদঘুটে ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে।

একমাত্র ছেলে নকুলেশ্বর, বাপের মতন মাস্টার সে-ও। ধরণীর গুণী-জ্ঞানীরা মানুষকে উঁচুতে তোলবার জন্য যে-সব আয়োজন রেখেছেন, তারই অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন নিয়ে ছিল সে। নির্বিরোধী সেই যুবাটিও স্বাধীনতার বলি। বলি নিতান্তই আক্ষরিক অর্থে— কালীপূজোর সময় পাঁঠার ঘাড়ে খাঁড়ার কোপ মারে, অবিকল তেমনি ব্যাপারই ঘটেছিল সন্দেহ নেই। হামেশাই ঘটেছে, কতজনে স্বচক্ষে দেখেছেন। হিন্দুরা ফলাও করে মুসলমানি অত্যাচারের নারকীয় বর্ণনা দিয়েছেন, মুসলমানরাও পাল্টা জাত-শয়তান বলেছেন হিন্দুদের।

জ্যোৎস্নার আলোর মধ্যে উঠানে একাকী বীরেশ্বর পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। যে-লাইন কেটে ওরা দেশ-ভাগ করেছে তারই উপরে—আর বোধহয় পঞ্চাশটা হাত পশ্চিমে গেলেই হিন্দুস্থানে পা পড়ে যাবে। ডাক্তার রহমানকে ভাবছেন তিনি। আজকে তিনি নেই। তাঁর বড় সাধ ছিল, আদমদীঘির কবরখানায় ছায়াময় শীতল বাঁশঝাড়ের নিচে বাপ-পিতামহের পাশাপাশি আরামের ঘুম ঘুমিয়ে থাকবেন। সে-সাধ মিটল না। মনে বড় ক্ষোভ নিয়ে মাটির তলে গেছেন তিনি।

ছেলে নকুলেশ্বরও আজ মনের মাঝে বড্ড সঞ্চরণ করছে। বিপদ দেখে বাপের কাছে ছুটে আসছিল নবীনা স্ত্রীকে নিয়ে। কোথায় নিয়ে গেল তাকে, কী ঘটল—পরের বৃত্তান্তের কোনদিন আর হদিস হবে না। ছোরার কোপ অথবা বন্দুকের গুলি নিরপরাধ অধ্যাপকের উপর এসে পড়ল—স্বার্থান্ধ মুষ্টিমেয়ের বিরুদ্ধে উৎকট ঘৃণা তখন সে প্রকাশ করে যেতে পারে নি। কিন্তু খানিকটা বীরেশ্বর দেখতে পেয়েছিলেন পুত্রবধূ লীলার মধ্যে।

ভ্রান্ত নেতৃত্ব লোভী নেতৃত্ব আর ভণ্ড নেতৃত্বের মিলনে কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে, আজ আঠারো বছর অতীত হবার পরে হিন্দু হোক মুসলমান হোক বৌদ্ধ হোক খৃস্টান হোক কারো কাছে অস্পষ্ট নেই। গান্ধিজীর নিজেরও ভবিষ্যদ্বাণী: যে মূল্যের বিনিময়ে স্বাধীনতা নিচ্ছি, তাতে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। কিন্তু সতর্কবাণীই শুধু—শুধুমাত্র মুখের কথা। প্রতিকার কি পেলাম? ক্ষমতার জবরদস্তিতে স্বভাবের বিধিনিয়ম পাল্টে দিল—ইতিহাসের গতি বাঁধে আটক হয়ে গেল। শুনেছিলাম বটে গান্ধিজীর কঠিন সঙ্কল্প-ঘোষণা: দেশ-বিভাগ যদি হয়, আমারই মৃতদেহের উপর দিয়ে তা ঘটবে। আহিমাচল-কুমারিকার প্রত্যাশাও ছিল তাই—গান্ধিজীর দৃঢ়তার কাছে চক্রান্ত বিচূর্ণিত হবে। মসনদ অত্যাসন্ন দেখে মাথা ঘুরে যাচ্ছে কারো কারো, তলিয়ে দেখবার শক্তি

হারাচ্ছে। কিন্তু অর্ধনগ্ন ফকির কার পরোয়া করেন? মওলানা আজাদও তাই ভেবেছিলেন। পাঞ্জাব-বিভাগের প্রস্তাব ইতিমধ্যে পাশ করে নিয়েছে গান্ধিজীর অনুপস্থিতিতে। করুক গে—দিল্লিতে ওয়ার্কিং-কমিটির যে মিটিং, সেখানে গান্ধিজী সশরীরে হাজির থাকছেন। ভাগাভাগি বানচাল হবে সেখানে। মওলানা সেই বিশ্বাস নিয়ে আছেন। কিন্তু বিমূঢ় হয়ে দেখলেন, জওহরলাল আর প্যাটেলের অপরূপ মায়ামন্ত্রে গান্ধিজী বোবা বনে গেছেন। মনোবেদনা গোপন রাখেন নি আজাদ, কেতাবে লিখেছেন।

রাজধানী দিল্লিতে ওয়ার্কিং-কমিটি নীতিগতভাবে দেশ-খণ্ডন মেনে নিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নিয়ে জুয়াখেলা—এত বড় কাণ্ডের মধ্যে গান্ধিজী বোবা দর্শক মাত্র। শ্মশানের কর্ম-শেষে শবযাত্রীরা বিষণ্ণমুখে থপথপ করে পা ফেলে ঘরে ফিরে যায়, গান্ধিজী তেমনিভাবে ভাঙ্গি-কলোনিতে ফিরলেন। কলোনিতে বসে আছেন আবদুল গফফর খাঁ, সীমান্ত-গান্ধি যাঁকে লোকে বলত। রণদক্ষ বীর পাঠানসন্তান, জন্মসূত্রে যাঁদের হাতে-বন্দুক, গফফর খাঁর নেতৃত্বে তাঁরাই বন্দুক বাতিল করে দিয়ে খুদা-ই-খিদমতগার। শতেক দুঃখ-লাঞ্ছনা সয়েও তাঁরা গান্ধিজী ও তাঁর অহিংস-সংগ্রামের জুড়িদার। পাকিস্তান বনাম অখণ্ড-ভারত ইস্যু নিয়ে নির্বাচনের লড়ালড়ি। নির্বাচনের বিজয়ে দুনিয়াময় জেনেছে, পাঠানরা দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে। তবু ভেদপন্থীদের হাড়িকাঠে বলি দেওয়া হল তাঁদের। মসনদ-লাভের লালসায় একবার পরামর্শ হল না তাঁদের সঙ্গে। সীমান্ত-গান্ধি বললেন: So Mahatmaji, you will henceforth regard us as Pakistani aliens, will you not? A terrible fate awaits us in the N. W. F. Province. We are thrown to the wolves. নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দিলে আমাদের। সাংঘাতিক ভবিষ্যৎ সামনে, বুঝতে পারছি।

সর্বসমর্পিত সেই পাঠানদের ভবিষ্যৎ কত বড় সাংঘাতিক,

তখনো কারো ঠিকমত ধারণায় ছিল না। মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে খিদমতগারেরা শোভাযাত্রা করে মসজিদে চলেছেন—বৃষ্টিধারার মতো মেশিনগানের গুলি। পথের উপর কয়েক-শ মানুষ লুটিয়ে পড়লেন। তাতেই শেষ নয়—জীবন্তদের উলঙ্গ করে সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়ে দাড়ি-গোঁফ অর্ধেক কামিয়ে গাধার পিঠে শহর ঘোরানো হল—গায়ে লিখে দিয়েছে 'হিন্দু'। যে-হেতু হিন্দু-মুসলমান আলাদা দুই জাতি মেনে নিয়ে দেশ-ভাগে রাজি হন নি তাঁরা। ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, হাজারো রকমের নির্যাতন। সেই সঙ্গে আপোসেরও লোভনীয় প্রস্তাব বারম্বার: চিরকাল ওদের সঙ্গে পাশাপাশি লড়লে —দেখছ তো, কেমন স্বচ্ছন্দে তারা ভারতের মসনদ আলো করে বসেছে! দিল্লি-প্রাসাদকূটে দিনান্তে একটি নিশ্বাসও পড়ে না অতীত সহযাত্রীদের নামে। আর কেন? মত পালটে হাত রাখো আমাদের হাতে—রাজা উজির হয়ে আরামে বুড়োবয়সের দিন কাটুক।

মহাত্মাজী, নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দিলে আমাদের?

মহাত্মাজী বলেছিলেন, খুদা-ই-খিদমতগারের উপর নির্যাতন হলে তাদের সাহায্য করা ভারত প্রতিজ্ঞা হিসাবে গণ্য করবে।

গফফর খাঁ'র ছেলে আবদুল গনি তখন শুধালেন: আপনার অহিংসা-ব্রতের তা হলে কী পরিণাম হবে?

গান্ধিজী বললেন, আমি অহিংস, তা বলে সরকার তো নয়!

(সে আর বলতে! কোন মূঢ় সন্দেহ করবে? এবং গান্ধিজী বিহনে তাঁর প্রতিশ্রুতিরও থোড়াই কেয়ার করে সেই সরকার।)

স্বাধীনতার আঠার বছরের মধ্যে পনের বছরই গফফর খাঁ জেলে। নির্জন-সেলেই বেশির ভাগ। অপমান-লাঞ্ছনা তো নিত্যিদিনের ডাল-ভাত। জীবনও বারম্বার বিপন্ন হয়েছে। আজকে তিনি কাবুলে স্বেচ্ছানির্বাসনে। আর সেই খুদা-ই-খিদমতগার পাঠানদের সর্বস্ব কেড়ে-কুড়ে নিয়েছে, অনেকেই পথের ভিখারি হয়েছেন। খুদা প্রতিকার করলেন না, গান্ধী-শিষ্যেরাও না।

বৃদ্ধ বীরেশ্বর পায়চারি করছেন পাক-ভারতের বর্ডারের উপর আনোয়ারের উঠানে। চিরকেলে গান্ধিভক্ত মানুষ তিনি, আজকেও গান্ধি-বাণী মনে আসছে। গান্ধিজী বলেছিলেন, অবস্থা বুঝে শিগগিরই আমি সীমান্ত-প্রদেশে যাবো ভাবছি। তার জন্যে পাশপোর্ট নেবো না, দেশ-বিভাগে আমি বিশ্বাস করিনে।

পাকে-চক্রে বীরেশ্বরও তাই। সাধু সত্যসন্ধ মানুষ—একমাত্র ছেলেকে নৃশংসভাবে হত্যা করল, তবু মুসড়ে পড়েন নি। নাতনি নিয়ে সেই মানুষ আজ বিনি-পাশপোর্টে ব্লাকের পথে চললেন। সেজন্য এতটুকু দ্বিধা নেই—জিনিসটা অসাধু, মনেও তো আসছে না একবার।

গান্ধিজী বলেছিলেন, পাকিস্তানের জন্ম হলে পাকিস্তানই হবে আমার জায়গা।

হত হয়তো একটা-কিছু। কিন্তু গান্ধিজীরই প্রাণ গেল। দেশ-বিভাগ না হলে গান্ধি-হত্যা ঘটত কিনা, কে জানে! গান্ধিজীও দেশ-খণ্ডনের বলি।

গান্ধির কথা বীরেশ্বর বেদবাক্যের মতন ভাবতেন। সর্বজনা বীরেশ্বরকে ভালবাসত, ভক্তি করত। তাহলেও চরকা ও অহিংস-সংগ্রামের কথা যখন বলতেন, ছেলেরা মুখ ঘোরাত। মুখের উপর সুস্পষ্ট অবিশ্বাস ও বিদ্রূপের হাসি লক্ষ্য করতেন তিনি। রামধুন গেয়ে ও চুটিয়ে চরকা কেটে ইংরেজ তাড়ানো যাবে, বাংলার ছেলে-মেয়েদের উপলব্ধি করানো কঠিন বটে। পলিসি হিসাবে অনেকেই অহিংসার স্তুতি করেছি, কিন্তু মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিল নিতান্তই একটি-দুটি। ইতিহাসের অধ্যাপক বীরেশ্বর তাদের মধ্যে একজন। কত জনে কত বিরুদ্ধ-কথা বলেছে—মানবেন্দ্র রায়ের প্রজ্ঞাদীপ্ত শাণিত তর্ক: গান্ধিজী ভুলের পর ভুল করে চলেছেন। দেশবন্ধুর কথা: আরম্ভটা খাসা, শেষ পর্যায়ে এসে উনি এলিয়ে পড়েন। বীরেশ্বর দৃকপাত করেন নি, মনে মনে নিজের মতন করে বরাবর কৈফিয়ৎ

খাড়া করে এসেছেন। সুভাষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ভিতর মাথা গলিয়ে গান্ধিজী যখন বললেন, সুভাষের জয় আমার পরাজয়—তখন বীরেশ্বরের মন দুলেছিল একবার: দলবাজি আর প্রতিপত্তি-কাড়াকাড়ির মধ্যে মহাত্মাজী কেন? সেই মুহূর্তে সামলে নিলেন: ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা কী বুঝি, সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চয় ওঁরই পথে। মহাত্মার প্রতিশ্রুতি, ভারত-ভঙ্গের আয়োজন রুখবেন তিনিই—তাঁর শবদেহের উপর ছাড়া খণ্ডন হতে পারবে না। তবু মিটিংয়ের ভিতর খণ্ডনের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল, এবং মহাত্মা সশরীরে তথায় উপস্থিত। মৌনদিবস নয়, তবু তিনি সর্বক্ষণ নির্বাক পুত্তলিকাবৎ। শবদেহের উপর দিয়ে—ইত্যাদি ইত্যাদি যেসব অলক্ষুণে বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সেসব কিছুই ঘটে নি। দেশবিভাগের পরেও বক্তৃতা কাজকর্ম ছাগদুগ্ধ-সেবন ইত্যাদি যথাপূর্ব চলেছিল। এবং নাথুরাম গডসেরা ক্ষিপ্ত না হয়ে উঠলে, মহাত্মা নিজ পরমায়ু সম্বন্ধে যে-কথা বলতেন—একশ-পঁচিশ বছরই টিকে থাকতেন তিনি।

পায়চারি করতে করতে বৃদ্ধ অধ্যাপকের মন আজ বড় উদ্বেল হয়ে উঠল। প্রত্যাশার অপমৃত্যু। কিশোরকাল থেকে উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন দেখে এসেছি, জীবনের শেষ অধ্যায়ে তার এই পরিণতি! তা হোক, তা হোক—আশা ছেড়ো না। মৃত্যু-সময়েও ভবিষ্যতে ভরসা রেখে চোখ বুজব। নইলে তো জীবনধারণের মানে থাকে না—এই মুহূর্তেই আত্মঘাতী হতে হয়। আমাদের জীবনকালে না-ই যদি পেলাম, উত্তরপুরুষেরা পাবে। পুরাণে জানি, তপঃসিদ্ধির ঠিক পূর্বক্ষণে কখনো ডাকিনী-যোগিনী কখনো বা উর্বশী-কিন্নরী সামনে এসে নৃত্য জুড়ে দেয়। সেই কাণ্ডই তো চতুর্দিকে। মাথা ঠাণ্ডা রাখো তরুণ-তরুণীরা, রাত্রির শেষ প্রহরের ঘন তমিস্রা। সূর্য ওঠার বিলম্ব নেই বেশি।

কলমের এক খোঁচায় বানানো কৃত্রিম বর্ডারের উপর ঘুরতে ঘুরতে অনেকদিন পরে আজ বৃদ্ধের পুত্রশোক উথলে উঠল। অনুযোগ গান্ধিজীর উদ্দেশে—শেষ বয়সে এসে চিরকালের আস্থা ভুলে যাচ্ছে যেন। দরিদ্র নিরক্ষর নিষ্পাপ সরলবিশ্বাসী কোটি কোটি মানুষ, গান্ধিজী, তোমাকেই তাদের একান্ত আপন বলে জানত। তোমার একটি কথায় উদ্বেল হত জনসমুদ্র, একটি কথায় আবার দীঘিজলের মতন নিস্তরঙ্গ নিথর হয়ে পড়ত। তোমারও বড় গরব তাই নিয়ে—রাউণ্ড-টেবল কনফারেন্সে কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হয়ে বিলাতে গেলে। গুঞ্জন তখনই উঠেছিল—জগতের সামনে মহাত্মাজী দেখাবেন, কোটি কোটি মূক জনসাধারণের মুখপাত্র আমি—সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমিই একমাত্র। কিন্তু অর্ধনগ্ন ফকিরের কথা কেউ কানে নিল না, হতাশ হয়ে রিক্ত-ঝুলি নিয়ে ফিরে এলেন। এবং ভারতের উপর সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডনীতি দ্বিগুণ তেজে চলল। ভারতবর্ষের কঠিনতম সঙ্কটের মুখে দুর্বলতায় পেয়ে বসল—ক্ষমতালোভীদের কাছে মহাত্মাজী আত্মসমর্পণ করলেন। নেতামশায়দের চিরকাল তড়পানি শুনে এসেছি—জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতি-তত্ত্ব মানিনে আমরা। ওয়ার্কিং-কমিটিতে নীতিগতভাবে বিভেদ-প্রস্তাব পাশ করে নিলেন, তখনো ভদ্রলোকদের সেই এককথা—দ্বিজাতি মানিনে বটে, তথাপি হিন্দু-মুসলমানের নিরিখে আলবত দেশ দুইখণ্ড হবে। কোন্ তন্ত্রের নীতি জানিনে বাবা—একেও নীতি বলবেন তো দুর্নীতি কিসে ঘটে, নেতামশায়দের কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। ওয়ার্কিং-কমিটির ঐ সর্বনেশে সিদ্ধান্তের সময় কোটি কোটি মানুষের যিনি সবচেয়ে বড় নির্ভর বলে জানা, তিনি একটি বাক্যও উচ্চারণ না করে ধীরপায়ে ভাঙ্গি-কলোনিতে ফিরে গেলেন। এত উপবাস কথায় কথায়—দেশ-খণ্ডনের প্রতিবাদে একটি বেলাও উপবাস-অস্ত্র প্রয়োগ করলেন না মহাত্মাজী। বিষবৃক্ষে যেহেতু অমৃত ফলে না—দেশময় চেয়ে

দেখুন, ঘুস গুণ্ডামি বিশ্বাসহত্যা দেশদ্রোহিতা পারমিট-লাইসেন্স বাগানোর ছলাকলা। বিপুল সমৃদ্ধি আর বিশাল ইজ্জত নিয়ে স্বাধীন-ভারতে শাসনের শুরু, আঠারো বছর যেতে-না-যেতে সমস্ত ফুঁকে দিয়ে আন্তর্জাতিক-ভিক্ষুক আমরা। ভিক্ষা চেয়ে দোরে দোরে মাথা ঠুকছি, না পেলে রাগ-অভিমান-গালাগালি—সে-ও ঠিক রাস্তার ভিক্ষুকের মতো।

হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ অধ্যাপক অনুভব করলেন ভিজে-ভিজে চোখ। ছোরার ঘায়ে খণ্ড-বিখণ্ড তাঁর নকুলেশ্বরের দেহ—হাড়িকাঠে পাঁঠা-বলির মতন দেশটাকেও অমনি খণ্ড খণ্ড করল। ছবিগুলো পাশাপাশি বড্ড মনে আসছে।

মহাত্মাজী, নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছ তুমি আমাদের—

সর্বত্যাগী সীমান্ত-গান্ধি বলেছিলেন গান্ধিকে। আজ পশ্চিম-বঙ্গের সর্ব-অঞ্চল থেকে ঠিক সেই সুরেই যেন সহস্র সহস্র কণ্ঠের ধ্বনি: মহাত্মাজি, নেকড়ের মুখে আমরাও—আমরা পশ্চিমবঙ্গ-বাসীরা। তোমারই শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গের মহিমায়। 'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা'—হয়েছেন যাঁরা এখন।

দিন যতই যাচ্ছে, অসহায় অবস্থা তত স্পষ্ট হয়ে ফুটছে চোখের উপর। 'বন্দেমাতরম্' গানে সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং বলে দেশ-বন্দনা। গান লিখছেন বঙ্কিমচন্দ্র, আর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন তখন বঙ্গদেশের শ্যামল রূপমাধুরী। তৃপ্তিভরা মন ছাড়া কলমের মুখে এতদূর প্রসন্ন লেখা সম্ভবে না। 'বন্দেমাতরম্' মুখে নিয়ে সোনার ছেলেরা দলে দলে ফাঁসি গেছেন, গুলির মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন—তাঁদেরও তখন বুকখানা জুড়ে রয়েছে শ্যামশ্রী বঙ্গদেশের ছবি। সেই মহাবঙ্গের যে ভগ্নাংশটুকু পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতের এলাকায় থাকতে দিয়েছে, তার বাসিন্দাগুলোর দুর্ভোগের অবধি নেই আজ। সোনা-ফলানো ধানজমি—দেশের শস্যভাণ্ডার বলা হত যে-অঞ্চলকে—কেটে চালান করে দিয়েছে পাকিস্তানের

ভিতর। ছিটেফোঁটা যা এদিকে আছে, তারই একটা মোটা অংশে ধান বাতিল করে পাট আর্জানো হচ্ছে। পাট বিহনে জুটমিলের চিমনিগুলোর ধূম উদ্গীরণ বন্ধ হবে, এবং সেই সঙ্গে ফরেন এক্সচেঞ্জের আমদানিও। দরিদ্র ভারত দরিদ্রতর হবে এবং কথায় কথায় কর্তাদের এমন মজা করে ভুবন-পরিক্রমা চলবে না। কয়লার ব্যাপারেও তেমনি। পশ্চিমবঙ্গের অফুরন্ত কয়লা যেথানে গরজ নিয়ে যাচ্ছে—যাবেই তো নিয়ে, 'একজাত একপ্রাণ একতা'। কিন্তু ক্ষুধাতুর দৃষ্টি মেলে প্রতিবেশীর ফেলে-ছড়িয়ে খাওয়া দেখতে দেখতে আমাদের ছেলেগুলো কখনো-সখনো যদি অশান্ত হয়ে উঠল, তেমনি ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত রাজ্যেরা চালের সাহায্য না দিলেও বন্দুকধারী পুলিশের সাহায্য দেদার দিয়েছে। শান্ত করা নিয়ে কথা—ভাত দিয়ে ঠাণ্ডা করতে না পারলাম তো বুলেট খেয়ে ঠাণ্ডা হোক।

মহাত্মাজী, নেকড়ের মুখে আমরা পশ্চিমবঙ্গ-বাসীরাও। সুজলা-সুফলা বঙ্গভূমির নুরুল ইসলাম ভাত চেয়ে গুলি খায়, বীরেন দে নিরপরাধ শিশুসন্তানদের ভাত না দিতে পেরে বিষ খাওয়ায়। আর সেই শুনেছেন, খাওয়ার জন্যে ছেলে ঘ্যান-ঘ্যান করছিল বলে হতভাগ্য বাপ সানের উপর আছাড় মেরে মাথার ঘিলু বের করে ভাতের আবদার ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল। এইতো ধুন্ধুমার পেটের অন্ন জোটাবার জন্য, তদুপরি মুখের ভাষাটি অবধি বঞ্চনার পরিপাটি বন্দোবস্ত।

মহাত্মা গান্ধী-কি জয়! পণ্ডিতজী-কি জয়! স্বাধীনতা ওঁরাই আনলেন। স্বাধীন সরকারও অকৃতজ্ঞ নয়। গান্ধিজীর চিতাভস্ম নিয়ে রাজকীয় সমারোহে রাজঘাট বানিয়াছি আমরা। এতাবৎ একান্ন লক্ষ টাকা খরচা করেছি, লাগবে আরো চল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার। অর্ধনগ্ন ফকির জীবিত থাকলে গরিব দেশের এত অর্থব্যয়ে কী-জানি হয়তো বাধাই দিতেন। তাঁর জীবনান্ত হয়ে নির্গোলে এখন শ্রদ্ধা দেখাতে পারছি। ভুলি নি জওহরলালকেও। দেহের

ছাই প্লেনে চাপিয়ে সারা দেশের মাথায়-মুখে ছড়িয়েছি, আর কতক দিয়ে দেউল বানিয়েছি—শান্তিবন। দশ লক্ষ তিরিশ হাজার এখন অবধি গেছে। আরও প্রায় আড়াইগুণ লাগবে—চব্বিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার। তা হোক তা হোক, বৃহৎ ব্যাপারে টাকার অঙ্ক দেখতে গেলে হবে কেন? বিদেশের তা-বড় তা-বড় মানুষরা এসে ফুল দিচ্ছেন, কত কত প্রশংসা করে বলছেন। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখুন। লেনিন সেই কবে দেহ রেখেছেন, দেহটি আজও পরম যত্নে রেড-স্কোয়ারের মুসোলিয়ামে অম্লান রেখে দিয়েছে। শীত নেই বর্ষা নেই, নিত্যিদিন লম্বা লাইন পড়ে দেহ-দর্শন এবং শ্রদ্ধা-ভালবাসার মাল্যদানের জন্য। স্তালিনের দেহও ছিল লেনিনের ঠিক পাশটিতে। রাজনীতির পাশা কিঞ্চিৎ উল্টে যাওয়ায় দেহটি সরিয়ে ফেলে কোথায় মাটি দিয়েছে, খোদায় মালুম। নেতাদের এই এক বিপদ—গণদেবতার কাছে আজকে যিনি নয়নের মণি, কাল হয়তো তিনি পদতলের ছুঁচো। সে যাক গে, আমাদের বানানো ঘাট-বন আমরা চিরজীবী করে রাখব।

পায়চারি করতে করতে এমনি সব ভাবছেন অধ্যাপক বীরেশ্বর। আকাশে খণ্ডচাঁদ, হিন্দুস্থানের পার থেকে ঝিরঝিরে বাতাস এসে গাছের শাখায় পাতায় মৃদু দোলা দিচ্ছে। সহসা যেন বহু কণ্ঠে কলরব করে উঠল: আমিও টাকা দিয়েছি রাজঘাট-শান্তিবনে, আমারও চাঁদা আছে। আমরা যারা ট্যাক্স দিই, সকলের চাঁদা। কলরব বটে, কিন্তু নিঃশব্দ চতুর্দিক—কলরব বাইরে নয়, বুকের মধ্যে। ভারতের সর্বপ্রান্তের মানুষ যেন একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে বলতে চায়। তার মধ্যে চেনাও যেন কতক কতক। এই একটু আগে পুরানো খবরের-কাগজে যাদের কথা পড়ে এলেন—

যেন কবর ফেড়ে তেঁতুলিয়া-ইস্কুলের নুরুল ইসলামের চিৎকার আসছে: আমার আব্বাজানেরও কি একটা-দুটো পয়সা নেই ঐ সব বড় বড় কীর্তি বানানোর কাজে? বীরেন দে, যিনি প্রাণের

অধিক ছেলেমেয়ের মুখে ভাত দিতে না পেরে বিষ দিয়েছিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী বিষ খেয়ে ব্যথার শান্তি করেছিলেন, তিনিও বুঝি চেঁচাচ্ছেন : চাঁদা আমারও আছে, সে কথা কক্ষনো ভুলে যেও না।

ঘরের ভিতরে সেই সময়ে অমলেশ খবর পড়া ছেড়ে পূর্ব-বাংলার এক তরুণ কবির কয়েক ছত্র কবিতা সশব্দে পড়ে শোনাচ্ছে :

'হে অস্থির যুবকেরা শোন,
হতাশাই শেষ কথা নয়—
একমাত্র সত্য নয়—
যন্ত্রণার আর্তনাদ শেষ হয়ে যাবে ;
তারপর জন্ম হবে
আশা আর আশ্বাসের
নতুন শিশুর...'

॥ তেত্রিশ ॥

ও-ঘরে ফুল্লরা ও তারাফুলি ইতিমধ্যে একেবারে অভিন্ন-হৃদয়। আজন্ম-পরিচিত দুই সখী যেন। মহাত্মা গান্ধি মস্তবড় মানুষ, মানুষই বলবেন না ভক্তজনেরা—শাপভ্রষ্ট দেবতা। সীমান্তগান্ধি বাদশা খাঁকে তিনি বলেছিলেন, দেশবিভাগে আমি বিশ্বাস করিনে। সীমান্ত-প্রদেশে যাব, পাশপোর্ট নেবো না। তার জন্য কেউ যদি আমায় খুনও করে, সানন্দে আমি খুন হতে রাজি। চপল তরুণী তারাফুলি যা বলছে, তা-ও তো প্রায় এই জিনিস। ফুল্লরাকে জড়িয়ে ধরে বলল, বর্ডার আমি মানিনে। পাখিরা মানে? জন্তু-জানোয়ারে মানে? ইচ্ছে হলেই এপার-ওপার করি, আইন-টাইনের তোয়াক্কা রাখিনে। পাশপোর্ট রে ভিসা রে—অত সমস্ত পোষায় না ভাই আমার। মন কেমন করে উঠল, তক্ষুনি পার না হতে পারলে সোয়াস্তি পাইনে। দিনক্ষণ বার-তিথি হিসাব করে পালকি-গাড়ি চেপে লোকে তো বরের-ঘরে ঘরকন্নায় যায়—

ফিকফিক করে হেসে ফুল্লরা বলল, এখন আর সেদিন নেই। এই ধরো আমিই তো যাচ্ছি।

নিজেরই প্রতিবাদ করে আবার: তা নয় অবিশ্যি। অনেকখানি বাড়িয়ে বলা হল। বর পাবার ভরসা পেয়েছি—সেই ভরসার পিছন ধরে ছুটেছি। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান, বেলুচ-ফৌজ, বর্ডার-পুলিশ—কুছ পরোয়া নেই, বর ধরতে বেরিয়েছি নাতনি আর দাদুতে মিলে।

আরও বিশদ করে বলে, সেকালের কন্যা স্বয়ম্বরা হত। বেড়ে নিয়ম। বরেরা দেশদেশান্তর থেকে সভা করে বসেছে। মালা হাতে কন্যা বেরিয়ে এলো। গলা সব টান-টান করে আছে,

বরমাল্য কোন গলাটায় না-জানি এসে পড়ে! আর একালে—বিশেষ করে আমার বেলা দেখ, বিলকুল উল্টো। নিজেকেই ফিরি করে বেড়াচ্ছি: আমায় কে নিবি লো চলে আয়! পাকিস্তান সারা করে এবারে হিন্দুস্থানে চলেছি। এত করে চেল্লাচ্ছি—তা ভাই কানা-খোঁড়া নুলো-বুড়ো আধখানা বরও গাঁথে না। হতকুচ্ছিত চেহারা দেখে হুড়দাড় করে পালায়।

হতকুচ্ছিত—তা বই কি!

তারাফুলির আবার সশব্দ চুমা ফুল্লরার দুই মুখে। বলে, আমি যদি পুরুষ হতাম, ঠিক বিয়ে করতাম তোমায়। বিয়ে করে মাথার মণি করে রাখতাম।

জিভ কেটে পরমুহূর্তে বলে, কী মুশকিল, কেমন করে হবে? মুসলমান যে আমি। আস্পর্ধার কথা কানে গেলে তোমার মা দাদু আর জ্ঞাতগোষ্ঠী মিলে তো পেটাতে লেগে যাবেন আমায়।

ফুল্লরা কিছু গম্ভীর হয়ে বলে, ছিল বটে তাই। বেড়া তুলে দিয়েছিলাম—দেশ ভরে তারই এখন প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি। সে-বেড়া আজও যে নিশ্চিহ্ন, এমন কথা বলিনে।

বাপ-মায়ের লাহোর থেকে পালানোর সেই কাহিনী বলল ফুল্লরা। ঠাকুরমা কেমন যেন বাতিকগ্রস্ত সেই দুর্ঘটনা থেকে। মাথা খারাপই বলতে হবে। মুসলমান কথাটা কানে উঠলেই বিগড়ে যান, সব মুসলমানই যেন নকুলেশ্বরের হত্যার জন্য দায়ী। পাড়াগেঁয়ে গৃহস্থবাড়ির গিন্নিবান্নি মানুষ, বয়সও বিস্তর। ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে রাতদিন ঘরে থাকেন, তিলার্ধ বাড়ির বার হন না। একলা ছাড়বেন না আমায়—বুড়ো দাদুকে টেনেছিঁচড়ে সঙ্গে নিয়ে চলেছি। আমার ছোটমামার সাংঘাতিক এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল, তাঁকে দেখবার জন্য মা তো পাগল হয়ে আছে সেই থেকে। কিন্তু ঠাকুরমাকে ফেলে নড়বে কি করে? বলেও সেই কথা: যদ্দিন শাশুড়ি বেঁচে, এক-পা কোথাও আমার যাওয়া

হবে না। ওঁর অবর্তমানে তখন ছোড়দার কাছে গিয়ে ভাই-বোনে একসঙ্গে দিনকতক কাটিয়ে আসব।

হাসতে লাগল ফুল্লরা। বলে, আমিও ছাড়ব কেন? বললাম, তখনো এক-পা নড়বে না তুমি। তোমার ছেলেপুলের দঙ্গল কার কাছে রেখে যাবে? তাদের ভার কারও উপর দিয়ে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। পেটের মেয়ে আমি অবধি পর হয়ে গেছি। সত্যি ভাই, হিংসা হয় তাদের আদর-যত্ন দেখে।

যাওয়ার গোছগাছ হচ্ছে। ফুল্লরা তখন লীলাকে বলেছিল, তুমিও চল মা। ছোড়দা-ছোড়দা করো—সুযোগ হল যখন, একটিবার চোখে দেখে এসো। খুশি হবেন তিনি।

সে তো বটেই। যেতে পারলে ভালই হত—

ভাবছে লীলা। ফুল্লরা হেসে উঠে বলে, ভয় পাচ্ছ নাকি মা? আর তুমিই একদিন রিভলভার নিয়ে জেদ করে প্রতিশোধ নিতে ছুটেছিলে। মোক্তারমশায় সব ব্যবস্থা করে দেবেন, নির্ঝঞ্ঝাটে গিয়ে হাজির হবো। আমি যাচ্ছি, বুড়োমানুষ হয়ে দাদুও চললেন, তোমারই কেবল আকাশ-পাতাল ভাবনা।

লীলা চুপচাপ আরও একটু ভেবে ঘাড় নাড়ল: মা তো আর যাচ্ছেন না। আমি গেলে মা একেবারে একলা হবেন। উচিত হবে না সেটা।

ফুল্লরা তর্ক করে: দিদার স্বপাকে রান্না—তুমি থেকেই বা ওঁর কোন্ কাজটা হবে? যাওয়া ক'টা দিনের জন্যে—দাদু কি আর বেশিদিন থাকতে যাবেন? দরকার হলে আমিই না-হয় ছোটমামার ওখানে থেকে যাবো, দাদুর সঙ্গে তুমি ফিরে চলে এসো।

জোর দিয়ে আবার বলে, এবাড়িতে-ওবাড়িতে বুড়ি-বুড়োরা আছেন। অন্য সবাই হিন্দুস্থানে গিয়ে উঠেছে—একা একা দিব্যি

বাড়ি আপনে আছেন তাঁরা। দিদার সঙ্গে ভাবসাব—কয়েকটা দিন তাঁরাই দেখাশুনো করবেন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করে দেখি দিদাকে, তিনিই বা কী বলেন।

লীলা নিষেধ করল: না, জিজ্ঞাসা করতে হবে না। আমি যাবো না।

ফুল্লরা অভিমান করে বলে, জানি মা, সে আমি জানি। যাওয়া আটকাচ্ছে দিদার জন্মে নয়, ছেলেমেয়ের যে দঙ্গল জুটিয়ে নিয়েছ তাদেরই জন্মে। ওরাই তোমার সবচেয়ে আপন।

লীলা হেসে পড়ল: ওদের উপর বড্ড হিংসা তোর। আমার যদি ছেলেমেয়ে হয়, তোরই তো ছোট ছোট ভাই-বোন। তোরও তবে আপন।

ফুল্লরা বলে, হতে পারত তাই। কিন্তু আমিই বা মেয়ে আছি কোথায়! কলকাতা থেকে ছুটে এসে পড়েছিলে দাদু-দিদার ঘাড়ে আমায় গছিয়ে দেবে বলে। দিয়ে ভারমুক্ত হয়ে রিভলবার-হাতে শত্রু-নিপাতে লেগে যাবে। উঃ মা, বড্ড ভাল হত তোমায় যদি ছোটমামার কাছে নিয়ে যেতে পারতাম। বড্ড আশায় আশায় বোনের হাতে ছোটমামা অস্ত্র গুঁজে দিয়েছিলেন, গরম গরম কথাও শুনিয়ে এসেছিলে তাঁর কাছে। তোমায় পেলে তিনি শুধাবেন: কী করে এলে এই আঠারো বছর ধরে, শত্রু কতগুলো নিপাত করে এলে আমার রিভলভারে? সেই সময়ে তোমার জবাবটা কি, শুনতে লোভ হয় মা।

একটুও লজ্জিত নয় লীলা। হাসিমুখে বলল, জবাব এখনই শুনেনে আমার কাছ থেকে, গিয়ে তোর ছোটমামাকে বলিস। বলবি, শত্রু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এমনটা হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। পূব-বাংলার মানুষের মধ্যে একটি শত্রুও কোনদিকে কেউ নেই। যারা উল্টো-কথা বলে, স্বার্থদুষ্ট মিথ্যেবাদী তারা—ক্ষমতা নিয়ে চূড়োয় বসে রয়েছে। ধনদৌলত অস্ত্রশস্ত্র খবরের-

কাগজ রেডিও সবই তাদের দখলে। গলা তাই ভুবন জুড়ে গমগম করে। আমার হয়ে বলিস ছোড়দাকে, ভাঁওতাবাজি কানে না নেন যেন। পঙ্গু মানুষটা শুনে শান্তি পাবেন।

একটু থেমে আবার বলে, এরা হিন্দু জানে না মুসলমান জানে না, জানে শুধু বাংলাদেশ আর বাঙালি-মানুষ। বাংলাকে ভালবেসে প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে বেড়ায়, দরকারের সময়টা হাসিমুখে ছুঁড়ে দেয় সে প্রাণ। আমার বড়দা'রা সারা দেশ জুড়ে একদিন করেছিলেন অবিকল সেই জিনিস। বলিস এসব ছোড়দা'কে। বিনা-অস্ত্রেই শত্রু নিশ্চিহ্ন, ছোড়দা'র রিভলভার কাজে লাগে নি। ছাইগাদায় পুঁতে রেখেছিলাম, আছে কি নেই জানিনে।

বরের তল্লাসে বেরিয়েছে ঠাকুরদা আর নাতনি। হিন্দুস্থানে হেমকান্তর বাড়ি উঠে সর্বাগ্রে সুব্রত'র খোঁজখবর করবে—আছে এখনো সে বিয়ের-পাত্র, না কন্যাদায়গ্রস্ত কেউ ইতিমধ্যে গেঁথে ফেলেছে? সুব্রতটিকে পেলে অনেক সুবিধা, দেখাশুনো দরদাম হয়ে কাজ এগুনো আছে, শুভকর্ম চট করে সমাধা হয়ে যাবে। সুব্রত না হলে নতুন সম্বন্ধ খুঁজতে হবে। কুলশীল গাঁইগোত্র মেলানো হিন্দুস্থানের উপর কঠিন হবে না—কমলবাসিনীর ধনুর্ভঙ্গ পণ যে বস্তু নিয়ে। বিয়েথাওয়া অন্তে, যেমন করে হোক, নাতনি-নাতজামাইকে জোড়ে একবার তাঁর চোখের সামনে নিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। পুত্রশোক আজও শেল হয়ে বিঁধে আছে, ব্যথা এক-এক সময় টনটনিয়ে ওঠে, পাগলের লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই সময়। বংশের একমাত্র দুলালীর সুখের সংসার হলে কমলবাসিনীর মস্ত সান্ত্বনা—কঠিন পুত্রশোকের উপর অমৃত-প্রলেপ পড়বে।

এমনি সব কথাবার্তা হয়ে ঢাকের পথে নাতনি সহ বীরেশ্বর বেরিয়ে পড়েছেন। সদ্য-পাওয়া মিতার কাছে ফুল্লরার কিন্তু উল্টো

কথা : ডাইনে-বাঁয়ে দাহ্ বলে বেড়াচ্ছেন, বর ধরতে ছুটেছি আমি। ওঁরা তাই ভেবে আছেন—মেয়ে নই, কলের পুতুল বলে ভাবেন ওঁরা। কল টিপলে উঠব, বসব, হাঁ করব, হাত নাড়ব, পা নাড়ব, 'আমায় কে নিবি গো'—বলে নিজেকে ফেরি করে বেড়াব হিন্দুস্থানের পথে পথে। ক্ষেপেছ ভাই, আমি ওর মধ্যে নেই।

তবে যাচ্ছ কি জন্যে ?

ফুল্লরা বলে, মতলব আছে। দুই মামা আমার—দু'জনেই হিন্দুস্থানে। এই বয়স অবধি গল্পই শুনেছি তাঁদের। গল্প শুনে গায়ে কাঁটা দেয়। এইবারে মানুষ দেখব।

সংশোধন করে নেয় সঙ্গে সঙ্গে : দেখব আমার ছোটমামাকে। বড়মামাকে কোথায় পাব, তিনি ফাঁসিতে গেছেন ইংরেজ-আমলে। পারি তো সেই ফাঁসির জায়গা দেখব, আর গড় হয়ে প্রণাম করে আসব।

চপল মেয়ে তারাফুলি কেমন এক দৃষ্টি মেলে ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে পড়ে।

ফুল্লরা বলতে লাগল, আরও একটা কাজ আমার—কিছু খবর শুনিয়ে আসা। আসল খবর, মানুষের খবর পায় না তো বড়-কেউ—যে বস্তু মেলে সে হল উজিরদের-নাজিরদের মারফতি খবর। গরজ মাফিক আজকে একজন বুকের নিধি, কাল সকালেই তিনি আবার পথের আবর্জনা। অপবাদের এত কালিমা চাপিয়েও সত্য সম্পর্ক চক্রীরা মুছে দিতে পারে নি। কথাটা বুঝিয়ে বলে ছোটমামাকে সান্ত্বনা দিয়ে আসব—কিন্তু পাশপোর্ট-ভিসা করে কে আমায় হিন্দুস্থানে পৌঁছে দিচ্ছে ? লড়াইয়ের ছুতোয় সে জিনিসও তো বিলকুল বন্ধ। তারই মধ্যে কপাল খুলল হঠাৎ—পাশপোর্ট জুটে গেল।

তারাফুলি অবাক হয়ে বলে, পাশপোর্ট করেছ—তবে বর্ডারের ঘাটে কেন এই রাত্রিবেলা ?

ব্লাকের পথেও লোমত্ত মেয়ের পাশপোর্ট লাগে। সরকারি পাশপোর্ট নয়, ঘরের ছাড়পত্র। অরক্ষণীয়ার পাত্র জোটানোর জন্ত জরুরি গরজেই সে জিনিস মিলেছে। নইলে সেকেলে মানুষ দিদা গাঁয়ের বাইরে দিতেন আমায় পা ফেলতে। সেই তিনিই দেখ, যাত্রামুখে আঁচলে বিল্বপত্র বেঁধে দিয়েছেন। আর দাছ নিজে সঙ্গে করে ব্লাকের পথে বর্ডার-অফিসে এনে তুললেন।

তারাফুলির দিকে চেয়ে বলল, তোমার কিন্তু ভাই বেশ। সঙ্গী-সাথী লাগে না, রাত-বিরেত নেই—

তারাফুলি দেমাক করে বলে, মন কেমন করে উঠল, তক্ষুনি যদি ছুটে না গেলাম তেমন যাওয়ার সুখটা কী?

বাড়িতে কিছু বলে না?

তারাফুলি হেসে বলল, বলে না আবার! শুধু কি মুখের বলা, মা ধরে ধরে ঠেঙানি দিত যখন ছোট ছিলাম। চুলের মুঠো ধরে চক্কোর দিয়েছে কত। তা চুলের মুঠো দিনরাত চব্বিশঘণ্টা ধরে বসে থাকতে পারে না—ছাড়া পেলে সঙ্গে সঙ্গে পিঠটান। এখন আর কিছু বলে না, দেখেশুনে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

বলতে বলতে থেমে গেল। ফুল্লরার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে মাথায় মতলব ঢুকেছে। বলে, পারাপার অনেক রাতে। ততক্ষণ বসে বসে কী করা যায়? খিচুড়ি রাঁধিগে যাই চলো, তোমার ক্ষিধে পেয়েছে।

ক্ষিধের দোষ নেই। সেই কোন্ সকালে বেরিয়ে পড়ে সারাটা দিন চিঁড়ের উপর আছে। তা বলে ক্ষিধে স্বীকার করতে চায় কোন্ মেয়ে? ঘাড় নেড়ে ফুল্লরা বেকবুল গেল: নাঃ—

না-ই পাক ক্ষিধে, তবু খেতে হবে। ভাইয়ের বাড়ি আমার, তা জানো। হরবখত আসি যাই—আনোয়ার কাজি ভাই হয়ে গেছেন। আনোয়ারের বউ ভাবী। ভাবী নেই এখানে—অতিথ-কুটুম এলো, আমি যখন হাজির আছি, দায় সম্পূর্ণ আমার উপর

বর্তেছে। তুমি এসেছ, তা ছাড়া আমার মামা-মামির আসবার কথা। এ তল্লাটে তারা একেবারে নতুন। অনেক পথ ভেঙে আসছে আমারই উপর ভরসা করে। তাদেরও চাট্টি খাইয়ে দেবো।

বেশি তর্কাতর্কিতে না গিয়ে ফুলি হাত ধরে হিড়-হিড় করে ফুল্লরাকে ভিতরে নিয়ে গেল। ভিতর-বাড়িতে আনোয়ারের বউ-ছেলে থাকত, এখন বর্ডার-এলাকার বাইরে কাজিবাড়ির পুরানো দালানে আপাতত গিয়ে উঠেছে। এ জায়গায় থাকতে আইনত যে বাধা আছে, তা নয়। কিন্তু এলাকার ভিতর গোলায় একচিটে ধান থাকতে পাবে না, মাঠে গরু-বাছুর ছাড়লে বিপদ, হাটবাজার দোকানপাট সমস্ত বন্ধ, পড়শিরা সব বাস ওঠাচ্ছে—হেন জায়গায় ঘরবসত করা মুশকিল। মাথা গুঁজবার জায়গা যখন রয়েছে—কষ্ট করে কেন বউ বর্ডারে পড়ে থাকতে যাবে?

রান্নাঘরে গিয়ে তারাফুলি উনুন ধরাতে লেগে গেল। ফুল্লরাকে বলে, রাঁধাবাড়া আমিই সব করব। মিতা তুমি, একদিনের তরে আমার দাদার বাড়ি এসেছ। উনুনে জ্বালটা ঠেলে দিলে কি বাটিটা-ঘটিটা এগিয়ে দিলে, এর বেশি তোমায় কিছু করতে দেবো না। গিয়ে তারপর নিন্দেমন্দ করবে—দেখেছ, খাটিয়ে নিল কেমন করে!

ফুল্লরা ঘাড় নেড়ে বলে, তা বইকি! রান্নার যশ একলা নেবার মতলব। সেটা হতে দিচ্ছিনে। একজনে, বাটনা করবে, একজনে জ্বাল ঠেলবে। হাঁড়িতে চাল চাপাবে একজনে, আর একজনে ডাল। বলি, উনুন ধরাচ্ছ—জিনিসপত্তোরের জোগাড় হবে তো বটে?

সগর্বে তারাফুলি বলে, বর্ডার-জায়গায় আবার জিনিসের অভাব! তাবৎ পাকিস্তান-হিন্দুস্থানে যা পেলে না—খোঁজ করো, এখানেই তা মিলে যাবে। লেডিজ ওয়াচ চাই—এই আমার মতন? ফরাসি সেণ্ট, জর্মন ক্যামেরা? কোন্ জিনিসটা চাই তোমার বলো না।

ফুল্লরাও হেসে বলে, চাই চাল-ডাল ঘি-মশলা—খিচুড়িতে যা লাগবে।

সে সমস্ত ঘরেই পাওয়া গেল। চলে যাবার সময় গুছিয়ে রেখে গেছে—বউয়ের বিহনে আনোয়ারের যাতে কষ্ট না হয়। নিত্যিদিন আনোয়ার হাত পুড়িয়ে রেঁধে খায়, পরের রান্না খাবে আজ অনেক দিনের পরে।

ওয়েটিংরুমে পারার্থী মানুষ দুটি-চারটি করে জমতে লেগেছে। যত রাত বাড়ে, তত জমজমাট। আর আজ তো নিশিরাত্রে পারাপার—যথেষ্ট সময় এখনো।

রান্নাঘরের সামনে এসে আনোয়ার উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। একলা তারাফুলি থাকলে ঢুকে পড়ত, ফুল্লরার জন্য সঙ্কোচ। বাইরে থেকে ডাক দিয়ে বলল, বৈঠকখানায় আয় একবার ফুলি। তোর মামু এসেছেন।

উল্লসিত হয়ে ফুলি বলে, এসে গেছেন তবে। বিকেলবেলা এসে পৌঁছনোর কথা—আমার আগে। ভাবলাম পিছিয়ে গেলেন, আসবেন না। আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন নি।

খিচুড়ি ফুটছে উনুনে। খুন্তিতে একটু তুলে জল ছিটিয়ে টিপে দেখল। হয়ে গেছে, একটুখানি আর বাকি।

বসাওগে ওঁদের আনোয়ার-ভাই। হাঁড়ি নামিয়ে আমি যাচ্ছি।

মামাদের কথা বলছে ফুল্লরাকে। বর্ডার পেরিয়ে হিন্দুস্থানের ভিতর মাইল তিন-চারের মধ্যে বাড়ি, বিনিময় করে পাকিস্তানে চলে এসেছেন আজ ক'বছর। ছেড়ে এসেছেন বটে, মন থেকে কিন্তু ছাড়তে পারেন নি। কতজনকে আমি জানি, সবার এই গতিক—সাত-পুরুষের ভিটে ছেড়েছুড়ে আসে, ঘা দগদগ করে বুকের নিচে। মামাদের অবশ্য বাড়াবাড়ি। তাদের মধ্যে

বেশি আবার ছোটমামা আর ছোট-মামানি। চার মেয়ের পরে ছেলে হয়েছিল ছোট-মামানির—তিন বছরেরটি হয়ে ছেলে মারা গেল, সেই থেকে আধপাগল অবস্থা তাঁর।

তারাফুলি বলছে, ভিটে ত্যাগ করে এসেছেন, কিন্তু চিঠিপত্র লিখে ছোটমামা হরদম খবরাখবর নিতেন। বাড়ির শুধু নয়, সারা গাঁয়ের খবরাখবর। ওঁদের চেনা-পড়শি বড়-একটা নেই—পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা বিনিময় করে সেই সব বাড়িতে উঠেছেন। কিন্তু মানুষ না চিনলেও বাড়িঘর গাছগাছালি পুকুর-দীঘি পথঘাট—এমন কি পথের ধারের আশশ্যাওড়া ভাট দূর্বাঘাসটি অবধি চেনা। তাদের খবর পেতে চান।

হেসে উঠল সে। বলে, এই ঢাউস ঢাউস চিঠি। পাগলামি আর কাকে বলে! মামাদের বাড়ি যাঁরা এসে উঠেছেন, তাঁরা কিন্তু বড্ড ভাল। ধৈর্য ধরে পড়েন ঐ সব চিঠি, সমস্ত না হলেও জবাব দেন কিছু কিছু জিজ্ঞাসার। ছোটমামার তবু ছটফটানি যায় না: এটার বিষয়ে কিছু তো লিখলেন না, ওটার বিষয়ে জানতে পারলাম না। বলতেন, চোখে না দেখে মন ঠাণ্ডা হচ্ছে না। পাশপোর্ট করে ঘুরে আসবেন মেজমামা ছোটমামা—আর ছোট-মামানিকে ঠেকিয়ে রাখবে, কার ক্ষমতা? তাঁর নামেও পাশপোর্টের দরখাস্ত চলে গেল। কিন্তু লড়াই লাগল হঠাৎ—আয়োজন বরবাদ। চিঠি লেখালেখি পর্যন্ত বন্ধ। চিঠি ইদানীং ছাড় হয়েছে বটে, কিন্তু 'কেমন আছ' 'ভাল আছি'-র বাইরে কিছু থাকলে সে চিঠি বেপাত্তা হয়ে যায়।

খিচুড়ি নামিয়ে রেখে তারাফুলি ফুল্লরাকে বলল, রান্নায় হাত ছোঁয়াতে দেবো না ভেবেছিলাম, তা আর কী হবে—বেসমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে আলু ভাজতে থাকো তুমি। দেখা দিয়ে ফিরে আসছি। ওঁরা চলে এসেছেন আমারই কথার উপর: নির্ঝঞ্ঝাট ঘুরিয়ে নিয়ে আসব, মনের সুখে সব দেখে আসতে পারবেন।

হয়বখত আমার যাওয়া-আসা দেখছেন, তাতেই সাহস পেয়েছেন।

হাত ধুয়ে তারাফুলি বাইরের দিকে এলো। ছোটমামা আবুল হাসিম—ঘরে ঢোকেন নি তিনি, দাওয়ায় বেঞ্চির উপর বসে তারাফুলির অপেক্ষায় আছেন।

তারাফুলি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, মামানি কোথা? মেজমামারও তো আসবার কথা ছিল।

আবুল হাসিম বলেন, ভাইজান এলো না, পিছিয়ে পড়ল শেষ অবধি। বলে, বিসর্জন দিয়ে এসেছি তো পিছন ফিরে আর দেখতে যাবো না। আর তোর মামানিকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে চলে এসেছি—ছেলেমানুষকে যেমনধারা করে।

তারাফুলি বলে, ভারি অন্যায়। আসার জন্যে পাগল। কেঁদেকেটে আমায় এত করে বলে দিয়েছিল। ভরসা হল না বুঝি? মেয়েলোক কত কত যাতায়াত করে, খোঁজ নিয়ে দেখ।

একজন তোকেই তো দেখতে পাচ্ছি চোখের উপর—ইচ্ছে মতন যাস আসিস। পথ নিয়ে ভয়-ভাবনা নয়। ভয়টা হল, গিয়েই হয়তো চাঁপাতলায় আছাড় খেয়ে পড়বে। অনেকদিন দেখে নি —পুরানো ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠবে, কান্না জুড়ে দেবে সুর করে। যাঁরা সব আছেন, তাঁদের বিব্রত করে তোলা। সাত-পাঁচ ভেবে, তোর মামানি ঘুমুচ্ছে—ভোররাত্রে টিপিটিপি রওনা হয়ে পড়লাম।

ম্লান হেসে আবুল হাসিম বলেন, কম ঝামেলা! যাওয়া হবে না, পথে নানান গণ্ডগোল—এই সমস্ত শোনাচ্ছিলাম ক'দিন ধরে। পোঁটলা, গুড়ের-নাগরি আগেভাগে চালান করে দিলাম একজনের জিম্মায়। ভোরবেলা আবার সেই লোকের বাড়ি যেতে হল জিনিস নিয়ে নেবার জন্য। এইসব হাঙ্গামার জন্যেই ঘাটে আসতে এত

দেরি। ফিরতিবেলা আমাদের বাড়ি অবধি যেতে হবে তোকে। তোর মামানি আমায় তো আস্ত রাখবে না—তুই সামলাবি তখন।

পায়ের কাছে পোঁটলা এবং গুড়। তারাফুলি বলে, এত সমস্ত নিয়ে যাচ্ছ মামা—নিজের ঘাড়ে বইতে হবে। বওয়ার লোক আগে মিলত, কড়াকড়ি হওয়ার পর থেকে অমিল। দৈবেসৈবে মেলেও যদি, সৃষ্টিছাড়া রেট।

আবুল হাসিম তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন, মুটে লাগবে না—আমিই বইব। বুড়ো-থুথ্‌বুড়ে হয়ে যাই নি। চাট্টি বাসমতী নতুন চাল আর নলেনের গুড়। পায়েস রেঁধে খাবেন। ওঁদেরই ক্ষেতের ধান, ওঁদেরই গাছের গুড়। ভাবলাম, একলা আমরাই খাবো, সেটা উচিত হয় না—শাপমন্যি লাগবে। বয়ে নিতে কষ্ট একটু হবে, তা বলে কী করব?

তারাফুলি বলে, কষ্ট হলেও অবিশ্যি নিয়ে পৌঁছনো আটকাবে না। ব্লাকের কত সুবিধা বোঝ। পাশপোর্ট করে যেতে গেলে কাস্টমসের লোক গুড়ের নাগরি ভেঙে গুড় ছড়িয়ে ফেলে দেখত, ভিতরে সোনা-রুপো পাচার করছ কি না। আর গন্ধ-ভুরভুরে এমন খাসা চাল—পোঁটলা নিজেরাই সরাসরি ধরে নিয়ে তুলত।

॥ চৌত্রিশ ॥

একটুকু তন্দ্রা এসেছে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে বীরেশ্বর চোখ বুজেছেন। আনোয়ার এসে ডাকল, উঠুন সার—

ধড়মড় করে উঠে বীরেশ্বর স্যুটকেস হাতে তুলে নিলেন।

আনোয়ার বলল, যাওয়া নয়। খিচুড়ি রান্না করেছে, খেতে বসবেন এইবারে।

বীরেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, পথের উপরে রান্নাবান্না? তা-ও তো সহজ রাজপথ নয়, চোরাই পথ।

আনোয়ার হেসে বলে, আর বলেন কেন। বিদ্যে শিখুক আর ফ্যাসান করে বেড়াক, মেয়েছেলের স্বভাব যাবে কোথা? হাতা-বেড়ি দেখলেই হাত নিশপিশ করে। তার উপর একবয়সি দু'টি জুটেছেন।

আমার তো চলবে না, বলো গে ওদের। রাত্রিবেলা খাই-ই না আমি প্রায়। বুড়ো হয়ে পেটের ক্ষিধে মরে গেছে।

পা ছড়িয়ে বীরেশ্বর বসে পড়লেন আবার।

তারাফুলি কোমর বেঁধে এলো: খাবেন না কেন দাদু? রাতে আপনি রুটি খান, ফুল্লরা বলল। একেবারে 'না' কেন বলে দিলেন? রুটি করে দিচ্ছি, এক্ষুনি হয়ে যাবে।

ভারি মিষ্টি মেয়ে। 'দাদু' বলে ঝগড়া করতে এসে লহমায় কেমন আপন হয়ে গেল। বীরেশ্বর স্নেহকণ্ঠে বললেন, রুটির ঝামেলায় যেতে হবে না দিদি।

ঝামেলা কোথা? খিচুড়ি হতে পারল, দু'খানা রুটিও হবে। দু'খানার বেশি খান না আপনি, তা-ও জানি। আমার ভাইয়ের বাড়ি। ভাবী নেই—আমায় দেখতে হচ্ছে। বাড়ির উপর উপোসি থাকা চলবে না।

জজ সাহেবের মতন রায় দিয়ে ফুলি পটপট করে চলে যায়।

বীরেশ্বর ডেকে বললেন, শোন, রুটি লাগবে না। খিচুড়িই খাবো চাট্টি।

না, শরীর খারাপ করবে আপনার।

করবে না—

প্রতিবাদ করে বীরেশ্বর বললেন, বুড়েমানুষের খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে হয়েছে—কেন বঞ্চিত করবে? আমার কথা মানবে না বুঝতে পারছি। বেশ, ফুল্লরা তোমার দোসর—তার কাছে জেনে নাও। দায়ে-বেদায়ে ভাতও যে না-খাই, এমন নয়। একটি হাতা খিচুড়ি দিও, ব্যস।

ফুলি বলে, এক-হাতা দু-হাতা সকলেরই—তার বেশি পাচ্ছি কোথা? আগে তো আন্দাজ হয় না—পরে আরও এসে পড়েছেন। এখনও আসছেন।

রান্নাঘরের দাওয়ায় লম্বা সপ পেতে দিয়েছে, সপের উপর পাশাপাশি সকলের ঠাঁই। সামনে কলাপাতা। আনোয়ার অমলেশ আবুল হাসিম এবং আরও ক'জন বসে গেছে, বীরেশ্বরকেও পাশে গিয়ে বসতে হল।

খাসা লাগছে। পথ-চলতি নানান জায়গার রকমারি মানুষ রাত্রিবেলা এক জায়গায় এসে জমেছে, আলাপ-পরিচয় গল্পগাছা পরস্পরের মধ্যে, পাশাপাশি বসে খাওয়া, ঢালা-বিছানায় শুয়ে পড়া—সেকালে পায়ে-হাঁটার আমলে এইসব ছিল, বাপ-দাদাদের মুখে শুনেছি। রেল-মোটরের তাড়াহুড়োয় উঠে গিয়েছিল—রাকের পথে আবার তাই চালু হল। দুই-বাংলার তেরো-শ' মাইল বর্ডারের উপর কমসে-কম শ' তিনেক ঘাট। এই রাত্রে প্রতি ঘাটের এপারে-ওপারে ঘুরে দেখে আসুন, ক্ষণপরিচিত মানুষেরা চাঁদের হাট জমিয়ে নিয়েছে।

একটি গ্রাস বীরেশ্বর মুখে তুলেছেন কি না—তারাফুলি সামনে এসে বসে পড়ল: কেমন রান্না হয়েছে দাদু?

পিঠ পিঠ ফুল্লরার আবির্ভাব: ভাল হয়েছে—তাই না?

সত্যি রে, চমৎকার!

মুখ তুলে ফুল্লরার দিকে চেয়ে বীরেশ্বর বললেন, রান্নায় তুইও আছিস—রান্না তুই শিখলি কবে দিদি?

ফুল্লরা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, কী এমন জিনিস রে—তাই আবার ঘটা করে শিখতে হবে! তবু তো এক টিপ গরম-মশলা পড়ে নি খিচুড়িতে, এককৌটা ঘি-ও নয়।

তারাফুলি কৈফিয়তের সুরে বলে, ঘরে ছিল না। ভাইজানকে দিয়ে আনিয়ে নেবো ভেবেছিলাম। তাতে দেরি হয়ে যায়। কখন সিগন্যাল এসে পড়ে, খাওয়া ফেলেই ছুটতে হবে তখন।

অমলেশ বলল, সিগন্যালের এখন কি! হিসেবের ব্যাপার। দশমীতে বিশদণ্ড জ্যোৎস্না। তার মানে রাত দুটোর আগে তো নয়ই—

আগে—অনেক আগে। কপাল বড্ড ভাল আজ। আঁচানোর সময়টা উপরমুখো একবার তাকিয়ে দেখবেন।

যেই মাত্র বলা, আকাশের দিকে সবগুলো চোখ। দাওয়া থেকে ভাল দেখা যায় না তো উঠানে নেমে পড়ল কেউ কেউ। খাওয়া অন্তে আঁচানোর সময় আকাশে তাকাবে, অতখানি সবুর সয় না। আকাশ জুড়ে কালো মেঘের নিঃশব্দ দ্রুত আয়োজন—ঝড়-ঝাপটা বৃষ্টি-বাদলা না হয়ে যায় না। রাত দুটো হিসাব করে এতগুলো মানুষ নিশ্চিন্ত আছি, মাথার উপরে একটি বার কেউ তাকিয়ে দেখি নি!

তারাফুলি খিল-খিল করে হাসে: দায়ে না পড়লে কে উপর-মুখো তাকাতে যায়? লড়াইয়ের সেই ক'টা দিন হরদম আকাশে তাকাতাম—বোমা-টোমা মারে নাকি! আর ব্লাকের পথে এখন তাকাচ্ছি—অন্ধকার কতদূর?

ক'দিন আগেও নাকি ভারি খাসা এক রাত্রি এসেছিল। কী অন্ধকার, কী রকম ঘনকালো মেঘ! দু-পাঁচ মিনিট অন্তর মেঘের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত বিদ্যুতের ফলায় চিরে চিরে যাচ্ছে, আর চড়-চড়-চড়াৎ দেয়ার ডাক। ঝেঁপে বৃষ্টি এলো তারপর, ঝড় উঠল। বর্ডার এলাকার খুঁটি ধরে নেড়ে জলে চুবানি দিচ্ছে। ফৌজের দল কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়েছে—আহা কী মজা, কী মজা! দুর্যোগের ফাঁক পেয়ে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান ওদিকে একাকার হয়ে গেল—ফৌজ-পুলিশ তা সত্ত্বেও মুখ বের করে না আরামের কম্বল থেকে। ঝড়বৃষ্টি থামুক, রাত পোহায়ে সূর্য উঠে যাক আকাশে—ধীরে-সুস্থে তখন লণ্ডভণ্ড ঘর গুছিয়ে আইন আবার চাঙ্গা করে তুলবে।

বর্ডারবাসীরা মানবজাতিকে দুই দলে ভাগ করেছে। এক দল ওত পেতে আছে, সহজ কাজকর্মে বাধা দিয়ে জীবন কিসে দুর্বহ করে তোলা যায়। অপর দলের চেষ্টা, ওদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সহজ পথে কাজকর্ম চালু রাখা আগেকার মতন। সেদিনের সেই রাত্রে দ্বিতীয় দলের জিত। আকাশের দেবতা সদয় হয়ে হঠাৎ যেন মুক্তি-পত্র দিয়ে দিলেন: বিস্তর ভুগছিস মানবপুত্রেরা—যা, তোদের ছাড় করে দিলাম। এই একটা রাত্রি হিন্দুস্থান-পাকিস্তান মুলতুবি। আঠারো বছর আগে যে রকমটা ছিলি, তাই হয়ে গেলি তোরা এই মুহূর্তে।

একাকার সত্যিই। কিছুমাত্র গরজ নেই, তেমনি লোকও ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মনের সুখে খানিক এপার-ওপার করে এলো। খালি-হাতে খালি-মাথায় যাচ্ছে ক'টা লোকই-বা! ওপারের গাদা গাদা জিনিস এপারে চলে এলো, এপারের জিনিসও চালান হয়ে ওপারে গেল। ইচ্ছা মতন চলাচল, কারো চোখ-গরমের ধার ধারিনে—এক-একটা বড় দুর্যোগ এমনিধারা সুলগ্ন মাথায় বয়ে আনে। হে ভগবান, হে খোদাতাল্লাহ্, মানুষের ধড়ে হৃৎপিণ্ড আছে বটে হৃদয় বলে বস্তু নেই—তোমার করুণাই বর্ডারের মানুষের ভরসা।

জ্যোৎস্নারাত একেবারে তুলে দাও ভগবান, চাঁদ যেন কখনো না ওঠে আমাদের আকাশে। সন্ধ্যা-সকাল ঘনঘোর দুর্যোগ চলবে নিত্যিরাতে। তোমার ভাণ্ডারের কৃষ্ণতম অন্ধকার উপুড় করে দিয়ে একাকার করে দেবে এপার আর ওপার।

রাত ঝিমঝিম করছে। আকাশে ঘনঘটা, চাঁদের চিহ্নমাত্র নেই। নিঃশব্দ, গাছের পাতাটি অবধি নড়ে না।

বর্ডার-লাইন—বাংলার ঘাড়ে কোপ পড়েছিল এই লাইন ধরে। শহর কলকাতা থেকে কতই বা দূর! আলো-ঝলমল প্রাসাদনগরী, যেখানে গুণীরা সব থাকেন—শিক্ষিত সংস্কৃতিবান ধনী মানী সেরা সেরা নাগরিক। জানি না, ক'জনে তাঁদের মধ্যে এই বিচিত্রভূমির খোঁজখবর রাখেন। দেশভুঁই ভিটামাটি আত্মীয়-পড়শি থেকে বঞ্চিত হতে হয় নি—গরজটাই বা কী অত খোঁজাখুঁজির! ভূগোলে ডক্টরেট প্রাজ্ঞ দিকপালেরাও জানেন না, ষাট-সত্তর কি একশ' মাইলের ভিতর—অর্থাৎ নাকের ডগার উপরেই সুদীর্ঘ এক রহস্য-এলাকা। মানুষজন সেখানে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের কড়া কড়া আইনকে অবাধে কলা দেখিয়ে বেড়ায়। শিশু জ্ঞান হওয়া ইস্তক শিক্ষা পাচ্ছে: মিথ্যা বই সত্যকথা বলিবে না, অ-সরল পথে অন্ধকারে কেন্নো-কেঁচোর মত চলিবে। নতুন-নীতিপাঠ—বহুদর্শীদের হাতে-কলমের অভিজ্ঞতা। মানুষ ও মাল পাচারের হরেক তন্ত্র-মন্ত্র কায়দা-কানুন। দুই পারের দুই সরকারের সতর্ক চোখ মন্ত্রের গুণে ঠিক সময়টিতে ঘুমিয়ে যায়।

ভয় কে? কোথায় থাকেন ভয় নামক সেই ভদ্রলোকটি?—নেলসন শৈশবে নাকি দিদিমাকে শুধিয়েছিলেন। উপাখ্যানটা শিশুপাঠ্য বইয়ে আছে। তেমনি অগুন্তি নেলসন দুই বাংলার বর্ডার জুড়ে। ভয় কাকে বলে, শেখার ফুরসত পায় নি। প্রাণ বুকের নিচে নয়, হাতের মুঠোর মধ্যে—যখন খুশি ছুঁড়ে দিতে

পারে। দুরন্ত গতির ধাবমান ট্রেন—কামরার তলায় চাকার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখুন, নেংটি-ইঁদুরের মতন বাচ্চারা দু-হাতে রড আঁকড়ে আরামে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে। এক-আধটা নয়, শয়ে শয়ে—এই পথেই রুজি-রোজগার, এই পথেই পেটের ভাত। বাপ-দাদারা ধর্মভীরু সংগৃহস্থ ছিল—পুরানো কালের ছেঁদো-কথা কী হবে আর ভেবে? ভাবনায় পেট ভরবে না।

আজকেও বর্ডারের জোর কপাল। চাঁদ ডুববার আগেই দুর্যোগ এসে পড়বে। আকাশের দুর্যোগ মানে মাহেন্দ্রক্ষণ বর্ডার-মুলুকে ফৌজের দল কম্বলের নিচে হাত-পা ঢুকিয়েছে। ফূর্তি লাগাও—খাড়া হয়ে বুক ফুলিয়ে স্ফূর্তি ভরে আজকের পারাপার। যেন এপাড়া থেকে ওপাড়ায় যাচ্ছি—সেকালে যেমন চলে যেতাম সিগন্যালের অপেক্ষা এখন শুধু। চারিদিকের খবরাখবর নিয়ে অগ্রপশ্চাৎ ভাবনাচিন্তা করে মল্লিকমশায় সিগন্যাল দেবেন, নিশ্চিন্তে নেমে পড়া তখন মাঠে। ওপার থেকেও নামবে। ঘনান্ধকারে আবছা দেখবেন, বিশাল মাঠ জুড়ে ছায়ামূর্তিরা কিলবিল করছে। নিশুতি ধরিত্রী সুখের ঘুম ঘুমাচ্ছে, ভূত-প্রেতের দল সেই ফাঁকে গোপন ডেরা থেকে চুপিসারে বেরিয়ে পড়েছে।

আগে-ভাগে যাত্রা, পঞ্জিকার হিসাবের আগেই। হরবখত যাদের চলাচল, তারা সব জানে বোঝে। এই এতক্ষণ গোণাগণতি এরা কয়েকটি ছিল, কোথা থেকে কারা সব এসে উঠান ভরে ফেলল। পারে যাবার মানুষই শুধু নয়—ভিন্ন কাজের মানুষ এক-দঙ্গল। এরা কেউ পার হবে না, কিঞ্চিৎ ব্যাপার-বাণিজ্য করবে। রাজ্যময় মাথা খুঁড়ে যে জিনিস পেলেন না, খোঁজ করে দেখুন দিকি—সে জিনিস এখানেই পেয়ে যেতে পারেন। বাংলাদেশ বলে নয়, ভারত নয়, দুনিয়ার মধ্যে যত দেশ আছে সর্বত্র এই ব্যাপার। দেশের চৌহদ্দির মধ্যে না পেলে বর্ডারে গিয়ে খোঁজে। কী চাই বলুন না। তারাফুলি ফুল্লরাকে যেমন হাতঘড়ির কথা বলছিল—

লেডিজ জেন্টস যে প্যাটার্নের যেমন মূল্যের অভিরুচি। অথবা জর্মনির ক্যামেরা, জাপানের ট্রানজিস্টার, ফ্রান্সের সেন্ট, চীনের ফাউন্টেনপেন। ভাগ্যবান-ভাগ্যবতীদের শখ মেটানোর জিনিসই শুধু নয়, ঘরব্যাভারি নিত্যিদিনের যতেক জিনিসপত্র। যথা: সুপারি পাট হলুদ লবঙ্গ বিড়িপাতা ধান-চাল—মন ও কুইন্টাল হিসাবে, গাড়ি ভর্তি যার চলাচল। সেজন্য অবশ্য মল্লিকঘাট নয় —ভিন্ন স্থান, আলাদা মানুষ, পৃথক ধরনের বন্দোবস্ত।

কী পেতে চান, বলেই দেখুন না। আকাশের চাঁদ, কোহিনুর মণি, বাঘের দুধ এমনি গণ্ডা তিন-চার জিনিস বাদ দিয়ে বলবেন। আবছা আঁধারে ব্যাপারিরা দেখুন খদ্দের শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। হাত তুলুন, তা-ই বা কেন—চোখই টিপে দিন একটার দিকে। আপনি আমি অন্ধকারে টের পেলাম না—ওরা কিন্তু ঠিক বুঝে নিয়েছে। যেন মাটিতে হেঁটে নয়, বাতাসের উপর ভেসে নিঃসাড়ে কাছে এসে দাঁড়াল। জিনিস বলে দিন ফিসফিসিয়ে—জোব্বার কোন-একটি ছিদ্রে হাত ঢুকিয়ে ম্যাজিকের মতন বের করে দেবে। নিতান্ত হাতে-হাতে না পারলে দশ-বিশ মিনিটের সময় চেয়ে নিয়ে খন্তা হাতে খনি খুঁড়তে ছুটল। মাটির নিচে এখানে-ওখানে খনি— দুর্লভ জিনিসপত্র মাটির নিচে গোপন রেখেছে।

কাণ্ডবাণ্ড দেখে এক মজার ভাবনা মনে আসে। ধরুন, বোমা-টোমা পড়ে আমরা সব খতম হয়ে গেছি। এক-শ দু-শ বছর কেটে গেছে। দেশের মাটির উপর দিয়ে একদা বাঁটোয়ারার লাইন টেনেছিলাম, ইতিহাসের পাতা ছাড়া কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই। চাষার লাঙলের ফলায় অথবা ঘরবাড়ি বানানোর ভিত খুঁড়তে গিয়ে দামি দামি মাল উঠে পড়ছে। এক গাঁটরি সিল্ক, পাঁচ গ্রোস হাতঘড়ি, সাত বাক্স ফাউন্টেনপেন—যত বেরুচ্ছে অবাক হয়ে যাচ্ছে মানুষ, চারিদিক খুঁড়ে খুঁড়ে আর রাখল না।

থমথমে ভাব চারিদিকে, মেঘ চিরে হঠাৎ একবার বিদ্যুতের ঝিলিক। দিব্যি ছোটখাট এক জনতা—মানুষগুলোর মুখ দেখা গেল এতক্ষণে। কড়-কড়-কড় দেয়া ডাকল। বাতাস উঠেছে, ডালপালার মধ্যে বাতাসের দাপাদাপি। নিঃশব্দতা চুরমার হয়ে গেল। বৃষ্টিও হচ্ছে কোনদিকে, জোলো-হাওয়া দিয়েছে। আর কি, তৈরি হও পারে-যাবার মানুষ, বেরিয়ে এসো। সুলগ্ন এসে গেল, সকল দিকে শুভ।

আবুল হাসিম এ-হাতে গুড়ের নাগরি ও-হাতে পোঁটলা ঝুলিয়ে উঠানে নেমে পড়লেন। নেবার জুত হচ্ছে না তো পোঁটলা কাঁধে তুললেন।

কুলি বলে, ঘাড়ে নিয়ে কতক্ষণ থাকবে মামা? হুকুম না পৌঁছলে তো রওনা হওয়া যাচ্ছে না। ভুঁয়ে নামিয়ে রাখো ওসব।

এ লাইনে আবুল হাসিম আনকোরা-নতুন। প্রশ্ন করেন: হুকুম কোত্থেকে আসবে?

ওপারের হেড-অফিস থেকে। আলোর সিগন্যাল আসবে। মল্লিকমশায় নিজ-হাতে পাঠাবেন। পা বাড়ানোর উপায় নেই ততক্ষণ।

হেসে আবার বলে, মিলিটারি চলাচল থেকে সিগন্যালিং জিনিসটা রপ্ত হয়েছে খুব। ভাল হয়েছে। কোন একটা অঘটন ঘটলে দায়টা শেষ অবধি মল্লিকমশায়ের উপরেই তো অর্শায়। চরেরা ঘুরছে—তাদের কাছে পাকা-খবর নিয়ে আঁটঘাঁট বেঁধে মানুষজন তবে তিনি পথে ছাড়বেন।

গুড় ও পোঁটলা আবুল হাসিম নামিয়ে রেখেছেন। নেড়েচেড়ে দেখে কুলি বলে, ও মামা, কত পথ হাঁটতে হবে হিসেব আছে? পার হয়ে গিয়ে বাস-রিক্সার জায়গাও বেশ খানিকটা দূর। একলা ছুটো মাল বয়ে পারবে কেন?

তাচ্ছল্য ভরে আবুল হাসিম বলেন, পারব রে পারব। খেটে খাই আমরা, গদিতে শুয়ে-বসে আরাম করার মানুষ নই।

পারলেও তুমি একলা বোঝা বইবে, ধুমসি ভাগনিটা খালি হাতে যাবে—সেই বা কেমন! পথে হোঁচট খেলে কিম্বা পা পিছলে পড়লে তো চিত্তির, তোমার গুড়ের নাগরি ভেঙে চুরমার হবে। কাজ কি মামা, পোঁটলাটা আমি নিয়ে নিলাম।

বলে দখল হিসাবে চালের পোঁটলা তারাফুলি সামনে সরিয়ে আনল।

পাশ থেকে বীরেশ্বর প্রশ্ন করেন: তোমরা কোথায় যাবে নতুন-দিদি?

ফুল্লরাকে দিদি বলেন, তারাফুলি এই একটু আগে নতুন-দিদি হয়েছে। মায়াবিনী মেয়েটা—এরই মধ্যে সে যেন চিরকালের আপন।

পার হয়ে যাবে কোথা?

জগন্নাথপুর।

চমক খেলেন বীরেশ্বর ফুল্লরা দু'জনেই।

আমরাও তো সেই গাঁয়ে। জগন্নাথপুর হেমকান্ত ঘোষের বাড়ি।

আমরাও সেই বাড়ি।

ফুল্লরা তারাফুলিকে জিজ্ঞাসা করে: কেন, সেখানে কি তোমাদের?

তারাফুলি দেমাক দেখিয়ে বলে, আমার মামার-বাড়ি।

মামার-বাড়ি আমারই তো—

অবাক হয়ে গেছে ফুল্লরা। বলে, হেমকান্ত ঘোষ আমার ছোটমামা।

আবুল হাসিমের গায়ে হাত দিয়ে তারাফুলি বলে, আমার মামা এই যে ইনি। বাড়ি এঁদেরই।

আবুল হাসিম কোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভিজে গলায় বললেন, ছিল বটে, এখন আর নেই। সম্বন্ধ চুকিয়ে-বুকিয়ে দিয়ে বিনিময় করে পাকিস্তানে চলে আসতে হল।

এ কণ্ঠ বীরেশ্বরের বড় চেনা। ডাক্তার খলিলুর রহমানের কাছে অনেকদিন শুনেছেন। আমৃত্যু নিশ্বাস ফেলে গেছেন তিনি।

শান্ত প্রত্যয়-ভরা কণ্ঠে বীরেশ্বর আশ্বাস দিচ্ছেন : কলমের ছুটো আঁচড় দিলেই কি চিরকালের সম্বন্ধ চুকে-বুকে যায় বাবা! বিনিময় না বলে গচ্ছিত বলুন। আশা আঁকড়ে ধরে থাকবেন। দুঃসময়ে টিকে থাকতে পারেন নি, সাহসে কুলিয়ে ওঠে নি—আপনজনের কাছে তাই গচ্ছিত রেখে এসেছেন। সুদিনে যে-যার কোটে আবার সবাই ফিরবে।

ফুল্লরা গাঢ়স্বরে বলল, আপনজন না-ই যদি ভাববেন, এত কষ্ট করে পিঠের চালগুড় বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়টা কি ছিল শুনি?

॥ পাঁয়ত্রিশ ॥

আনোয়ার কখন থেকে পাঁচিলের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মাঠ-পারে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। যেমন স্টিমারের সারেং তাকিয়ে থাকে। মাথার উপরের ঈশ্বরও নাকি—ধার্মিকেরা বলে থাকেন।

দেখা দিয়েছে আলো—ঐ যে! ঐ যে!

চৌকাঠ থেকে আনোয়ার একলাফে মাঠে পড়ল। ডেকে বলে, আসুন সব—বেরিয়ে পড়ুন এইবারে।

চলেছে জোর-পায়ে দস্তুরমতো। দৌড়ানো বলতে পারেন। কে-একজন মৃদুকণ্ঠে বলল, জয় হোক। ব্যাপারিদের কেউ হবে। হুড়োহুড়ির মধ্যে মিনমিনে কথা কারই বা কানে ঢোকে।

আগে আগে আনোয়ার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। তেপান্তরে মানুষ এমনি ছেড়ে দিলে দায়িত্ব শেষ হয় না, সাথে-সঙ্গে থেকে ও-পারের ঘাটে তুলে দিয়ে আসতে হবে। তারপরে ছুটি।

লোকালয় সর্বনেশে জায়গা, মানুষের কাছেই মানুষের বেশি বিপদ। ভাগ্যবশে এ-হেন বৃষ্টি-বাদলা ও অন্ধকার পেয়ে গেছ তো এক-ছুটে লোকালয়-সীমা ছেড়ে মাঠে গিয়ে পড়ো। দাঁড়িয়ে বসে তারপর ইচ্ছে-মতন জিরিয়ে নিও।

তারাফুলির ডান হাতে চালের পোঁটলা, বাঁ-হাতটা ফুল্লরার হাতের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। রঙ্গরসের বয়স ও-দুটির—ছুটোছুটি ও মনের উদ্বেগ হলেও বয়সের গুণ যাবে কোথা। ফুল্লরা বলে, কামানের গোলা হয়ে ছুটেছি ভাই। ঘাটের উঠোন থেকে তেপান্তরের মাঠে আমাদের যেন এক ঝাঁক গোলা বানিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে।

গোলাই বটে! পরিপাটি উপমা। মানুষগুলোর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু নেই, তাবৎ ইন্দ্রিয় বিশ্রামে রয়েছে। শুধুমাত্র

পা দুটো—সেই পায়ের একমাত্র কাজ এখন দৌড়ানো। তল্লাট ছেড়ে মাঠে গিয়ে পড়া। সেই মাঠ পার হয়ে গিয়ে পুনশ্চ লোকালয়—হিন্দুস্থানের এলাকা। সেখানেও যথারীতি বন্দুক উঁচিয়ে আছে জওয়ানে। তখন আবার গোলা-রূপে বাঁই-বাঁই করে ছুটবে, না কচ্ছপের রূপ নিয়ে খোলায় মুখ ঢুকিয়ে নিঃসাড় হবে—সেই সময়ের বিবেচনা। হামেশাই যারা এপার-ওপার করে, তারা রীতিমত দক্ষ—কোন সময়ের কী ব্যবস্থা, তাদের কিছু বলে দিতে হয় না। ভয়-ভাবনা নতুনদের নিয়ে, তাদেরই কারণে আনোয়ার যাচ্ছে। ঘাটোয়ালের চলাচলে নজর রাখো নতুনেরা—যখন যেমন করে, ঠিক ঠিক তেমনি করে যাও।

ছুটতে ছুটতে তারই মধ্যে তারাফুলি ফুল্লরাকে প্রবোধ দিচ্ছে : দাদুর পাশে পাশে, ঐ দেখ, আনোয়ার-ভাই। ভয় কোরো না, দাদুকে ঠিক নিয়ে পৌঁছে দেবে। আমি রয়েছি—নিজেকে নিয়েও ভাবনা নেই তোমার। আনোয়ার-ভাইয়ের চেয়ে আমিও নেহাত কম যাইনে।

ছুটছে, ছুটছে। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, বাতাস আছে। মেয়ে দুটো দল থেকে এগিয়ে পড়েছে বিস্তর। এক সময়ে তারাফুলি থেমে দাঁড়াল। ফুল্লরার হাত ধরে টেনে বলে, থামো, হাঁপ ধরে গেছে। মামু-দাদুরা কত পিছনে। ভাবনা করছেন : সোমত্ত মেয়ে দুটো রাত দুপুরে মাঠের মধ্যে সরে পড়ল কোথা?

ফুল্লরা বলে, গুণ্ডা-বদমাসে ধরে নিয়ে গেছে—তা-ই হয়তো ভাবছেন।

তারাফুলি জোরে জোরে ঘাড় নাড়ল : তা নয়—কক্ষনো নয়। আমায় ধরবে, তেমন গুণ্ডা আজও জন্মে নি। হাত মুচড়ে ভেঙে দেবো না! মামু তা জানে।

খিলখিল করে হেসে উঠল। বলে, এই তো রূপের হাঁড়ি—ধরতে আসবেই বা কোন লোভে?

ফুল্লরা বলে, এটা ভাই আমার কথা—শুনে নিয়ে নিজের বলে চালাচ্ছ। ডাকসাইটে হস্তকুঞ্চিত আমি। দেখছ না, এত বড় পূর্ব-বাংলা চুঁড়ে বর জোটানো গেল না—পাকিস্তান সারা করে হিন্দুস্থানে যাচ্ছি।

তারাফুলি বলে, বাজি ধরো। যাচ্ছি তো জগন্নাথপুর একসঙ্গে। দু'জনের কাউকে তাঁরা দেখেন নি—কে হারে কে জেতে বোঝা যাবে। নির্ঘাৎ আমার জিত—মুখের দিকে তাকিয়েই, দেখো, চোখ বুঁজে পড়বেন।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারাফুলি জায়গা খুঁজছে: বসা যাক কোনখানে? বসে একটু জিরিয়ে নিই। ততক্ষণে ওঁরা সব এসে পড়বেন।

কাদা প্যাচপ্যাচ করছে। আর খানিকটা এগিয়ে উঁচু জায়গা মিলল। ঝুপসি-ঝুপসি জঙ্গল, ইট-ছড়ানো চতুর্দিকে—জোড়া-পিলপে। পিলপের ওপর পাশাপাশি দু'জনে বসে পড়ল।

তারাফুলি বলে, কোথায় বসলে জানো? সীমানার পিলপে—তুমি পাকিস্তানের পিলপের উপর, আমি হিন্দুস্থানের পিলপের উপর।

ফুল্লরার সময়োচিত প্রস্তাব: শত্রুতা দুই রাজ্যে—লড়াই হোক তবে।

তারাফুলি সঙ্গে সঙ্গে রাজি: হোক তাই। নতুন-কিছু নয়—অভ্যেস আছে। বাইশ দিন জুড়ে সেবারে হয়েছিল।

বক্সিং-এর ভঙ্গিতে দু-হাত মুঠো করে এ-ওর দিকে কটমট চোখে তাকায়। ফিক করে হেসে ফেলল ফুল্লরা।

এইও—

ধমক দিল তারাফুলি: লড়াই তোমার কম্ম নয়। ধরতাইয়ের মুখে দিলে পণ্ড করে। হাসবে তো বাইরের দলবল—হাতের কাছে হাতিয়ার এগিয়ে দিয়ে তারস্বরে বাহবা দেয়, আস্তিনে মুখ ঢেকে

তারাই আবার হাসে। নিজেরা হাসলে জান-মান বেহুদা ছেড়ে দেবে কেমন করে?

ফুল্লরা ঘাট মেনে নিল: আচ্ছা আচ্ছা, আর হবে না। আর হাসব না।

চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, দেব-দৈত্য যক্ষ-রক্ষ গন্ধর্ব-কিন্নর নাগ-নিষাদ সর্বভূতে চেয়ে দেখ, রাত দুপুরে মাঠের মধ্যে হিন্দুস্থানে পাকিস্তানে কী ভীষণ জেনানা-যুদ্ধ!

বাহু দিয়ে কঠিন পাকে গলা জড়িয়ে ধরল। তারাফুলি বলে, আঁ-আঁ, দম আটকে সত্যিই যে মারা যাই।

সত্যিই তো মারছি—

ধমকের পালা এবারে ফুল্লরার: সম্মুখ-যুদ্ধে মরণ—সরাসরি স্বর্গে চলে যাবে। তা ভয় পেয়ে তুমি কাঁদতে লেগেছ। লড়াই তোমার কম্ম নয়।

পিছনের সকলে এসে পড়ল। মাঠের উপর এদিক-সেদিক বসে পড়েছে, বিশ্রাম নিচ্ছে। পরের পা যেখানটা পড়বে সে হল আলাদা দেশ—হিন্দুস্থান। বাতাস এখন রীতিমত খর—ঝোপের ডালপালা বাতাসের তোড়ে সপাং-সপাং করে গায়ের উপরে পড়ছে। আষ্টেপিষ্টে চাবকাচ্ছে যেন মানুষগুলোকে।

তারাফুলি আঙুল তুলে দেখায়: মাঠ-কিনারে ঝুপসি-মতন ঐ যে—

মাঠ-পারে সমস্তটা অঞ্চল জুড়ে অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, আলাদা কিছু ফুল্লরার নজরে আসে না।

তারাফুলি বলে যাচ্ছে, মল্লিকমশায়ের তেঁতুলগাছ ঐ। পিছনে বাড়ি। আর কি, বেশি ভয়ের জায়গাটা কাটিয়ে এসেছি। মল্লিকমশায়ের খাস-এলাকা এবার—হেলে-দুলে যাওয়া যাবে।

বিশ্রাম নিয়ে স্ফূর্তিতে সব উঠে পড়ল। যাচ্ছে—যাচ্ছে—। মাঠ কোণাকুণি পাড়ি ধরল। বিস্তর পথ-সংক্ষেপ, তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে।

কিন্তু এ কী—আঁধার মাঠ চিকচিক করে উঠল যে হঠাৎ?

সর্বনাশ, এক-আকাশ মেঘ বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে সমস্ত। পশ্চিম-আকাশে চাঁদও দেখ শয়তানি হাসি হাসছে। আধ ঘণ্টা আর চেপে থাকতে পারল না মেঘ! তা হলে পারে পৌঁছতাম। পৌঁছে গিয়ে ঝাঁকের-কই ঝাঁকে মিশেছি। সর্বাংশে এক আমরা—আলাদা বাছাই করবে তখন কোন্ কায়দায়? কিন্তু হল কই সেটা—কূলে এসে তরী ডুববার গতিক।

তারাফুলির কানে কানে ফুল্লরা বলে, কেন যে ওঠে চাঁদ বর্ডারে—সকলের গালি খেয়ে মরে!

বিপদটা আরো হয়েছে, দুর্যোগের উল্লাসে পথ-সংক্ষেপ করতে গিয়ে একেবারে জওয়ানদের ঘাঁটির সামনে পড়েছে। রাত দুপুরে দলবদ্ধ মানুষ মাঠ পার হয়ে মিলিটারির মুখোমুখি—আন্দাজ করে নিন অবস্থাটা।

সে যা-ই হোক, আনোয়ার ঘাবড়াবে কেন? রাজপথের উপরেই কত রকমের ঝঞ্ঝাট, আর ব্লাকের পথ যখন একটু-আধটু এমন হবেই। সামাল দেবো বলেই তো সঙ্গে সঙ্গে আসা। এ সমস্ত ডাল-ভাত ঘাটোয়ালের কাছে। অসুবিধা যত-কিছু মেয়েলোক দু'টিকে নিয়ে। আমাদের ফুলিকে নিয়েও নয়—আর ঐ যিনি যাচ্ছেন। মাটির উপর ঘাসের উপর কাদার উপর গড়াগড়ি খাওয়া—বুঝিয়ে দে রে ফুলি, কায়দাটা ভাল করে।

ফুল্লরা রাগে গরগর করছে: তুমি পারো, আমার দাদুর মতো বুড়োমানুষও পারবেন, কাউকে নিয়ে কিছু নয়—ভাল করে কেবল আমাকেই বোঝাতে হবে? সেটা কোন্ বস্তু, শুনি?

ফুলি বলে, মাঠের উপর চাঁদের আলোয় খাড়া হয়ে চললে দূর

থেকে নজরে আসবে। আনোয়ার ভাই তাই বলছে, গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটলে কেমনটা হয়? চেষ্টা করে দেখ দিকি। আমায় দেখ— আমি যেমন যেমন করি।

লুফে নেয় ফুল্লরা, কথা শেষই করতে দেয় না: খুব, খুব। কেন্নোয় পারে, বিছেয় পারে, আর জলজ্যান্ত মানুষ হয়ে সামান্য এইটুকু পারব না? এত অপদার্থ ভাবলে তোমরা—ছিঃ!

টুক করে মাটির উপর পড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে, একটা মানুষও খাড়া নেই। গড়াচ্ছে সবাই ভূমিলগ্ন হয়ে।

ওপারেও এই। শ্রীধর মল্লিকের বাড়ি থেকে বড় একটা দল বেরিয়েছে। নীলকণ্ঠ বর্মা, পাশে পাশে প্রমথ বিশ্বাস। চিলেকুঠুরির তরুণ-তরুণীজোড়াও আছে। আরও বিস্তর জন। দিব্যি হেলতে-দুলতে যাচ্ছিল, মেঘ কেটে চাঁদ বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ।

আর কি, যে বিয়ের যে মন্তোর! লম্বা হয়ে পড়ুন সব মশায়রা—

এ-দলের দলপতি নন্দ রাউত। ফড়িঙের মতন মানুষ—তিড়িং তিড়িং করে দলের সামনেটায় একবার চক্কোর দিয়ে গেল। ঠিক আছে, নন্দ প্রসন্ন।

আর কি, গুটিগুটি এগোন এবারে মশায়রা। শব্দসাড়া নয়।

পারাপারের বিধিনিয়ম সব ঘাটেই মোটামুটি এক। বিস্তর ঘা খেয়ে খেয়ে বিজ্ঞেরা তবে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। শুধু মল্লিকঘাট কেন —চাঁদের আলোয় দৃষ্টিটা লম্বা করতে পারেন তো দেখে নিন, তল্লাটের ঘাটে ঘাটে অগুন্তি মানুষ এমনিধারা মাটির উপরে গড়াচ্ছে।

নীলকণ্ঠ বর্মার ভারী দেহ, বিশাল উদর। গড়াতে কষ্ট হচ্ছে বড়। প্রমথ বিশ্বাসকে বললেন, আস্তে চলো হে। সকলের পিছনে পড়ে গেলাম, অন্তত তুমি কাছাকাছি থাকো। খানাখন্দে পড়ে গেলে টেনে তুলতে পারবে।

পুরানো স্মৃতি প্রমথর মনে উঠছে। বহুকাল আগে ছোট্ট বয়সে এই পথেই বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিল। মেজমামার বিয়ের প্রমথ নিতবর। দাদামশায় বরকর্তা। সাদা দাড়ি-গোঁফ, যাত্রার মুনি-ঋষির মতন—চেহারার এইটুকু মাত্র মনে আছে। স্ফূর্তিবাজ মানুষ ছিলেন তিনি। বুড়োমানুষ বলে তিনিও পাল্কিতে যাচ্ছেন, বরের আগে আগে তাঁর পাল্কি। মাঠে নেমে সর্দার-বেহারার উপর বারম্বার হাঁক পাড়ছেন: গলা ছাড় রে মাদার—চতুর্দিকে বিশখানা গাঁয়ের শুনতে পাওয়া চাই। বলি, ভাত খাস নি, বার্লি-সাবু খেয়ে এসেছিস?

বাজনদারদের উপর তড়পাচ্ছেন: আট-ঢোল আট-কাঁসিতে আকাশ এতক্ষণে চৌচির হয়ে ভেঙে পড়বার কথা। তা নয়, বাইজির ঘুঙুর বাজানো হচ্ছে যেন।

তা আকাশ না ভাঙুক, মানুষের কানের পর্দা ফেটে চৌচির হচ্ছে। দাদামশায়ের তবু সন্তোষ নেই—পাল্কি থেকে মুখ বাড়িয়ে বারম্বার চেঁচাচ্ছেন: বাজা রে বাজা—

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল প্রমথ: উঃ, কতদিনের কথা! এককোঁটা আমি তখন। আলোয় আলোয় দিনমান বানিয়ে এই মাঠ তোলপাড় করে চলেছিলাম। আর আজকে—

নীলকণ্ঠ বললেন, খুব বেশিদিন আর কোথা? আঠারোটা বছর আগে তাই চলত। এই তো সেদিন! আঠারো বছর ইতিহাসের হিসাবে কতটুকুই বা!

এই নিশিরাত্রে আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছে বাংলা দেশের উভয় খণ্ড—পূর্ব-বাংলা আর পশ্চিম-বাংলা। মাঝ-বরাবর বর্ডার চলে গেছে দুস্তর নদীর মতন। ধ্বস না নামে কোনখানে, যোগ না দেখা দেয়—সীমানা অটুট রাখবার জন্ত অতন্দ্র উভয় পক্ষ। জওয়ানেরা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায়, রাজকোষ জলের মতন অর্থ

চালছে। ভাত জোটে না আমাদের, দায়ে পড়ে তবু বন্দুকের টাকা যোগাই।

সুখী মানুষেরা আছেন বই কি। দু-পারেই। গায়ে আঁচড়টি লাগে নি—স্বাধীনতা বিশেষ করে তাঁদেরই। কণিকামাত্র লোকসান ঘটে নি, পুরোপুরি মুনাফা। দিনমানে সমারোহে স্বাধীনতা-ভোগ, নিশাকালে নিশ্ছিদ্র নিদ্রা। আনন্দযজ্ঞে আমাদের কে ডাকতে যাচ্ছে? উদ্বাস্তু আমরা—অন্ত্যজ। ভারবোঝা স্বরূপ—যাদের বাংলায় এসে আশ্রয় নিয়েছি, তাদের কাছে। জনান্তিকে বলাবলি হয়: বেটারা মহাভারতের ঘটোৎকচ। নিজেরা তো মরবেই—আর দেখ, কুরুকুল আমাদের চেপে নিয়ে পড়েছে—আমাদেরও না মেরে ছাড়বে না।

দিনমানটা অন্নচেষ্টায় কাটে, রাত হলে মুখ তুলে ওদিক পানে তাকানোর ফুরসত পাই—আমার বাপ-পিতামহের ভিটা যে-রাজ্যে পড়ে রয়েছে। স্বজনেরা কে কোন দিকে ছিটকে গেল—নিশ্বাস ফেলি তাদের কথা ভেবে। হিন্দু-মুসলমান বলে ফারাক নেই এ বাবদে।

পাশপোর্ট-ভিসা জোটানো ক'জনেরই বা সাধ্যে কুলায়। তা-ও ইদানীং বন্ধ। মন মানে না, পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। তারপরে এই কাণ্ড দেখুন—কখনো ছুটে পালানো, কখনো বা ভুঁয়ে গড়ানো।

অপরাধ আমাদের কি, বলুন দিকি। নেতামশায়দের প্রাণ ভরে বিশ্বাস করা, নেতার কথায় জান-মান কবুল করা, আর নেতার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে আকাশ ফাটানো? চাঁদ কি দেখতে পাচ্ছে আমাদের এই হাল? চাঁদ যেন কৌতুকী মানুষ—উপর দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হতে পারে। কালো চাদরের মতো মেঘে ক্ষণে ক্ষণে মুখ ঢাকছে—টিপিটিপি মজা দেখছে আবার চাদরটা সরিয়ে দিয়ে। খাড়া খাড়া মানুষ—হায় হায়!—পলকে কেমন

কচ্ছপ হয়ে গেল। কচ্ছপ হয়ে গুটগুট করে বর্ডার পার হচ্ছে। এই রাত্রে ঘাটগুলোর এপারে-ওপারে দলের পর দল—বীরেশ্বরের মতন প্রবীণ অধ্যাপক এবং নীলকণ্ঠের মতন দিকপাল পণ্ডিতও দলের মধ্যে। সবসুদ্ধ কচ্ছপ বানিয়ে ছাড়ল।

যাচ্ছে মানুষ গড়িয়ে গড়িয়ে। শ্রান্তিতে কাতর, তবু থামা চলবে না। বিপদের পথ সম্পূর্ণ কাটিয়ে তবে বিশ্রাম। অন্য-কিছু পারে না তো গালিগালাজ করছে সাধ মিটিয়ে। আঙুল মটকে মটকে অভিশাপ দিচ্ছে: যাদের কারণে এই হেনস্থা, বিচার কোরো তাদের খোদাতালা—এত পাপের রেহাই না-হয় যেন।

অবিরাম এমনি সব কথা—মুখের কথাতেই যতদূর পারে প্রতিহিংসা নিচ্ছে।

গড়াতে গড়াতে নীলকণ্ঠ বর্মা একবার বলে উঠলেন, ভাল হচ্ছে—খুব ভাল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার গেরিলা-লড়াই শেখা হয়ে গেল। এরই তো দিনকাল। এত আয়োজন নিয়েও আমেরিকা নাজেহাল হচ্ছে ভিয়েতনামে। মহাচীনেও একদা চিয়াং-কাইশেকের পিছনে আমেরিকা খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, চিয়াংকে তবু দেশ ছেড়ে পালিয়ে দ্বীপে আশ্রয় নিতে হল। গেরিলা-লড়াইয়ের গুণে।

প্রমথ বিশ্বাস বলল, গেরিলা এমনিধারা জিনিব?

ঠিক এই। হাতে অস্ত্রশস্ত্র নিলে, বোমা নিয়ে নিলে—পুরোপুরি লড়ুইয়ে সিপাই তখন।

আর এপারে বীরেশ্বর বলছেন, দেখ, অতি-মন্দের মাঝেও ভাল দিক আছে। ঘনকালো মেঘের গায়ে রুপালি রেখা। মতলবী নেতাদের উস্কানিতে জনতা ক্ষেপেছিল, অস্বীকার করি কেমন করে?—দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দেড় যুগ যেতে না

যেতেই চোখ ফুটে গেছে সকলের, কত ধানে কত চাল বুঝে নিয়েছে। মূল-গোঁসাই যাঁরা, তাঁদেরই ফুটেছিল সকলের আগে। কর্ম ফতে হতে না হতেই দিব্যজ্ঞান—পরিণামের আন্দাজ পেয়ে আঁতকে উঠেছিলেন তাঁরা। থুতু যা ফেলেছেন, গিলতে পারলে বোধকরি বেঁচে যেতেন, অনেকেরই এমনি অবস্থা।

॥ ছত্রিশ ॥

শুনতে পাই, পৃথিবী এক হয়ে আসছে—মানুষ বিশ্বনাগরিক। সে ভাবনা শিল্পীর, সাহিত্যিকের, বৈজ্ঞানিকের। ধড়িবাজ রাজনীতিকের নয়—খবরের-কাগজে নিত্যি যাদের ছবি ওঠে, সভায় সভায় যাদের ডাক, ডাকটিকিটে যাদের মুণ্ড, নোটের উপর যাদের নাম-ছাপা। দু-তরফে নিঃশব্দ-লড়াই চলেছে যেন—ঐক্য এরা কত গড়তে পারে, ঐক্য ওরা কত ভাঙতে পারে। জিত আপাতত ও-পক্ষের। এক-ভিয়েতনাম এক-কোরিয়া এক-জর্মনি কেটে কেটে দু-খণ্ড করেছে। এবং আমাদের আঁতের ঘা যেখানে—এক-বাংলা কেটে দুই বাংলা। 'সোনার বাংলা তোমায় আমি ভালবাসি' স্থলে আইন মতে গাওয়া উচিত 'সোনার পশ্চিম-বাংলা তোমায় ভালবাসি'। আর ওঁরা গাইবেন 'সোনার পূব-বাংলা—' উহুঁ, তা-ও বুঝি অচল—গাইতে হবে 'সোনার পূর্ব-পাকিস্তান—'।

হিন্দু আর মুসলমান এক দেশের মানুষ, এক ভাষা তাদের মুখে, একই পরিবারে জন্ম কত কত জনার! তবু যেহেতু ধর্মটা আলাদা, তারা আলাদা দুই জাত। এরই নাম টু-নেশনস্ থিয়োরি, দ্বিজাতি-তত্ত্ব। মুসলমানের আলাদা ভূমি চাই—বঙ্গভঙ্গ এই দাবির উপরে।

অবাস্তব জিনিস জবরদস্তিতে খাড়া করা হল—এক-বাংলা হল দুই-বাংলা। র‍্যাডক্লিফ সাহেব সালিশি করছেন: মনে করো এই বরাবর লাইন—

কোথায় সাহেব, কোন্‌খানটা?

যেমন যেমন দাগ কেটেছি ম্যাপের উপরে—

এটা আমার দলিচঘর, এটা রসুইঘর—তারই মাঝ দিয়ে লাইন চলে গেল?

হ্যাঁ, তাই।

বিচার অন্তে সাহেব স্বদেশে উড়লেন। সেকাল হলে এবং চীনের অধ্যবসায় থাকলে পাথুরে গাঁথনির মহাপ্রাচীর তোলা হত বোধহয় বেবাক তের-শ' মাইল জুড়ে। তাতেও কি ঠেকাত? চীনেরা পারে নি কিন্তু। মোঙ্গলদের রুখবার জন্য মহাপ্রাচীর— তাদেরই বড়কর্তা কুবলাই খাঁ সদলবলে এসে চীনে দখল গাড়লেন।

পাথুরে পাঁচিলের অনুকল্পে পুলিশ আর ফৌজ দিয়ে এরা জ্যান্ত মানুষেরই পাঁচিল তুলে দিয়েছে—দেখুন, দেখুন। দেশের মানুষকে তাতে মেরে অস্ত্র দিয়েছে হাতে হাতে। ঘোড়ার-ডিম করেছে, প্রয়োজনের পথ রুখতে পারে না কেউ। যাওয়া-আসা ঠিকই চলেছে—কখনো কচ্ছপের মতন গুটি-গুটি, কখনো বা কুরঙ্গের মতন ঊর্ধ্বশ্বাসে। লোকের হয়রানি ও অর্থব্যয়—মুনাফা এইমাত্র।

নাটের গুরুগণ এমনি খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। কাজ হাসিল হতে না হতেই আক্কেল-গুড়ুম : কী সর্বনাশ করে বসলাম!

গান্ধিজী তো সঙ্গে সঙ্গেই তোবা করলেন : আমি কিছু জানিনে। দেশ-খণ্ডনের সঙ্গে কেউ যেন কখনো গান্ধির নাম না জড়ায়। আমি আজ একেবারে একলা। জওহরলাল ও প্যাটেলের অবধি ধারণা, বুঝতে আমার বিলকুল ভুল হচ্ছে। এ-স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কেউ সেটা আজ ধরতে পারছিনে। We may not feel the full effect immediately, but I can see clearly that the future of independence gained at this price is going to be dark.

দ্বিজাতি-তত্ত্বের মুল-গায়েন জিন্নাহ্-ও পরিষ্কার মালুম পেয়েছেন। খোলাখুলি কী আর বলবেন—জাঁদরেল ব্যারিস্টার-মানুষ কান ঘুরিয়ে নাক দেখালেন—মানেটা অবিশ্যি একই দাঁড়াল। পাকিস্তান কনস্টিট্যুয়েন্ট-এ্যাসেমব্লির উদ্বোধনী বক্তৃতা— স্থান করাচি : অতীত ভুলে যাও। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ভুলে

এক হয়ে নবরাষ্ট্র গড়ে তোল। ধর্ম আচার-ব্যবহার যেমনই হোক, রাষ্ট্রের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। You may belong to any religion or caste or creed, that has nothing to do with the business of the State.

একেবারে গঙ্গাজল! এ-জাত-ও-জাত নিয়ে এখন আর তিলেক মাত্র অভিমান নেই, কণ্ঠধ্বনিতে মালুম। এত কাটাকাটি—মানুষ কাটা এবং দেশ কাটা—কিসের তরে তবে শুনি?

জিন্নাহ্-র দুই পয়লা-নম্বুরি সাগরেদ-সুহৃদ—সারওয়ার্দি ও খলিকুজ্জমান। দিব্যজ্ঞান তাঁদেরও এসেছে, 'তাই তো' 'তাই তো' করছেন। খলিকুজ্জমানকে সারওয়ার্দি চিঠি দিলেন: দ্বিজাতি-তত্ত্ব মেনে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে থাকব, আমি তার পক্ষপাতী নই। I am not in favour of adopting an aloofness dependent upon the Two-nation Theory.

আর খলিকুজ্জমান প্রায় এমনি কথাই কেতাবে লিখলেন: After the partition it proved positively injurious to the Moslems of India and on a longview basis for Moslems everywhere.

ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়। বড়-পাণ্ডারাই সব ঘাবড়ে যাচ্ছেন। লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান-প্রস্তাব এনেছিলেন ফজলুল হক। ভাগাভাগির পর সেই মানুষেরই মুখের উক্তি: ভারতের রাজনীতিক খণ্ডন আমি বিশ্বাস করিনে, ভারত-শত্রুদেরই এই কাজ। I do not believe in the political division of India, and it is the enemies of India who divided it.

গান্ধিজীর আরও কবুল জবাব: দেশ-বিভাগে বিশ্বাস নেই আমার। শিগগিরই হয়তো সীমান্ত-প্রদেশে যাবো, তার জন্যে পাশপোর্ট নেবো না।

নাথুরাম গডসে বাঁচতে দিলে যেতেনই হয়তো, খুব স্পষ্ট ভাষায়

বলেছিলেন। আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে দেশ ভাগ হবে, তা-ও অবশ্য বলেছিলেন এর আগে।

মল্লিকঘাট থেকে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে বাসের লাইন। বাস থেকে নেমে আবার সাইকেল-রিক্সা। দুটো রিক্সা নিয়েছেন—এক রিক্সায় বীরেশ্বর ও আবুল হাসিম, অন্যখানায় মেয়ে দুটো। আবুল হাসিমের নিজের গ্রাম—তাঁদের রিক্সা আগে, তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গল্প আর গল্প—পথের দু-ধারে যা-কিছু দেখেন, তাই নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে গল্প জুড়ে দেন। কী সব দিন গিয়েছে! এই জগন্নাথপুরের মানুষজন ঘরবাড়ি তো বটেই, মাঠঘাট গরুবাছুর গাছগাছালি পর্যন্ত একেবারে মুখস্থ ছিল—গড়গড় করে এখনো বোধহয় নির্ভুল বলে যেতে পারেন।

গল্প করেন আবুল হাসিম, আর ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে নীরব হয়ে যান একএকবার।

বাড়ি দেখা দিল। বাড়ি বিনিময়ের ব্যাপারে আবুল হাসিম যান নি, বিলিবন্দোবস্ত ভাইজানই সব করেছিলেন। হেমকান্তর দেওয়া বিজ্ঞাপন দেখিয়ে ভাই বলেছিলেন, বিনিময় করে ফেলি—সেই মানুষের যদি পছন্দ হয়ে যায়। এপারে-ওপারে কখন কোথা হল্লা ওঠে—সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থেকে পারা যায় না। বাঁশতলি গ্রাম আমি জানি, ভাল জায়গা। কলকাতায় গিয়ে ভাল রকম খবরাখবর নিইগে চলো।

আবুল হাসিম যান নি কলকাতায়। রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, যা করতে হয় তুমি একলা করোগে। আমায় ওর মধ্যে ডেকো না, আমি সইতে পারিনে। যেদিন বলবে, তোমাদের পিছন পিছন বেরিয়ে পড়ব। আর কিছু পারব না।

বড় ভাই একাই চললেন কলকাতা কৃপাসিন্ধু লেনে। কথাবার্তা হল। হেমকান্ত পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন, তক্তাপোশ ছেড়ে

নামতে পারেন না। প্রণব এলো জগন্নাথপুরের বাড়ি দেখতে, সঙ্গে এক প্রবীণ ব্যক্তি—দুর্গাশঙ্কর দে। ওকালতি পাশ করেছিলেন, কিন্তু একদিনও প্রাকটিশ করেন নি—বিপ্লব-কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দুঃখে এখন শিয়াল-কুকুর কাঁদে। বুড়োহাবড়া একদল নিয়ে হেমকান্ত বাড়িতে পিঁজরাপোল বানিয়ে তুলেছিলেন—ইনিও একটি তাঁদের মধ্যে। ফ্যাক্টরি উঠে গেছে—সবাই বিদায় হয়েছেন। নিরুপায় দুর্গাশঙ্করেরই কেবল যোগাযোগ আছে। যেহেতু কোন এককালে আইন পাশ করেছিলেন, সেই সুবাদে দুর্গাশঙ্কর প্রণবের সঙ্গে সরেজমিনে চললেন।

কথাবার্তা পাকা হল। প্রণবকে বাড়ির দখল দিয়ে সবসুদ্ধ বিদায় হয়ে যাচ্ছেন। দরজার সামনে এই আজকের মতোই সাইকেল-রিক্সা এসে দাঁড়িয়েছিল। হাসিমের বউ সেই সময় এক কাণ্ড করে বসলেন। ছেলেটা মারা গেলে পিছনের চাঁপা-তলায় মাটি দিয়েছিল—সেই কবরের উপর আছড়ে পড়লেন তিনি। আর বুক ছেড়ে কান্না। ছেলে যেন এক্ষুনি মারা গেল, বিদায়ের এই সকালবেলাতেই। কান্না সংক্রামক হল, অন্য যাঁরা যাচ্ছেন সবাই কান্না জুড়ে দিলেন। বাড়ি ছাড়ার বেদনা, তার সঙ্গে পুত্রশোক মিলেমিশে একাকার। বড়দের দেখে শিশুরাও হাউ-হাউ করে কাঁদছে। কান্নার তুফান বয়ে যায়। কাঁদতে কাঁদতে সকলে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

কতদিন পরে আজ আবার বাড়ি এসেছেন। অন্যের বাড়ি এখন—আবুল হাসিম আর ভাগনি তারাফুলি আগন্তুক অতিথি। রিক্সা কিড়িং-কিড়িং করে ঘণ্টা দিচ্ছে। ডাকে : কে আছেন?

ভিতর থেকে রুক্ষকণ্ঠ : যারা থাকবার, সবাই আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হুল্লোড় কেন? দরজা ভেজানো, ঘরে এসো।

দরজা ঠেলে সকলে ভিতরে গেলেন। হেমকান্ত তক্তাপোশে

আড় হয়ে আছেন যথারীতি। বীভৎস বিকৃত মুখ—একটা চোখ কানা, আর একটা চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে। দেখে গা শিরশির করে।

হাসিমুখে হেমকান্ত বীরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, চিনতে পারছেন না তো? কেউ পারে না। আয়নায় দেখতে গিয়ে আমার নিজেরই ধাঁধা লেগে যায়। আপনি কিন্তু দিব্যি আছেন। চেহারা খুব একটা বদলায় নি।

বীরেশ্বর বললেন, দুর্ঘটনা হয়েছিল সে খবর জানি। কিন্তু এতখানি ভাবতে পারি নি। বউমাকে নিয়ে যশোরের বাসায় গিয়েছিলে—অনেক দিন হলেও চেহারা কথাবার্তা কিছুই ভুলতে পারি নি। যেন, আগুন এক চাংড়া।

আগুন নিভে গিয়ে বিলকুল এখন ছাই—

কী বিষম কৌতুকের ব্যাপার—খল খল করে হেমকান্ত হেসে উঠলেন: পোড়া চেহারার বাইরেটা দেখছেন, মনের ভিতরেও ঠিক এই। আগুনে চারিদিক পোড়াব ভেবেছিলাম—কারো কিছু হল না, নিজেই পুড়ে ছাই হলাম। কিছু সাগরেদ জুটিয়েছিলাম, তাদেরও এই দশা। আহা, আপনারা সব দাঁড়িয়ে রইলেন যে—দুটো চেয়ার রয়েছে। মেয়েরা এখানে তক্তাপোশে এসে বোসো।

প্রণবকে ডাকছেন: এ-ঘরে আয়, দেখ্‌সে এসে কারা সব এসেছেন।

ফুল্লরা ও তারাফুলি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আবুল হাসিম কপালে হাত তুললেন।

হেমকান্ত বললেন, আপনাকে চিনলাম না কিন্তু—পরিচয় দিন। লীলার চিঠি পেয়েছি, মেয়েদের একজন তো ভাগনি আমার। কোন্‌টি?

তারাফুলি তাড়াতাড়ি বলল, দু-জনেই। নাম বলা হবে না, বাদ দিয়ে দেবেন তাহলে একজনকে।

সহাস্তে হেমকান্ত বললেন, বোলো না তবে নাম। কী দরকার! একটি ভাগনি আসছে, চিঠিতে লিখেছিল। একজোড়া যদি পেয়ে যাই, লাভই তো আমার।

সেই ঘরে ঢুকে প্রণব পর্যন্ত অবাক। দরজা-জানলা সবগুলো খোলা, কত আলো এসেছে। বাবার মুখে হাসি। নিত্যিদিনের গুমোট ভাব ধুয়ে-মুছে সাফসাফাই হয়ে গেছে। হাসিখুশি সকলেই। ঘরময় প্রসন্নতা।

তারাফুলিকে নিয়ে ফুল্লরা উঠে দাঁড়াল: ঘট হয়ে বসে থাকতে পারিনে। ভিতরে যাচ্ছি ছোটমামা।

প্রণবকে হেমকান্ত বললেন, তোর বোন এরা। মা'র কাছে নিয়ে যা।

তারাফুলি বাধা দিয়ে বলে, নিয়ে যেতে হবে কেন? যাচ্ছিই তো আমরা মামানির কাছে। নিজেরা যেতে পারব।

আবুল হাসিমকে প্রণব চেনে। বিনিময়ের সময় এই বাড়িতেই দেখেছিল। পুরুষমানুষ হয়েও মেয়েদের মতন চোখের জল মুছতে মুছতে রিক্সায় উঠেছিলেন। সামলেছেন এখন, হাসি-ভরা মুখ। দেখে ভাল লাগল। বলে, বাঁশতলি থেকেই আসছেন? বাবা, হাসিম সাহেব ইনি—আমাদের দেখতে এসেছেন।

হেমকান্ত বললেন, আমাদের দেখবেন—নিজের ঘরবাড়ি ফেলে গেছেন, তা-ও দেখবেন। সেই তো আসল—সেই দেখার জন্তেই আসা। মন টেনেছে, পাগল হয়ে ছুটেছেন। যুক্তিতর্ক বাধাবিপদ এই পাগলামির মুখে কুটোর মতন তুচ্ছ হয়ে যায়। ভুক্তভোগী যে আমি, নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারি। পাগল আমিও। অথচ ক'দিনই বা কাটিত আমার বাঁশতলির বাড়িতে!

বাঁশতলির নামে উচ্ছুসিত হয়ে উঠলেন: আপনি বাঁশতলি থেকে আসছেন—খবর শুনব আপনার মুখে। জষ্ঠিমাসের আম-কাঁঠালের খবর, পৌষমাসের রস-গুড়ের খবর। ফাল্গুনে ফকির-

বাড়ির মেলা আর চৈত্রে গাজনতলার মেলার খবর। নড়তে-চড়তে পারিনে, ও-তল্লাটের মানুষ দেখি নি কতদিন। ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন—একসঙ্গে একেবারে চারজনকে পেলাম। জিজ্ঞাসা এই গলা অবধি জমে রয়েছে।

হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে সামলে নিলেন নিজেকে। প্রণবকে বলেন, আবোল-তাবোল একনাগাড় বকে যাচ্ছি। নিয়ে যা এঁদের, হাত-পা ধুয়ে বিশ্রাম নিন গে। কথাবার্তা পরে।

পোঁটলা ও গুড়ের-নাগরি দেখিয়ে হাসিম প্রণবকে বললেন, এই দুটো বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাও।

হেমকান্তকে বললেন, আপনারই গাছের গুড়—যার খবর জানতে চাইলেন। আপনারই ক্ষেতের চাল। পিঠে খাবেন বলে মেয়েরা পাঠিয়েছে।

মা-লক্ষ্মীরা পাঠিয়েছেন? এই দিকে প্রণব, আমার কাছে নিয়ে আয়। আমার বাড়ির জিনিস—

প্রণব শিয়রের কাছে নিয়ে এলো, হেমকান্ত গড়িয়ে এসে পোঁটলায় মাথা রাখলেন। সে মাথা তোলেনই না আর। ক্ষণপরে দেখা গেল, দু-চোখে ধারা গড়াচ্ছে।

সন্ধ্যা। নিষ্প্রাণ বাড়িতে উৎসব জমেছে অনেক—অনেকদিন পরে ও-পারের চারটি মানুষ এসে পড়ে। উৎসবের মধ্যে ফুড়ুত করে দিনটা কেটে গেল। সন্ধ্যাবেলা হেমকান্তর ঘরে আবার।

আবুল হাসিমের দিকে চেয়ে হেমকান্ত বলেন, বাড়ি-ঘরদোর দেখলেন ঘুরে ঘুরে? ঠিক আছে? চাঁপাতলায় গিয়েছিলেন তো?

শিশুর কবর চাঁপাতলায়। বাঁশ চিরে জাফরি করে ঘিরে দিয়েছেন এঁরা। স্বর্ণচাঁপা ফুল ফুটেছে ডালে ডালে। সুগন্ধে বাতাস মাতোয়ারা। ঠাণ্ডা ছায়া। এমন পরিচ্ছন্ন, একটা শুকনো পাতা কোথাও পড়ে নেই।

তারাকুলি বলল, মামানিকে ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছে—মামা তাই আচকাচ করছিল : ভুল করেছি—কেন আনলাম না রে! ঘরবাড়ি শুধু নয়, গোরস্থানেরই বা কী যত্ন! মামানি বড় শান্তি পেত।

হাসিম সাহেব জুড়ে দেন : এত যত্ন আমরা করতে পারতাম না।

বাইরের বারান্দার একটা দিক দরমায় ঘেরা। দুর্গাশঙ্করের আস্তানা সেখানে। কাল থেকে তিনি অনুপস্থিত—কোন্ গাঁয়ে একটা বিয়ে ছিল, সেইখানে খেয়েদেয়ে এলেন। এই তাঁর পেশা—এখানে-ওখানে খেয়ে বেড়ানো। নিমন্ত্রণ লাগে না, খবর শুঁকে শুঁকে গিয়ে হাজির হন। কোথাও যেদিন জুত হল না, অগতির-গতি এ-বাড়ির রান্নাঘর আছে। টপ করে পিঁড়ি একটা পেতে নিয়ে বসে পড়েন। আগে কিছু বলতে হয় না।

খানিক আগে দুর্গাশঙ্কর ফিরেছেন। প্রণব তাঁকে নিয়ে ঢুকল। হেমকান্ত পরিচয় দিয়ে দিলেন : দুর্গা-দা—আমার দাদার জুড়িদার। অ্যাকসনের সময় দু'জনে একত্র ছিলেন। এসে অবধি আমার এই ভাগনি দুটো ছটফট করছে তোমায় চোখে দেখার জন্য।

তরুণী মেয়ে দুটির দৃষ্টি দেখে বৃদ্ধ বিপ্লবী বুঝি লজ্জা পেয়ে যান। নস্যাৎ করে দিলেন একেবারে : জুড়িদার না ছাতি! তা হলে তো ঝুলিয়ে দিত। সুখের প্রাণ নিয়ে এমন ভোজ খেয়ে খেয়ে বেড়াতে হত না।

তবে কি ছিলেন ?

আবদারের ভঙ্গিতে তারাকুলি বলল, উড়িয়ে দিলে ছাড়ছিনে। বলুন।

তল্পি বয়ে বেড়িয়েছি একটু-আধটু। গোড়ায় গোড়ায় নবকান্তও বয়েছে। দু-জনে একই দাদার তাঁবে ছিলাম। সে দাদা ফৌত হলেন তো নবকান্তই তখন দলের দাদা। আগে একজনের হুকুম তামিল করেছি—নবকান্ত দাদা হয়ে গিয়ে সে-ও হুকুম ঝাড়তে লাগল। আমার পোড়াকপালে প্রোমোশন নেই।

দিলেও কি নেন আপনি প্রোমোশন? দেওয়া হয় নি?

কৌতুক-কণ্ঠে হেমকান্ত বলেন, বলুন বলুন, শেষটুকুই বা চেপে যাচ্ছেন কেন? কর্তা হতে আমিই সাধাসাধি করেছিলাম। গ্রিলের কারখানার নামে যখন ছোটখাট এক আর্সেনাল গড়ে তুলছি। কিন্তু ঝামেলা এড়িয়ে কর্মী হয়ে খাটতেই তো আপনি মজা পান।

এতক্ষণ ধরে নিজের প্রসঙ্গ—দুর্গাশঙ্কর আর সহ্য করতে পারেন না। সেকালের দাদাদের কাছে মন্ত্রগুপ্তির শিক্ষা। হেলাফেলায় আত্মদান করেছে—ছেলেটি কে, কোনো দিন তার হদিস হল না। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লচাকি এক সঙ্গে জীবন নিতে গেছেন, একই ধর্মশালায় পাশাপাশি শয্যা—কেউ কারো আসল নাম জানেন না। বলবার এক্তিয়ার নেই।

বিব্রত হয়ে দুর্গাশঙ্কর চাপা দিতে চান: যাকগে যাকগে, চুকেবুকে খতম হয়ে গেছে—হেমকান্তর আর্সেনাল হেমকান্তকেই পুড়িয়েছে শুধু। পুরনো-কাসুন্দি এখন আর ঘেঁটে লাভটা কি?

হেমকান্ত বলেন, লোকসানই বরঞ্চ। স্বাধীন দেশের ভিতরে এমনি সব কারসাজি—টের পেলে পেন্সন তোমার কেটে দেবে। সরকারের টাকা রমারম আর খরচ করতে হবে না।

একচক্ষু সকলের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, দুর্গাদা'র নামে কাগজে কবিতা বেরিয়েছে। পড়ে এঁদের শুনিয়ে দে প্রণব।

ইতিপূর্বেও প্রণবকে পড়তে হয়েছে। সেদিন বাইরের কেউ নয়—দুর্গাশঙ্কর আর কল্যাণী শ্রোতা। তাকের উপর থেকে ছাপা পত্রিকাটা নামিয়ে নিয়ে প্রণব কবিতা পড়ছে:

'পেন্সনভোগী বিপ্লবী হাঁটে শিয়ালদহের মোড়ে।
মাসোহারা বিশ টাকা—
আটহাত ধুতি, ময়লা ফতুয়া, পায়ে তার ছেঁড়া চটি।

হাঁটুর নিয়ে গোল কালো ছ'টি গুলির চিহ্ন আঁকা।
হাঁটতে হাঁটতে কখনো কাশছে
শ্বাস সে নিচ্ছে জোরে,
হাঁটছে হাঁটছে আশিটা বছর
বের হয়ে সেই নিষিদ্ধ নীল ভোরে।

সকল দৃষ্টি দুর্গাশঙ্করের দিকে তাকিয়ে পড়েছে। লজ্জায় এতটুকু তিনি।

সকৌতুকে চেয়ে দেখে হেমকান্ত বললেন, সে কবি দুর্গা-দা'কে ঠিক চেনে না—দু-চারটে ভুল করে বসেছে। বয়সটা কত হল দুর্গা-দা? জন্মদিনের মচ্ছব হবে না বলে বয়সের কেউ হিসাব রাখে না। তবে আশির বিস্তর নিচে, সেটা জানি। গুলির দাগও ছ'টা মাত্র নয়—সর্বাঙ্গ চালুনির মতন ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, উনি বলেই চলে ফিরে বেড়ান। চলাফেরাও শিয়ালদহের মোড়ে নয়—এ-গ্রামে সে-গ্রামে ভোজ খেয়ে খেয়ে বেড়ান, আর নয় তো এই গরিবখানার নুন-ভাত।

একটু হেসে আবার বললেন, বিশ টাকা পেন্সন—সে-ও মিথ্যে কথা। মহানুভব আমাদের স্বদেশি সরকার। বিশের উপরেও পাঁচ-পাঁচটা টাকা বেশি—পঁচিশ।

দুর্গাশঙ্কর নেই, কখন ইতিমধ্যে চুপিসারে সরেছেন।

হা-হা-হা—উচ্চহাসি হেসে হেমকান্ত বললেন, এই জিনিসটা দুর্গা-দা'র বড্ড রপ্ত। পালানোয় ওঁর জুড়ি নেই। দাদার অ্যাকসনের পর—পুলিশ গিজগিজ করছে, দাদা তারই মধ্যে কখন চোখ টিপে দিয়েছে, উনি সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া। কেউ টেরই পেলো না, সাংঘাতিক মানুষ একজন সাংঘাতিক মাল জামার নিচে নিয়ে পালিয়ে গেল।

তারাফুলি ও হাসিম সাহেব এবারে উঠলেন। কয়েকটা দিন মাত্র

আছেন, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে করে বেড়াচ্ছেন। তেমনি কোনো একখানে বেরুলেন দু-জনে। মুসলমান গৃহস্থ বিস্তর পালিয়েছে, আছেও তবু অনেক। হিন্দু-মুসলমানে সেই তো মেশাল হয়ে আছে আগেকার মতন—ভাগাভাগিতে মুনাফাটা কি করলে জিজ্ঞাসা করি, লোকহত্যা ও লোকের সর্বনাশ ছাড়া ?

ফুল্লরার বিয়ের কথাবার্তা না হচ্ছে এমন নয়। কিন্তু সে-জিনিস বীরেশ্বর আর কল্যাণীর মধ্যে—এমন কি হেমকান্তর কাছেও নয় তেমন। প্রণব একবার দু-বার মাথা ঢোকাতে গিয়েছিল—গিয়ে ফুল্লরার ধমক খেয়ে মরে : নিজের বিয়েই হল না, পরের বিয়ের মাতব্বরি—ছোটমুখে বড়কথা কেন রে ? ছ-মাস বয়সে, শুনেছি, একবার কলকাতা এসেছিলাম। কলকাতা দেখব। কলকাতাটা তুমিই ভাল করে দেখিয়ে দেবে। কবে যেতে পারবে, বলো।

আবদার ধরল ফুল্লরা : বড়মামার কথা শুনব। বলো আমায় ছোটমামা।

হাত ঘুরিয়ে হেমকান্ত উড়িয়ে দেন : কী আমি জানি, আর কি তোকে বলব। তিনি দাদা, আমি ছোটভাই—এসব সাংসারিক সম্বন্ধ তুচ্ছ তাঁদের কাছে। বয়সেও অনেক ছোট আমি তখন।

নাছোড়বান্দা মেয়েটা তবু 'বলো' 'বলো' করছে। হাত এড়াতে হেমকান্ত বললেন, দুর্গা-দা'কে ধরিস বরং নিরিবিলি। দিনকাল বদল হয়ে গেছে, সে-আমলের মানুষরাও বাতিল—মন্ত্রগুপ্তি একটু-আধটু ছাড়লেও এখন ছাড়তে পারেন।

তবু ফুল্লরা ছাড়বে না : তোমার নিজের কথাই বলো তবে ছোটমামা।

আমার কথা ? কথা আমার একটি, চোখেই তা দেখতে পাচ্ছিস।

বীভৎস মুখের উপর বিচিত্র ধরনের হাসি। হেমকান্ত বললেন, একটি কথাতেই সমস্ত বলা হয়ে যায়। পুড়েজ্বলে ছাই হয়ে গেলাম। মুখ পুড়েছে, বুক পুড়েছে—

বাঁ-হাতে গায়ের জামা তুলে দেখালেন: বুকের উপরে পুড়েছে, ভিতরটাও এমনি। ভিতরের পোড়া আগে—আজাদির পয়লা দিন থেকেই। সেই অগ্নুনিতে দিন-রাত ছটফট করেছি। হাত তখনো মুলো হয়ে যায় নি—মনে যখন যা উঠেছে, খাতার পর খাতায় পাগলের মতন আঁচড় কেটে গেছি। খাতার গাদা, চেয়ে দেখ্—

দেয়ালের তাক ভরতি খাতা। বললেন, যে-খাতা ইচ্ছে নিয়ে নে, যেখানে খুশি খোল, যত্রতত্র পড়ে যা। আজকে কানাকড়ির দাম নেই। গদিনশিনরা রকমারি রশারশিতে নানান কায়দায় বুদ্ধিজীবীদের বেঁধেছে। শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমে গদগদ—মুনাফার লোভে মুখে মুখে তারা সেই ভাব দেখায়। তবে শ্রাদ্ধের দিনও বেশি দূরে নেই। সেদিন থাকি না থাকি, যৎসামান্য আমার এই তিলতণ্ডুলের আয়োজন রইল। এ-লেখার তখন কদর হবে—সর্বনাশের ইতিহাস রচনার সময়।

ফুল্লরা খাতা একটা খুলে নিয়েছে। একটুখানি পড়েই খিল খিল করে হেসে উঠল। বীরেশ্বরের দিকে চেয়ে বলে, শোন দাদু, মজার লেখা লিখেছে ছোটমামা—

কালোবাজারি ধরে ধরে ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন, জওহরলালের উক্তি। মহানেতা কদাপি ঝুটমুট বলেন না—ল্যাম্পপোস্ট দেখলেই তাই উপরমুখো তাকাই, বুঝি-বা ঝুলছে দু-চারটে কালোবাজারি। তাকিয়ে তাকিয়ে ঘাড় বেঁকে গেল—একটাও পেলাম না। পাবো কি করে—তারা নিজেরাই যে ল্যাম্পপোস্ট হয়ে স্বাধীন দেশে আলো-বিকীরণের কাজ নিয়েছে। সাহিত্য শিল্প রাজনীতি অর্থনীতি সিনেমা স্পোর্টস—

সর্বব্যাপারে শেষ-বচন তাদের—পুরস্কার-তিরস্কার তারাই পাত্র বুঝে খুশি মতন দান-বিক্রি করে···

হেমকান্তও হাসেন। বললেন, এক বয়সে লেখার বাতিক ছিল—লেখক হবো ভেবেছিলাম। ফুরসত হল না, লড়াই লাগল জগৎ জুড়ে। পয়লা-বিশ্বযুদ্ধের সময় বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়েও আয়োজন ভেস্তে গিয়েছিল, এবারের এ সুযোগ ছাড়া যাবে না—পেতেই হবে স্বাধীনতা। পেলামও বটে—হায় রে হায়, কাটা-ছেঁড়া পোকায়-খাওয়া স্বাধীনতা। তরী বানচাল তীরের উপরে এসে। ইংরেজের এক-দাঁতের বুদ্ধি রাখিনে আমরা, শেষ-মামলায় মোক্ষম মার মেরে তারা বিদেয় হয়ে গেল।

খাতার পাতে এরই প্রতিধ্বনি যেন খানিকটা। ফুল্লরা শব্দ করে আবার একটু পড়ছে :

তপঃসিদ্ধি হবো-হবো, ইন্দ্রের হাজার চোখের তারা ঠিকরে বেরুনোর গতিক। বজ্র-হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন : উর্বশী-মেনকা-রম্ভারা সব কোন চুলোয়, করে কি তারা? সঙ্গে সঙ্গে অমনি শোঁ-শোঁ আওয়াজ তুলে আকাশ আচ্ছন্ন করে সর্বধুরা তপোভঙ্গের জন্য উড়ল। এই পৌরাণিক কৌশলটা ইহভূমেই স্বাধীনতার মুখে কতবার দেখলাম! জাতির জীবন-মরণ ব্যাপারে নিয়ে যখনই কোন উৎকট সমস্যা, বায়ুকোণে আওয়াজ তুলে সঙ্গে সঙ্গে অমনি উড়ে আসে। আর দেখতে হয় না—সর্ব সমস্যার সমাধান!

মুখ তুলে ফুল্লরা শুধায় : মানে কি ছোটমামা? ধাঁধার মতন লাগে। কারা আসতেন, কার কাছে?

গম্ভীর হয়ে হেমকান্ত বলেন, একলা—একটি প্রাণী শুধু। একাই তিনি একসহস্র। আমার কিছু নয়—কথা মওলানা

আজাদের, আমি কিছু ভিন্ন ভাবে লিখেছি। সবাই জানে, ফুসফুস-গুজগুজ করে। ভারতের বাসিন্দা নোস তুই যে—তোর কাছে ভা[illegible] ধাঁধা লাগে।

আবার বললেন, ফুজ্জোকথা থাক। চটিখাতাটা পেড়ে নে। নাটক।

চটিখাতা নিয়ে ফুল্লরা পড়ছে :

সমুদ্রের ওপারে অনেক দূরের সিঙ্গাপুর থেকে সুভাষ মাথা-ভাঙাভাঙি করছেন : ভারত না কাটা পড়ে যেন—খবরদার! সর্বনাশ হয়ে যাবে। I have no doubt that if India is divided she will be ruined. I vehemently oppose the vive-section of our motherland. Our divine motherland shall not be cut up.

হেমকান্ত বললেন, আর সমুদ্রের এপারে অমনি পাল্টা ডায়ালোগ। পড় সেটা এবারে।

ফুল্লরা পড়ছে :

মাদ্রাজে রাজাগোপালাচারীর হুকার : কাটতেই হবে দুটো জায়গা—বাংলা আর পাঞ্জাব। আমাদের স্বাধীনতার পথের জগদ্দল-পাথর। Bengal and the Punjab are the two stumbling blocks to the Indian Independence. আর কম্যুনিস্টদের সঙ্গে এমনিতে আদায়-কাঁচকলায়, এ বাবদে জেনারেল-সেক্রেটারি জোশি সাহেব, দেখি, রাজাজির দোহার হয়ে দাঁড়িয়েছেন : হাঁ-হাঁ, স্বদেশ-খণ্ডন অবশ্যই! বম্বে শহরে ওদিকে জিন্নাহ সাংবাদিকদের কাছে দেমাক করছেন : অন্তত দুই হিন্দু উপলব্ধি করেছেন আমার মতবাদ। আমার দলে তাঁরা।

হেমকান্ত বলেন, ঠিক একেবারে স্টেজের নাটক—তাই নয়?

কোথায় সিঙ্গাপুর, কোথায় মাদ্রাজ আর কোথায় বম্বে—নায়কদের কেমন এক জায়গায় এনে ফেলেছি। কথায় লড়ালড়ি যেন একই স্টেজের উপরে দাঁড়িয়ে।

নিঃশব্দ হয়ে রইলেন মুহূর্তকাল। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে আবার বলেন, মহানাটকের গৌরচন্দ্রিকা এসব। পঞ্চম অঙ্কের যবনিকা অবধি লিখে যেতে পারলাম না। আমার ডান-হাতের বদলে বাঁ-হাতটা পুড়ে যেত যদি!

॥ সাইত্রিশ ॥

ঐ যে হেমকান্ত টুইয়ে দিলেন, আর রক্ষে আছে। দুর্গাশঙ্করের গায়ে গায়ে ফুল্লরা ছায়ার মতন লেপটে আছে—যেটুকু সময় পাওয়া যায় তাঁকে বাড়িতে। বড়মামার নিত্যসঙ্গী, সেই হিসাবে দুর্গাশঙ্করও মামা। জলজ্যান্ত মানুষটিকে ফাঁসিতে চড়িয়ে হত্যা করেছিল ফুল্লরার জন্মের আগে। সেই মামাকে চোখে কোন দিন দেখতে পায়নি—অবশেষে দুর্গাশঙ্করের মধ্যে এতকাল পরে খানিকটা যেন পেয়ে গেছে। 'বলুন মামা' 'বলুন মামা' করে অস্থির করে তুলেছে। অতীত নবকান্তর কাছে গুহ্য জীবন-কথা শোনবার জন্য একালের ভাগনি আবদার ধরেছে।

দুর্গাশঙ্করও তেমনি। ঐ অতল সমুদ্র থেকে মণিরত্ন বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। হাসেন কেবল টিপিটিপি। নিতান্তই নাছোড়-বান্দা তো এক-আধটা শামুক-ঝিনুক ছুঁড়ে দেন কদাচিৎ, মূল্যবান কিছুই নয়।

বলেন, পালানোটাই বরাবর পারি ভাল—শুনলে তো হেমকান্তর কাছে। নবকান্ত সেই কাজই আমায় দিয়েছিল। রিভলভার হাতে গুঁজে দিয়ে ইসারায় সরে পড়তে বলে। বলেছিল, মানুষের চেয়ে মালের দাম ঢের ঢের বেশি। মানুষ বিস্তর মেলে—অ্যাকসনে যাবার জন্য হুড়োহুড়ি লেগে যায়। কিন্তু রিভলভার জোটানো টাকাতেই হয় না, কাঠখড় পোড়াতে হয় রীতিমত।

হঠাৎ বা তিক্ত হয়ে দুর্গাশঙ্কর বলে উঠলেন, তোমার বড়মামা ছিল বুদ্ধিমান—আজকের এই আজাদির দিনকাল আগেভাগে ঠিক সে দেখতে পেয়েছিল। রিভলভার পাচার করে দিয়ে লোক-দেখানো সামান্য একটু ছুটোছুটি করেই দু'হাত বাড়িয়ে দিল। তার মানে, হাত বাড়িয়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পরা। যা তেজস্বী মানুষ—সেদিন

ফাঁসি না হলে আজকে নবকান্ত গরুর-দড়ি নিজ-হাতে গলায় জড়িয়ে আপোসে ঝুলে পড়ত। পেটের দায়ে আমার মতন পেনসনের দরখাস্ত নিয়ে ঘুরত না।

একটু থেমে জোর দিয়ে আবার বললেন, ইজ্জত নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে চলে গেল। ফাঁসির মড়া দেখ নি কখনো—বিঘতখানেক জিভ বেরিয়ে পড়ে। সেই এক-বিঘত জিভ নেড়ে সাহেবদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে হাজার মানুষের কাঁধে চড়ে নবকান্ত শ্মশানে এসে নামল। ভিড়ের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন, মনে পড়ে সমস্ত।

ছাড়ল না ফুল্লরা। কলকাতা দেখার জন্য এক ভোরবেলা প্রণবের সঙ্গে বাসে চাপল। টেনেটুনে দুর্গাশঙ্করকেও সঙ্গে নিয়েছে। জু প্ল্যানেটোরিয়াম ইত্যাদির ইচ্ছা থাকলে সে সমস্ত ও-বেলায়। সকলের আগে প্রেসিডেন্সি জেল—নবকান্তদের কালের হরিণবাড়ি। হরিণবাড়ির সঙ্গে দুর্গাশঙ্করেরও পুরানো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এখনকার সুপারিনটেণ্ডেন্ট মানুষটি ভাল—অনুমতি তো দিলেনই, একজনকে বলে দিলেন ভাল করে দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবার জন্য।

ফাঁসিক্ষেত্র। সেলের পিছন-দরজা থেকে পথ ক্রমশ মঞ্চ অবধি উঠে গেছে। কাঠের ফ্রেমে ডবল আংটা—কাজের মুখে ফাঁসের দড়ি ঐ আংটার সঙ্গে বেঁধে দেয়। পাইকারি হিসাবে একসঙ্গে ডবল ফাঁসিও হতে পারে, সেই ব্যবস্থা।

শেষরাত্রে কোন একদিন আচমকা সেলের দরজা খুলে যায়। সন্ধ্যায় উপরতলার কয়েদিদের নিচে নামিয়ে দিল—বুঝতে তখন আর বাকি থাকে না। বাজে মানুষদের নিখরচায় অমন আহা-মরি জিনিস কেন দেখতে দেবে? ঘুমিয়েও তবু সারা জেলখানা উৎকর্ণ হয়ে আছে। রাত্রিশেষের তরল আঁধার বিকম্পিত করে রব উঠল: বন্দেমাতরম্! আহা রে, কোন স্বদেশি ছেলে চললেন—শোন ওই। দরজা খুলেছে তো ছেলেটি ঢালু পথ ধরে মঞ্চের প্লাটফরমে সাঁ করে

ছুটে এসেছেন, সবুর সইছে না মোটে যেন। বন্দেমাতরম্ বন্দেমাতরম্ বন্দেমাতরম্—দেয়ালে দেয়ালে প্রতিহত হয়। দেয়াল-ঘেরা ভিতরেও চলে গেছে, এ-কণ্ঠ থেকে ও-কণ্ঠে দূরতম প্রান্ত অবধি বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে—বন্দেমাতরম্। আকাশের শুকতারা দপ দপ করে। পাষাণ-প্রাণ খুনি কয়েদিটাও সেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দোষ-ত্রুটি যা হয়েছে, ক্ষমা কোরো স্বদেশের ভাইবোনেরা। যাচ্ছি আমি, আবার আসব। আসব আবার আমরা সকলে।

শেষক্ষণে মুখ ঢেকে দেবার বিধি। স্বদেশি ছেলে হাতের ধাক্কায় ঢাকা সরিয়ে দেন। চোখের দৃষ্টি যতক্ষণ আছে, পৃথিবী ও আকাশ দেখে যাবেন। মালার মতন দড়ির ফাঁস নিজ হাতে গলায় ঢুকিয়ে দেন তিনি।

বন্দেমাতরম্।

হাতল টানে জল্লাদ। পায়ের নিচের প্লাটফরম আর নেই। লহমায় পাতালে পতন। গলায় ফাঁস এঁটে গিয়ে ঝুলছেন।

মঞ্চের উল্টো দিকে মাটির লেবেলে খুপরি-দরজা। উষার আলো ফুটেছে। ঘড়ি দেখা হল—মৃত্যুর যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। খুপরি-দরজা খুলে মড়া তুলে এনে গলার দড়ি কেটে দিল। পায়ের শিরা কাটল। ডাক্তারি পরীক্ষা—বেঁচে না ওঠে যেন আবার। ওঠে নি আজ অবধি, তবু করতে হয়। এ সমস্ত রীতকর্ম, ফাঁসির বিধি।

জেলে জেলে এমনি উষা কত শত বার এসেছে! দূরে থাকি, ঘুমিয়ে থাকি আমরা—জানিনে তাই, কথাগুলো কানে পৌঁছয় না, মনে আঁচড় কাটে না তেমন।

ফুল্লরা সেই খুপরি-দরজার অদূরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল প্রার্থনার ভঙ্গিতে। কে কী ভাবছে, গ্রাহ্য নেই। সম্বিতও নেই বুঝি। উজ্জ্বল রোদ। একটা গরু খুঁটে খুঁটে ঘাস খেয়ে

বেড়াচ্ছে। শান্ত প্রসন্ন ফাঁসিক্ষেত্র। প্রাণচঞ্চল দুর্বার মানুষদের হত্যা করে সঙ্কীর্ণ ওই দ্বারপথ দিয়ে আলোর ভুবনে আবার তুলে আনে। হাজার হাজার জেল, হাজার হাজার ফাঁসিক্ষেত্র— এমনিধারা কত কত দেহ বের করে এনেছে! সঙ্কীর্ণ দরজার পথে বেরিয়ে এসেছিলেন সূর্য সেন, ভগত সিং, আসফাকউল্লা, রাজেন লাহিড়ী, অনন্তহরি, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য—আরও কত, আরও কত! কত ফুল, কত তারা! নবকান্তও এক প্রত্যূষে বেরিয়েছিলেন— ফুল্লরার জন্ম হয়নি তখনো। ফোটোতে দেখেছে—স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাস্যমুখ এক তরুণ ছেলে—তার বড়মামা। এই শষ্পশয্যাতেই বড়মামা নবকান্তকে তুলে এনে শুইয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ কী হল ফুল্লরার—জন্মের অনেক আগেই যিনি শেষ হয়ে গেছেন, দুরন্ত শোক উথলে উঠল তাঁর জন্য। যেন নতুন করে ফাঁসি। মামা গো, কী দিনকাল আজ দেখ। তোমাদের জীবনদান বিফল করে দিল মুষ্টিমেয়র স্বার্থবুদ্ধি আর বিদেশির কুটিল পৃষ্ঠপোষণা। আমাদের এত প্রত্যাশা বানচাল করে দিল।

সূর্য সেন—মাস্টার-দা ফাঁসি-সেলে গান গাইতেন, 'অস্তাচলের ধারে আসি পূর্বাচলের পানে তাকাই'। চট্টগ্রাম-জেলে ভোরবেলা নয়—রাতদুপুরে চোরের মতো চুপিসারে ফাঁসি সেরে দেহটি এমনি এক প্রাঙ্গণের উপর শুইয়েছিল। ফিরিঙ্গি মিলিটারি পুলিশগুলো জীবিত শার্দুলের শতহস্তের মধ্যে আসতে সাহস পেতো না—তারাই এবার নির্বিঘ্নে দেহের উপর বুটসুদ্ধ লাথির পর লাথি ঝেড়ে যাচ্ছে।

মনে রেখো—মনে রেখো নতুন-মহাভারতের শত শত এমনি সব উপাখ্যান। 'অস্তাচলের ধারে আসি পূর্বাচলের পানে তাকাই'!

আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে ফুল্লরা উঠে দাঁড়াল। ফাঁসিমঞ্চে উঠে গিয়ে মাটির উপর অষ্টাঙ্গ লুটিয়ে প্রণাম করে। বড়মামার শেষ-ভূমির স্পর্শ নিল, প্রণাম করল অনেকক্ষণ ধরে। বিড়বিড় করে

বুঝি সঙ্কল্পও নিল : আত্মদান বিফল হতে দেবো না। দেবো না। দেবো না।

তর-তর করে নেমে এসে দুর্গাশঙ্করকে বলল, চলুন মামা, হয়ে গেছে।

হেমকান্ত পঙ্গু, শয্যাশায়ী। কারখানার বিস্ফোরণে এই দশা। আজব কিছু নয়। বিপ্লব-আমলে বোমা বানাতে গিয়েই বা কত মানুষ মরেছেন!

ফুল্লরা বলে, মায়ের হাতে রিভলভার দিলে ছোটমামা, মা একটা গুলিও ছোঁড়ে নি। রিভলভার ছাইগাদায় পুঁতেছে। খুঁজে পেলো না, তা হলে তোমায় ফেরত পাঠিয়ে দিত।

হেমকান্তর বেরিয়ে-আসা চোখটা চকচক করে উঠল শাণিত ছুরির ফলার মতো।

বীরেশ্বর হেসে উঠে প্রবোধ দিলেন : তা হলেও শত্রু-নিপাত। একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একটাও আর বাকি নেই।

দৃষ্টি ঘোরালেন হেমকান্ত তাঁর দিকে। বাজে-কথা ও-মুখে বেরুবে না। দৃষ্টিতে বিস্ময়।

জোর দিয়ে বীরেশ্বর বললেন, সত্যি সত্যি তাই। ঝড়ঝাপটা কেটে গেছে। আজকের যুব-সম্প্রদায়, এই বিশ-বাইশ-পঁচিশ যাদের বয়স—জ্ঞান হওয়া ইস্তক হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বলে কোন-কিছু সামনে আসে নি তাদের, হীনমন্যতা নেই কোনরকম, সাম্প্র-দায়িকতার নিশ্বাস তারা জীবনে কখনো নেয় নি। হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি করেছিল, অবাক লাগে একালের ছেলেমেয়ের কাছে। নেতৃত্ব এদেরই উপর আসছে—এসে গেল বলে, কাল না হয় তো পরশু। তবে আর ভয়ভাবনা কিসের?

ফুল্লরা বলে, মন্দ খবরগুলো পৌঁছে দেবার শতেক ব্যবস্থা, একগুণ হলে ফাঁপিয়ে শতেক গুণ করে। মা তাই বলল, চারিদিকে

যা সমস্ত দেখিস, গল্প করে আসবি। জনম ভোর সকলের কথা ভেবে এসেছ ছোটমামা, অহোরাত্রি অচল হয়ে থেকে আরও বেশি বেশি করে ভাবো এখন। কিন্তু খবরের-কাগজে যা পড়ো আর রেডিও'য় যা শোনো, সব তার সত্যি নয়—দরকার বুঝে মতলবীরা রংচিত্তির করে। তোমার কারখানা চালু রেখে আগাপাস্তলা যদি সাগরেদদের অস্ত্রে সাজাতে, একবিন্দু লাভ ছিল না ছোটমামা। শত্রু কোথা, কার উপরে হানবে তোমার অস্ত্র?

ফাঁসিক্ষেত্র চোখে দেখার পর কেমন হয়েছে—কথায় কথায় তাঁরাই কেবল এসে পড়েন। ফুল্লরা বলল, বড়মামাদের শেষ-কথা ছিল আবার আসবেন তাঁরা। এসেই গেছেন, আমার তো মনে হয় মামা। ওপারে পূর্ব-বাংলায়—তোমাদের ভারতের বাসিন্দা নই, এপারের খবর সঠিক জানিনে। সূর্যসেন, বাঘাযতীন, উধম-সিং-রাই এসেছেন আবার পূর্ব-বাংলার ছেলেদের মধ্যে। নির্ভীক সত্যসন্ধ, অন্যায়ের সঙ্গে আপোস জানে না কোন রকম। ভাষা-আন্দোলনে প্রাণ দেবার হিড়িক দেখেছিলাম—দরকারে আরো শত শত তেমনি দেখতে পাবো।

দেখাশোনা শেষ। হাসিম সাহেব ও তারাফুলির পাকিস্তানে ফেরা এবার। ফুল্লরা-বীরেশ্বর থেকে যাচ্ছেন কিছুদিন, পরে যাবেন।

দুপুরের দিকে দৈবক্রমে রঞ্জন এসে উপস্থিত। প্রণব ভারি খুশি: খাসা হয়েছে। পারের দায় তবে এঁরই উপর বর্তাল। যা-কিছু করতে হয়, ইনি করবেন—আপনাদের কোন ঝক্কি নেই। এ-বেলাটা থাকুন তবে রঞ্জনবাবু—না কি রমজান মিঞা বলতে হবে! বিকেলে একসঙ্গে সব বেরুবেন।

যাওয়ার সময় আবুল হাসিম ও তারাফুলি হেমকান্তর ঘরে ঢুকল। বীরেশ্বরও এখানে। ফাঁক পেলেই এসে বসেন অসুস্থ অচল মানুষটির কাছে। হেমকান্ত বললেন, কষ্ট করে কাঁহা-কাঁহা

মুলুক থেকে চাল-গুড় বয়ে এনে পিঠে খাওয়ালেন—আমরা কি দিতে পারি হাসিম সাহেব? চাল এখানে তো ডুমুরের-ফুল। কাঁচামিঠে গাছটায় গুঁটি ধরেছে, চাঁপাগাছে ফুল ফুটেছে, এইসব চাট্টি চাট্টি নিয়ে যান।

আবুল হাসিম ঘাড় নেড়ে বললেন, বাঁশতলিতে আপনাদের মস্তবড় আমবাগান—এখানকার একটা গাছে ক'টা মাত্র গুঁটি, তাই ছিঁড়ে নিয়ে কি হবে? ফুলেরও কিছু অনটন নেই সেখানে। বরঞ্চ এক-ঢেলা মাটি নিয়ে যাই—আমার ভিটের মাটি।

হেমকান্ত মুহূর্তকাল চুপ করে রইলেন তাঁর দিকে চেয়ে। ধরা গলায় বললেন, নিষ্কর্মা পড়ে পড়ে মন বড় দুর্বল হয়ে গেছে। আপনি আমায় না কাঁদিয়ে ছাড়বেন না হাসিম সাহেব। কাছে আসুন, বিছানায় এসে বসুন। আপত্তি করবেন না, একটুখানি বুকে হাত রাখব। আপনার বুক আমার বুক একই কথা বলছে।

আবুল হাসিম বললেন, সাত-পুরুষের নাড়ির টান—বাদশাহি পেলেও ভিটের দুঃখ যাবে না। ঐ যে মাটির ঢেলা—হীরে-মাণিক তার কাছে লাগে না। ঘরে নিয়ে রাখব, ভিটের গন্ধে ভুরভুর করবে আমার ঘর।

তারাফুলি খিলখিল করে হেসে উঠল: কবিত্ব উপে যাবে মামা। ভিটের গন্ধ আরাম দেবে না তা জেনো—মনে আরও বেশি করে জ্বালা ধরাবে। একঢেলা মাটি শুধু নয়—পুরো ভিটেবাড়ির জন্ম পাগল হয়ে উঠবে।

বীরেশ্বর চুপচাপ ছিলেন, হাসিমুখে সায় দিয়ে উঠলেন: এ-কবিত্বের নজির আছে। একফোঁটা ছেলেটাও ইতিহাসের বইয়ে পড়ে থাকে। স্বভূমির যতদিন উদ্ধার না হয়, তৃণশয্যায় শয়ন বৃক্ষপত্রে ভোজন—রাণা প্রতাপসিংহের ব্রত। সেই নিয়ম মেনে উত্তরপুরুষরা বরাবর থালার নিচে একটা পাতা বিছানার নিচে গোটাকতক ঘাস রেখে এসেছেন।

তারাফুলি ও সুন্নয়া খুব হাসছে।

হাসির জিনিষ—হাসবে বই কি তোমরা! তবু তলিয়ে দেখ, ছেলেখেলার ভিতরে ভিতরে অমোঘ সঙ্কল্প একটা। প্রতিদিন মনে পড়ে যাচ্ছে, স্বভূমি থেকে আমায় বঞ্চনা করেছে। ঘাস-পাতার এই নিয়ম থেকে মুক্তি নিতেই হবে—এ-পুরুষে না-ই হল তো ভিন্ন পুরুষে। হারানোর ব্যথা পুরুষানুক্রমে রক্তের মধ্যে বয়ে নিয়ে চলেছে। হাসিম সাহেবের মাটির ঢেলাও তাই। দিনান্তে মনে করিয়ে দেবে: ঘাতকেরা দেশভূঁই কোতল করেছে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে আবার তার। মূঢ় কাপুরুষ আমরা হেরে রইলাম—ছেলেপুলেরা এ হার কখনো মেনে নেবে না।

ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে পড়ে আবুল হাসিম শুধালেন: পারবে তারা?

বৃদ্ধ অধ্যাপকের প্রত্যয়-ভরা গম্ভীর কণ্ঠ, সংশয়ের ক্ষীণতম চাঞ্চল্য নেই। বললেন, ইহুদিরা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে ছিল—কত ধনসম্পদ, ব্যাপার-বাণিজ্য, পাণ্ডিত্য-গবেষণা। নিজের ভূমি হারিয়ে এসে দু-হাজার বছর অপেক্ষা করেছে—সেই বাইবেলের আমল থেকে। পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে স্বপ্ন দেখে এসেছে। তারপর অধিকার যেদিন পেয়ে গেল, দুনিয়ার যে-প্রান্তে যে ছিল, ঐশ্বর্য-প্রতিষ্ঠা ধূলিমুঠির মতন ছুঁড়ে দিয়ে ছুটল নিজস্ব সেই অনুর্বর মরুপ্রায় দেশে। লক্ষ হাত মিলে দিকে দিকে ফ্যাক্টরি তুলছে, সোনা ফলাচ্ছে অহল্যাভূমিতে।

একটুখানি থেমে আবার বললেন, ইতিহাস ধীরগতি, কিন্তু অমোঘ। জীবনের হিসাব বছর ধরে, ইতিহাসের হিসাব শতাব্দী ধরে। ব্যস্ত হবার কি আছে! নিজের ঠাঁই ফিরে পেতে ইহুদিদের দু-হাজার বছর লেগেছে, আমাদের তো বিশটা বছরও হয় নি এখনো। তারই মধ্যে কত কাছাকাছি এসে গেছি, দেখতে পাচ্ছেন। হাতিয়ারে হাতিয়ারে বেড়া বেঁধে দিয়েও পথ রুখতে পারে কই?

মনের মতন কথাটি পড়েছে। 'আমি জানি' 'আমি জানি'—করে পঙ্গুমানুষ হেমকান্ত উত্তেজনায় অবস্থা ভুলে লাফিয়েই বা উঠে বসেন। বললেন, বিনিময় আর এক দফা আসছে—যে যার জিনিষ দেখেশুনে ফেরত নেবে। অবধারিত জানি বলেই তো ঘরবাড়ি এত যত্নে রেখেছি। আপনাদের হাতে যা ছিল, ঠিক ঠিক তেমনিটি পেয়ে যাবেন।

আবুল হাসিম বললেন, আমাদের চেয়েও ভাল।

প্রতিবাদ করেন না হেমকান্ত। ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন: হতে পারে। তাই-ই বোধহয়। নিজের জিনিসে হেলাফেলা, অন্যের জিনিস বলে যত্নটা বেশি হয়ে যায়। হাতে পেয়ে ওরা নয়-ছয় করেছে, ফেরত পাবার পরে এমন কথা না বলতে পারেন।

আবুল হাসিম বললেন, আপনাদের বাঁশতলির বাড়িতেও ঠিক তাই। আপনাদেরও কিছু বলবার থাকবে না—জোর গলায় বলছি। এত গাছগাছালি—টুকরো একটা ডাল অবধি ভাঙি নি। যখন দিন আসবে, গোণা থাকে তো হিসেব করে মিলিয়ে নেবেন।

প্রণবকে বললেন, চলো না হে তুমি একবার। বাড়িয়ে বলছি কি না দেখতে পাবে। ফিরে এসে বাবা-মা'কে বোলো।

প্রণব বলে, যাব বই কি। যা লোভ ধরালেন, না গিয়ে উপায় আছে? বরাবর শুনে এসেছি, সুন্দরবনে রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার আর পাকিস্তানে তারই দোসর—গণ্ডায় গণ্ডায় বাঘ নরাকর ধারণ করে বেড়ায়।

একচোট হেসে নিল। বলে, এখন নয়, জষ্ঠিমাসে ফুলুরাদের সঙ্গে যাব। এ-বাড়ি সে-বাড়ি কুটুমভাতা খেয়ে আসব দিনকতক। ইস্কুলে পড়বার সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে যেমন বাড়ি যেতাম। গাছে চড়ে জামরুল পাড়ব আম পাড়ব ডাব পাড়ব, জাল ফেলব খালে, ডিঙি বাইব, সাঁতার কাটব, হাট করতে যাব হাটখোলায়—৬

বলেই যাচ্ছে। জানলা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে সারা শৈশব চোখে দেখতে পাচ্ছে।

বেলা ডুবে ঘোর হয়ে এলো।

ও-ঘরে রঞ্জন বসে আছে, কথায় কথায় সে আর মনে নেই। চায়ের কাপ নিঃশেষ করেছে রঞ্জন। পর পর দুটো বিড়িও। এবারে তাগিদ দিল: দেরি করবেন না। পঞ্চমী তিথি, ঘাটে যেতে যেতেই চাঁদ ডুববে। পারাপার আজ সকাল সকাল।

তারাফুলি হেমকান্তর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর—কী কাণ্ড! হাসিম সাহেবও দেখি তাই। দু-হাতে পাদস্পর্শ করে বললেন, আসি দাদা—

প্রণবকে বললেন, জষ্ঠিমাসেই তবে কথা রইল। ভিতরে নিয়ে চলো, ভাবীকে বলেকয়ে যাই। উনিও যদি যেতে পারেন।

॥ শেষ ॥